অচেনা আকাশ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

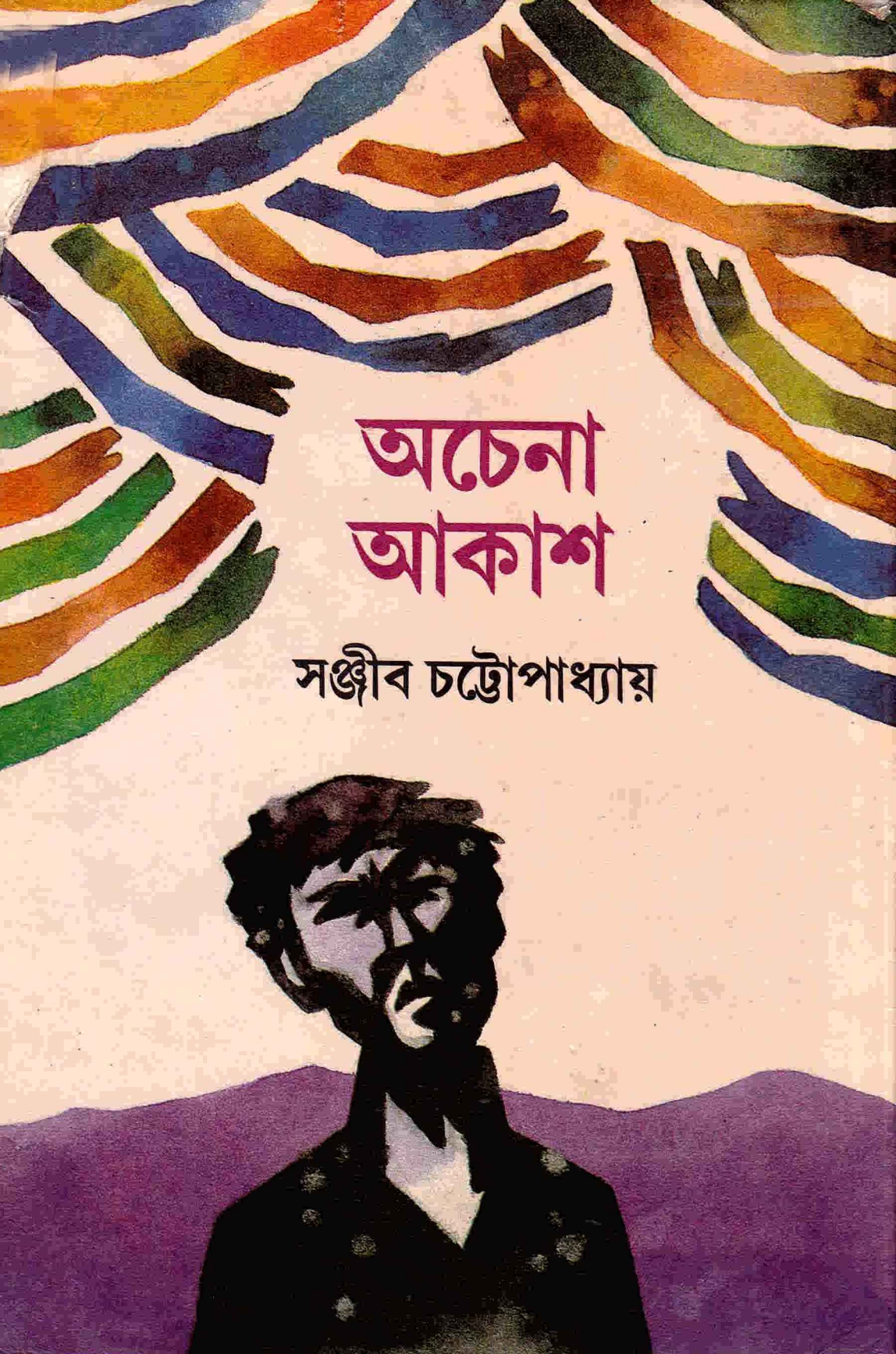

এই লেখকের অন্যান্য বই

শ্বেতপাথরের টেবিল
পায়রা
সোফা-কাম-বেড
ক্যানসার
শাখা প্রশাখা
তৃতীয় ব্যক্তি
কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই
শঙ্খচিল
অগ্নিসংকেত
লোটাকম্বল
তুমি আর আমি
পেয়ালা পিরিচ
বসবাস

'এবার একেবারে ফাটিয়ে দিন। ফ্র্যাকচার করে দিন। এমন একখানা ছাড়ুন, বছর তিনেক বেস্ট সেলার লিস্টের প্রথম দিকে যেন ঝুলে থাকে। নট নড়নচড়ন। ফ্রন্ট পেজে একটা বড় করে বিজ্ঞাপন ছেড়ে দোব। তবে হ্যাঁ, রয়ালটি টেন পারসেন্টের বেশি নিলে চলবে না। অ্যাঃ,এই নিন পাঁচশো এখন রাখুন। কপি কবে থেকে ছাড়বেন ?'

ময়লা ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার কোলে ফেলে দিলেন দাশ পাবলিশার্সের ফটিক দাশ। প্রবীণ মানুষ। শ্যামবর্ণ। থলথলে চেহারা। ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া পরেন না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সঙ্গে ছাতা। লিভার সামান্য কমজুরি। লেখকের রয়ালটি ছাড়া আর কিছু হজম হয় না। চোখের সাদা অংশ অল্প হলদেটে।

পাঁচখানা নোট পাখার বাতাসে ডানাভাঙা পাখির মত ওড়ার চেষ্টা করছে।

'আরে মশাই টাকা কটা তুলুন। আড়ে আড়ে কি দেখছেন ! অমন টাকা মাটি ভাব করে বসে থাকবেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। ওসব লোক দেখান ভড়ং ভাল নয়। আজকের ডেট দিয়ে ডায়েরিতে লিখে রাখুন।'

'ফটিকদা, আমার আর লেখার সাহস নেই। আজকাল উপন্যাসটুপন্যাস তেমন জমে না। পাঠক কি চান তেমন বোঝা যায় না। লিখে বিক্রি না হলে বড় লজ্জা।'

'কেন, আগের বইটা তো মোটামুটি ভালই গেছে। বছর না ঘুরতেই এডিশান। ফর্মুলাটা কি ছিল ?'

'ওই পোয়াটাক প্রেম, ছটাকখানেক সেক্স, পোয়াভর রাজনীতি, আধপোয়া

ফ্রাসট্রেশান, এক কাঁচ্চা ধর্ম, বাকিটা কথার ফুলঝুরি নিসর্গ বর্ণনা।'

'শেষটা একটু ঝুলেছিল।'

'হ্যাঁ, ঠিক গুটোতে পারিনি। ভয়ে। আর একটু খেলত। ফর্মা বেড়ে যাবার ভয়ে মেরে ধরে নায়ককে গর্তে ফেলে, নায়িকাকে বিলেত পাঠিয়ে দি এগু করেছিলুম। ফর্মা বাড়া মানে দাম বাড়া। এই বাজারে পঞ্চাশ টাকা দামের বই কে কিনবে।'

'শুনুন, কলম আছে বলেই ধড়াধড় চরিত্র নামাবেন না। উপন্যাসেও ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন আছে। ওখানেও হারাধনের দশটি ছেলে চলবে না। জন্ম দেবার আগে মানুষ করার কথা ভাবতে হবে। এবারে ফর্মুলাটা একটু চেঞ্জ করুন। প্রেমটাকে আধসের করুন। পোয়াটাক সেক্স। মানে বেশ দুপুরের শোয়ের মালয়ালাম। একেবারে পাগল পাগল করা ইলিবিলি মিলিজুলি। ধর্ম বাদ। আজকাল ধর্মের নাম শুনলে মানুষের গায়ে অ্যালার্জির র‍্যাশ বেরোয়। পোয়াভর রাজনীতি ঠুসে দিন। এমন করে রাঁধুন যেন ধরলে আর ছাড়া না যায়। টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেয়।'

'সে ক্ষমতা আমার কি আছে। উপন্যাস লেখা কি অতই সহজ!'

'ভয় পাবেন না, ভয়। টেক ইট ইজি। কি আছে মশাই, হাতী ঘোড়া। একটা ছেলে একটা মেয়ে। এদিকে এক জোড়া বাপ-মা, ওদিকে এক জোড়া। একটা পাড়া। পাড়া মানে নানা বয়েসের নারী-পুরুষ। রাজনীতি। মাস্তান। বোমাবুমি। প্রাচীন আদর্শবাদী, নবীন বেপরোয়া। ঘরে ঘরে কোঁদল আর স্ক্যাণ্ডাল। চকাচক শাটার টিপুন। ছবির পর ছবি। পরপর সাজিয়ে যান। শেষ কালে একটু মোচড়। আমরা লিখি না তাই। কলম ধরলে লেখকদের ভাত মেরে দিতুম। আচ্ছা আমি উঠি। জয় মা বলে বসে পড়ুন। মনে রাখবেন পুজোর আগে বই বেরোবে। ভাবতে ভাবতেই বাজি ভোর না হয়ে যায়। লেখার বেগ আনুন। সকালের বেগ। আর মনে রাখবেন, আঁতলামো করলে চলবে না। বইয়ের কাটতি করতে হবে। লিখবেন পাঠকের জন্যে। নোবেল পুরস্কারের জন্যে নয়। নোবেল এ-দেশের কেউ পাবে না। আর মানুষের মন নিয়ে, জীবন-দর্শন নিয়ে অযথা কপচাবেন না। পাঠক ওসব পছন্দ করে না। ঘোড়ার মত টপকে চলে যায়। অ্যাকসান, কেবল অ্যাকসান। লাইনে লাইনে সাসপেনস্।'

'তার মানে গোয়েন্দা কাহিনী।'

'ধ্যাত মশাই। মাথা মোটা। ধরুন নায়ক নায়িকাকে চুমু খাবে। তার আগে বেশি পাঁয়তাড়া করতে দেবেন না। ক্যাঁক করে ধরবে, চ্যাক করে খাবে, তারপর। তারপরই তো মজা, দোষ কারো নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে

মরি শ্যামা। নিয়তি তৈরি হয়ে গেল। মর ব্যাটা এইবার। উপন্যাস কি জানেন, যেমন কর্ম তেমন ফল, অথবা কাঠ খেলে দাস্ত আংড়া। নাঃ চলি। অনেক জ্ঞান দিয়েছি।'

ছাতাটি বগলে নিয়ে দাশ পাবলিশার্সের ফটিক দাশ গুটি গুটি বেরিয়ে গেলেন। আর আমি টাকা মাটি ভাব ছেড়ে, একটা একটা করে নোট আলোর দিকে তুলে তুলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। এমন কায়দার সব জোড় থাকে, সহজে ধরা যায় না। আর এই নোট পরীক্ষা করতে গিয়েই আমার চোখ চলে গেল সামনের বাড়ির ছাদে। বেশ শৌখিন হাল কায়দার বাড়ি। ছাদে নিরস ইটের আলসের বদলে গোল রেলিং। আধুনিকাদের বেশভূষার মতো বেশ খোলামেলা। ছাদের তারে একের পর এক কাপড় জামা মেলে চলেছে সেই মেয়েটি। কোনও দিকে দৃক্‌পাত নেই। কখনও দাঁতে চাপা ক্লিপ। কখনও হাতে। ঝাড়ছে। টানছে। দুভাঁজ করছে। পরনে সেই সাদা শাড়ি, খাটো সাদা ব্লাউজ। ভদ্রমহিলার কি সুন্দর রঙ-সচেতনতা। গায়ের রঙ ঝকঝকে বাদামী। তার ওপর সাদা শাড়ি আর খাটো কাঁচুলি। এমন মানিয়েছে! সুন্দর শরীর। মোটাও নয়, রোগাও নয়। ধারালো মুখ। টানাটানা চোখ। ধনুকের মত ভুরু। টুথ পেস্টের মত দাঁত। রেশমের মত চুল পিঠে দোল খাচ্ছে। মাঝ-সকালের সোনালী রোদ পাগল হয়ে গেছে। আমার বন্ধু বিখ্যাত লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে, পাঠিকারা চিঠি লেখেন—'আপনার লেখা পড়ে কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে যাই।' সেইসব চিঠি মাঝে মাঝে আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়। হিংসেতে জ্বলে মরি। মনকে বোঝাই মন কি করবি বল! সকলের দ্বারা সব কিছু কি হয় বাবু। এবারটা চেষ্টা করে যাও। পরের বার হবে। তা এই ভদ্রমহিলাকে যখনই আমি দেখি কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে যাই। আমার ভেতর থেকে ভেতরটা ঠেলে বেরিয়ে যেতে চায়। কি যে হতে থাকে। শেষমেষ ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় মথুরার পথে পথে ধুলো পায়ে হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ বলে ঘুরছি। যেখানে যত ভালো ভালো কবিতার লাইন আছে সব মনে পড়তে থাকে। শেষে শূন্য ছাত। ঝকঝকে টিভি অ্যান্টেনা। নিঃসঙ্গ একটি কাক। খা-খা ডাক। এক সার শাড়ি আর রঙিন সব অন্তর্বাসের বাতাসী বিলাপ।

আমি খুব লজ্জা পাই। আমার এবংবিধ আচরণের কোনও ক্ষমা নেই। মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কে কি কেন, কিছুই আমি জানি না। সামনের ওই সুন্দর ছোট্ট দোতলায় বসবাস। মধ্যবয়সী আর একজন মাত্র মানুষকে বারান্দায় ছাদে মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেশ হাসিখুশি। মাই ডিয়ার

বলেই মনে হয়। সম্প্রতি গ্যারেজে একটা লাল টুকটুকে মারুতি এসে ঢুকেছে। সম্পন্ন ছোট্ট একটি পরিবার। রাতের দিকে দোতলার দক্ষিণের ঘরে টিভির পর্দায় রঙিন ছবি নাচানাচি করে। জোরে কথা বলা নেই। ঝগড়া নেই। শিশুর কান্না নেই। অসীম শান্তি। মহিলার দিকে শ্রান্ত বলদের মতো আমি তাকিয়ে থাকি। মহিলা ভুলেও আমার দিকে তাকান না। আমার ভীষণ অভিমান হয়। মহিলা অবশ্যই বোঝেন একটা মর্কট তাকিয়ে আছে। যে কোনও মেয়ের-ই শরীরে একটা কল থাকে। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মত। পুরুষরা তাকালেই পিকপিক করে ওঠে অ্যালার্মের মতো। মাঝে মাঝে মনে হয় বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলি—এই যে শুনছেন, আমি কে জানেন ? আমার বই, 'পাকা চুল এলো খোঁপা' আপনি পড়েননি। আমি সেই শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। গত বছর 'মধ্যমণি' পুরস্কারে লাঞ্ছিত হয়েছি। গোটা ষোল সভায় হয় প্রধান অতিথি না হয় সভাপতি হয়েছি। নিয়ে গেছে গাড়িতে। ফিরে এসেছি বাসে। মালা গলায় বাসে ওঠা যায় না বলে মালা সভাতেই ছেড়ে আসতে হয়। তা হোক। মালা তো পরেছি। এখন যে মালা পরাতে আসে তার গলাতেই ফিরিয়ে দিই কায়দা করে। ফুটফুটে মেয়ে, সবে চলতে শিখেছে। দু-একটা সভায় যুবতীও পেয়েছি। আচমকা মালা বদলে তারা কেমন হয়ে যায়। তুচ্ছ ব্যাপার অথচ কি গভীর প্রতিক্রিয়া।

নোট পাঁচটা ডায়েরির খোপে ভরে ফেললুম। সামনের ছাদ ফাঁকা। উদাসী বাউলের মত হলুদ একটা শাড়ি বাতাসে দুলছে, ভোলামন, মন আমার। আমার কি ভীমরতি হল। এক বছরও হয়নি আমার বউ মারা গেছে। রেখে গেছে অজস্র মধুর স্মৃতি। রেখে গেছে পাঁচ বছরের একটি শিশু। সেই শিশুটি এই মুহূর্তে শহরের সেরা একটি স্কুলে হামপ্‌টি, ডামপ্‌টি পড়ছে। মাত্র মাসখানেক হল আমার এই নতুন ফ্ল্যাট শেষ করে পুরনো পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি। এখনও খুচখাচ অনেক কাজ বাকি। ধীরে ধীরে শেষ হবে। গোপার খুব ইচ্ছে ছিল নিজের বাড়ি নিজের হাতে নিজের মত করে সাজাবে। মানুষের ইচ্ছে আর নিয়তির হাসি। আমার সামনের পেলট্রিক দেয়ালে গিল্টিকরা ফ্রেমে গোপা সেজেগুজে স্থির হয়ে আছে। মুখে সেই বিখ্যাত হাসি। বিজয়িনীর হাসি।

আমি কি সাংঘাতিক চরিত্র। গোপার দিকে সারা দিনে কবার তাকাই ! এই তো এতক্ষণ আমার নজর ছিল সামনের ছাদে। চোখদুটো যেন ডাঁশ ভীমরুল। ভ্যান ভ্যান করতে গিয়েছিল ওই ছাদে। একবার এখানে বসে, একবার ওখানে বসে। অথচ গোপার জন্যে সে-রাতে কি হাপুস কান্না। আর একটু হলে সহমরণেই চলে যেতুম। নেহাত ছেলেটার জন্যে থেকে যেতে হল। চিতায়

আগুন জ্বেলে বিড় বিড় করে বলতে লাগলুম, 'তুমি যাও, আমি আসছি।'

ছবিতে গোপার হাসিটা আজকাল কেমন যেন ঠেকে। ব্যঙ্গের হাসির মতো। ছবিটাকে উদ্দেশ্য করে বললুম—'আমার কোনও দোষ নেই। তুমিই আমাকে বখিয়েছ। তুমিই শিখিয়ে গেছ কি আর কি। বড় নেশাতে পড়েছি শ্যামের বাঁশিতে। আমার এই মন, আমার এই চোখ, তোমার খেলাতেই তৈরি। তুমি অমন করে তাকিও না। আমি যাকেই দেখি, তোমাকেই দেখি।'

গোপা মনে হয় বুঝল। ঠোঁটের বাঁকা হাসি সহজ হল। মনে বেশ শান্তি পেলুম। এ কথাও বললুম, 'দ্যাখো আমি লেখক। কৃষ্ণেন্দু, অপরেশ, অনিল না হতে পারি, একজন দুজন প্রকাশক বাড়ি বয়ে এসে টাকা দিয়ে লেখা বায়না করেন। লেখকের সাতখুন মাপ। তাছাড়া তোমার জানা উচিত অরক্ষিত পুরুষ তেমন সুরক্ষিত নয়। তোমার আঁচল সরালে কেন ? এখন কত রকমের বাতাস গায়ে লাগছে।'

আমার স্ত্রীর ছবির সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে বেরোবার প্রস্তুতি শুরু করলুম। কাগজের অফিসে চাকরি। মন্দ নয়। বেশ একটা বুদ্ধির বাতাস লাগে গায়। ইন্টেলেকচুয়াল হ্যালো আছে। তবে জমা-জল আর মানুষের গর্ব শুকিয়ে যেতে বেশি দেরি হয় না। সবই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। তৃপ্তি কোথায় ? আরো চাই। আরো আরো চাই।

আমার মা বড় সাধ করে একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। ষষ্ঠীতলার চারু মুকুজ্যে নাম-করা পরিবার। এক ছেলে দুই মেয়ে। চারু মুকুজ্যের বড় মেয়ে গোপা আমার বউ। ছোট মেয়ে সোমা বেনারসে কোনও এক নাম-করা স্কুলে সমাজবিজ্ঞান পড়ায়। সোমা সুন্দরী ; কিন্তু বিয়ে করবে না। সে এক অদ্ভুত কারণ। সোমার শরীরে কোথাও একটা সাদা দাগ আছে। আমি দেখিনি। আমি জানি না। শুনেছি। এও শুনেছি, সোমার আশঙ্কা, ওই টাকার মাপের সাদা দাগ একদিন সারা শরীরে ছড়াবেই। যাকেই সে বিয়ে করুক, তখন সে সোমাকে ঘৃণা করবে। ছোঁবে না। মেয়েরা হয়তো প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকে। মেয়েদের ব্যাপার আমি অবশ্য তেমন বুঝি না। তবে শুনেছি। সোমা সাদা দাগ ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে। জানি না বাবা, এ কেমন মাথা। এত ভবিষ্যৎ ভাবলে বাঁচা যায় না। তিন মাস আগে আমি সোমাকে দেখেছি। চমৎকার মেয়ে। শরীরের যতটুকু দেখা যায় কোথাও দাগ খুঁজে পাইনি।

চারু মুখোপাধ্যায় মারা গেছেন। শ্বশ্রূমাতা জীবিতা। পর পর দুটো মৃত্যুর আঘাতে ভেঙেই পড়েছেন। আরো ভেঙেছেন আমার বড় শ্যালকের জন্যে।

বয়েস বেশি না। কিন্তু দিন দিন দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। অধ্যাপক মানুষ। চোখ চলে গেলে কি হবে—বড় বেদনার ব্যাপার। তবে বিয়ে করেননি। সাধুপ্রকৃতির, দিলখোলা মানুষ। গানবাজনা করেন। ভালই জানেন। কথায় কথায় বলেন, সঙ্গীতই হবে আমার শেষের জীবিকা।

বাঙালীর বোলবোলা এক পুরুষেই শেষ হয়ে যায়। তাদের আবার প্রেম সেক্স, বিপ্লব, ব্যারিকেড। ফটিকবাবুর ফর্মুলায় উপন্যাস লিখতে হবে। পাবলিক যা খায় সেই ভাবেই পরিবেশন করতে হবে। উপায় কী। ওই দেখে শুনে একটা ক্যারেকটার ধরতে হবে। নিজেকে নিয়ে তো আর লেখা যাবে না। প্রেমও করিনি। রেপও করিনি। লাশও ফেলিনি। দাদাদের সঙ্গেও খাতির নেই। মা বিয়ে দিলেন। এক বছর বউয়ের সেবা খেলেন। আশ্বিনে পরলোক যাত্রা। নাতির মুখ দেখার অবসর হল না। শুনেই গেলেন গোপার ছেলেপুলে হবে। গোপাও সরে পড়ল। সব যেন ঝটিতি ঘটে গেল। আর আমি পড়ে গেলুম ফাঁদে। আমি এখন কী নিয়ে বাঁচি। এই নতুন ফ্ল্যাট আমার। ঘরের পাশে ঘর। ঝুল বারান্দা দক্ষিণে। পশ্চিমে কৃষ্ণচূড়ার সবুজ বাহার। একবার এদিক যাই, একবার ওদিক যাই। যারা চলে গেল তাদের যে ফিরিয়ে আনব সে উপায়ও নেই। এমন এক নাট্যকারের পাল্লায় পড়েছি। নাটকের এক একটা অঙ্ক একবারই হবে। যেসব চরিত্র মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তাদের আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমার ঈশ্বর এমনই এক ডিকটেটার। তাঁর রাজত্বে বসবাস। রাগে, অভিমানে, বেদনায় মাঝে মাঝে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে। গোপার সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা জমে ছিল ভাল। ভেবেছিলুম শেষ অবধি চলে যাব হাত ধরাধরি করে। একটা টুসকি। তাসের ঘর ভেঙে পড়ে গেল। এই ফ্ল্যাটটা বেচে দোব। দিনগত পাপক্ষয় করে হাওয়া হয়ে যাব।

তা কি আর হবে! ছেলেটার কথা তো ভাবতেই হবে। কত বড় একটা সম্পত্তি আগলাবার ভার দিয়ে গেছে গোপা। যাক এখন বেরিয়ে পড়া যাক। রাস্তায় নামলে তবু একটা লক্ষ্য পাওয়া যায়। যেতে হবে। কোথাও না কোথাও যেতে হবে। হয় অফিসে, না হয় কাঞ্চনের স্কুলে। ছুটির পর ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ করে। কখন বাবা আসবে। এই বিশাল শূন্যতায় ওই ছোট্ট প্রাণটুকুই আমার পূর্ণতা। ভরাট করে রেখেছে। ও বড় হবে, সেই অপেক্ষায় বাঁচা। গোপার ছেলে বড় হবে।

সামনের বাড়ির গ্যারেজ থেকে লাল টুকটুকে মারুতি বেরিয়ে আসছে। আমার পাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলে গেল, যেন শিস দিতে দিতে, পান চিবোতে চিবোতে চলেছে আপন মনে। দেখলেই লাল লিপস্টিক লাগান কামুক ঠোঁটের

কথা মনে পড়ে যায়। অমন ঠোঁট অবশ্য আমার জীবনে আসেনি। গোপার এক বান্ধবী ছিল। লাল ঠোঁট। সংক্ষিপ্ত মিহি বেশবাস। দু'একবার এসেছে আমাদের বাড়িতে। গোপা থাকা সত্ত্বেও তার পাকা, পরিকল্পিতভাবে উন্মোচিত শরীর দেখে আমার যে ভারি কষ্ট হচ্ছে এই বোধে তার মুখে সদাসর্বদা একটা বিজয়িনীর হাসি লেগে রইল। কিছু মানুষের কত সহজে মাথা ঘুরে যায়। যেমন আমার। সেই মহিলাকে আজও ভোলা সম্ভব হল না। মনে একটা পাকাপাকি ছাপ রেখে গেছে। মাঝে মাঝে গোপাকে ওই রূপে ওই সাজে দেখার ইচ্ছে হত। মাঝে একবার পার্কস্ট্রিটে মহিলাকে এক ঝলক দেখেছিলুম। বেশ চটকদার একটা গাড়ির সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসে ফুরফুর করে চলেছে। বাতাসে চুল উড়ছে। চোখে সানগ্লাস। নিমেষের জন্যে মনে হয়েছিল কলকাতাটা কি মিষ্টি শহর।

গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যেতেই কায়দা করে সামনের বাড়ির দোতলার বারান্দার দিকে তাকালুম। হিসেবে ভুল হয়নি। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেও দেখল না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমি কি ক্রমশই কুৎসিত হয়ে যাচ্ছি। মনে অবশ্যই কুৎসিত হয়েছি; কিন্তু চেহারায়। অল্প একটু ভুঁড়ি মত হয়েছে। সে তো সকলেরই হয়। মেয়েদেরও হচ্ছে আজকাল।

চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করলুম স্টপেজের দিকে। মন অভিমানে টসটস করছে পাকা ফোড়ার মতো। আমি এত বড় একটা ইনটেলেকচ্যুয়াল। একমাথা এলোমেলো ঝুমকো ঝুমকো চুল। চোখে দামী ফ্রেমের চশমা। পড়ি না পড়ি আমার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে। মুখে উদাসী ভাবের আলপনা। মেয়েদের দিকে তাকাবার নেশা পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। ভদ্রলোক সেই ইনটেলেকচ্যুয়ালকে পাত্তা না দিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন হুস করে। খাতির করে একটা লিফ্‌ট দিতে পারতেন। 'গোঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' একি আজকের কথা!

এইসব ভাবতে ভাবতে, গরমে ঘামতে ঘামতে, মাথা নিচু করে আপন মনে চলেছি। দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ালেন। পরিধানে ধুতি আর হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। ফর্সা টকটকে রঙ। মধ্যবয়সী। মুখ আর সাজপোশাক দেখে মনে হল অধ্যাপক। বুক চিতিয়ে, ভুঁড়ি ফুলিয়ে অপসংস্কৃতির বিজ্ঞাপনের মত সামনে খাড়া।

'নতুন এলেন?'

'আজ্ঞে তা প্রায় মাস দুয়েক হল।'

'বেল। ওই নতুন ফ্ল্যাটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শুনেছি লেখেন--টেখেন।'

'ঠিক শুনেছেন।'

'কাগজের অফিসে কাজ করেন?'

'তাও ঠিক।'

'ফিউচার আছে?'

'প্রশ্নটা বুঝলুম না।'

'সিকিউরিটি আছে? মাইনেপত্তর কেমন?'

'মন্দ না। চলে যায় কোনও রকমে।'

'প্রোমোশানের চ্যানেল আছে!'

'ইংলিশ চ্যানেলের মতো প্রশস্ত নয়, অনেকটা টালি নালার মতো। ঠেলতে পারলে এগনো যায়।'

'গত বছর পুজো সংখ্যায় একটা উপন্যাস ছিল!'

'ধরেছেন ঠিক।'

'আমি আবার আজেবাজে জিনিস পড়ে সময় নষ্ট করি না। আপনি এ পাড়ায় এসেছেন শুনে ওরা সেদিন বলছিল।'

'ওরা মানে?'

'আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে। ওরা আবার সর্বভুক্। ওরাই বলছিল, শুরুটা ভালই করেছিলেন, শেষটা ঝুলে গেছে। লেখা কি অত সহজ মশাই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাঙলাদেশে কলম ধরতে হলে কবজির জোর চাই।'

'প্রিং ডাম্বেল ভাঁজতে বলছেন?'

'আঁতে লেগেছে মনে হচ্ছে। ডাম্বেল বারবেলের ব্যাপার নয়। চাই প্রতিভা। রবিবার খাওয়াদাওয়ার পর পুজো সংখ্যাটা নিয়ে শুয়েছিলুম। দু-চার পাতা পড়ার পর ঘুম এসে গেল। লেখাটার তেমন টান নেই। ভেবেছিলুম সন্ধের পর একবার চেষ্টা করে দেখব। তা বইটাই আর খুঁজে পেলুম না। হয়েছে কি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি। বুকের ওপর ছিল। যেই পাশ ফিরেছি খাটের ওপাশে পড়ে গেছে। সে এখন বিশ বাঁও জলে। সব মালপত্তর ঠেলেঠুলে সরিয়ে বের করতে হবে। ভজঘট ব্যাপার। যাক আলাপ হল। আপনাকে আমি কাজে লাগাব। ছাড়বো না সহজে। রবিবার সন্ধের দিকে থাকেন?'

'না।'

'অন্যদিন?'

'অনিশ্চিত।'

'অ্যভয়েড করতে চাইছেন?'

'না না, তা কেন?'

'তাহলে বলছেন কেন থাকি না। অনিশ্চিত। দ্যাটস্ ভেরি ব্যাড অফ ইউ। দু-ছত্তর লেখা বেরতে না বেরতেই অহংকার। আচ্ছা চলি। সি ইউ সামটাইমস্।'

ভদ্রলোক রাজকীয় চালে উল্টো দিকে হাঁটা দিলেন। আমি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর মনে মনে বেশ কিছুক্ষণ হাসলুম। মূর্খ! একে কি বলে জানিস, সোস্যাল আকুপাংচার। সমাজে বাস করবে, আবার নাম করার চেষ্টা করবে, লোকে তোমার চলার পথ গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে ঢেকে দেবে! গাধা। চল অফিস চল।

দু'পা এগোই আর মন খচখচ করে, ভদ্রলোক সুন্দর। স্ত্রী অবশ্যই সুন্দরী। মেয়ে অতি অবশ্যই পরমাসুন্দরী। তাঁরা বলেছেন, শুরুটা ভালই হয়েছিল, শেষটা গেঁজে গেছে। আহা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করা হল না—মশাই, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অপরেশ মজুমদার, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেব গুহর লেখা কেমন লাগল। ওঁদের পাশে আমার লেখা কি একেবারেই অচল। কোনও রকম ক্ষমা-ঘেন্না করেও কি ক্ষেপে ক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পড়া যায় না!

আবার মন থেকে ঘিনঘিনে চিন্তা ঝেড়ে ফেললুম। আবার ফিরে এল। ফটিকদাও বলছিলেন স্পিড চাই। কথা দিয়ে কথা দিয়ে, পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে এগোলে চলবে না। রকেটের বেগ চাই। তাহলে লেখার ধরন কি দাঁড়াবে! লিফ্ট। সাততলার অ্যাপার্টমেন্ট। বেল। কে? আমি। ও খুলছি। খুলল। লীনা। তুমি এসময়ে? হট। ভেরি হট।

না, দুবার হট বলার প্রয়োজন নেই। একটা হট বাড়তি। কেটে দাও। দুটোই কেটে দাও। মুখে হট বলার কি আছে? কাজে দেখাও! তাহলে কি দাঁড়াবে?

তুমি এসময়?

হুঁ।

জড়িয়ে ধরলুম। ডিভানে পড়লুম।

এই জায়গায় সামান্য একটু সাহিত্যের ফোড়ন দেব কি? ফটিকদা, কি বলেন আপনি? পাবলিক খাবে তো?

সামান্য একটু দিন, তা না হলে ভীষণ ন্যাড়া লাগছে।

তাহলে দি হাল্কা করে এক ডোজ চাপিয়ে।

কখনও আমি ওপরে। কখনও লীনা ওপরে। শেষে ওপরও নেই, নিচও নেই। সব একাকার। বিচ্ছুরিত, বিস্ফারিত চিত্রপট। এভারেস্টের গা বেয়ে

হিমবাহ নেমে আসছে সগর্জনে। গোমুখসে প্রবাহিত গঙ্গা। প্লেটে গলছে আইসক্রিম। একটু আগে বৃষ্টি থেমেছে। ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে টিনের চালের কোণা বেয়ে। যতদূর দেখা যায় বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত। শেষ মাথায় অ'কাশের গা বেয়ে শেষ রাতের তস্করের মতো রমণক্লান্ত চাঁদ উঠছে। সামনের বাড়ির লাল মারুতি ছুটে আসছে। না মারুতি নয়,লীনার রাঙা ঠোঁট। পড়ছে গলছে গালায় আগুন লেগেছে। লেফাফা সিল করছে হেডাপিসের ডেসপ্যাচার মধ্যবয়স্কা নিভা। লীনা উঠে বসেছে।

এরপর কি করব ফটিকদা ?

এরপর কি করে ? বাস্তবে কি হয় ?

তা তো জানি না। লীনাকে তো কোনও দিন জাপটে ধরিনি। গোপাকে সাপটেছি। তাও শয্যায়। নিজের রাইটে। সে বলত, খুব হয়েছে ট্যাঁড়স, পাশ ফিরে শান্ত হয়ে শোও। তবে অপরেশবাবুর উপন্যাসে যা হয় পড়েছি। কারুর মতো যেন না হয়। স্বকীয়তা থাকা চাই।

তাহলে এই করি, লীনা মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। অনাবৃত চওড়া পিঠে ঘাম চিক চিক করছে। লীনা মৃদু গলায় বললে—যাঃ, তুমি একটা যা-তা। আমি বিবাহিতা।

সো হোয়াট ! আমি বিবাহিত।

লীনা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে। চওড়া পিঠের ওপর আমার লোভী চোখ ঘুরছে। আমি মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।

আমি টাইগার প্রোজেক্টের টাইগার। পার্ক স্ট্রিটের রম্য রেস্তোঁরায় সিজলারে মাংসের টুকরো চটরপটর করছে। সগর্জনে খুমবু হিমবাহে ঢল নামছে। আমি ব্ল্যাঙ্ক করে লীনাকে ধরলুম। দু'জনে গড়িয়ে পড়ে গেলুম কার্পেটে। হাত লেগে উল্টে গেল সেন্টার টেবল। কাটগ্লাসের শৌখিন অ্যাশট্রে ঠিকরে চলে গেল কোণে। আমার বিবেকের মত ভেঙে টুকরো টুকরো। পাশের ঘরের ভারি পর্দা দুলে উঠল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরিহিত লীনার স্বামী বেরিয়ে এল ধীর পায়ে। সেন্টার টেবলটা তুলতে তুলতে বললে, সব কিছুর মধ্যে একটা ডিসেন্সি থাকা উচিত,লীনা। জানবে, সেক্স ইজ অ্যান আর্ট— ইয়েস, অ্যান আর্ট !

আমি বললুম, প্লিজ গিভ মি এ হট ব্যাগ। আই হ্যাভ স্প্রেনড্ মাই স্পাইন।

আরে, আপনি ইংলিশ মিডিয়াম ?

অফকোর্স।

মি টু।

লীনা বললে, আমিও। গিভ মি এ সিগার প্লিজ।

কেমন হল ফটিকদা ? বেশ জম্পেস না ? পাবলিক খাবে তো !

নয়া জমানার লেখা নিয়ে এমন মশগুল যে একের পর এক বাস, মিনি থামছে, চলে যাচ্ছে; খেয়ালই নেই। এবার একটা মিনি আসতেই ঝট করে উঠে পড়লুম। ভাগ্য ভাল। বসার জায়গাও মিলে গেল। গোটা দুই স্টপেজ এগোতেই জনলার ধারে প্রোমোশান।

ছুটছে মিনি। ছুটছে আমি। ভাঙাচোরা কুৎসিত কলকাতা উল্টোদিকে ছুটছে। আমাদের ছাত্র জীবনের শান্ত সুন্দর কলকাতা আর নেই। আর ভাবতে পারি না। মানুষ মরে, শহর মরবে না ! নিউইয়র্ক, প্যারিস, ব্রাসেলস, কলকাতা। ভেতরটা কেমন করে ওঠে। সিটি ফাদারস্, শহর-পিতারা একটু আঁখি মেলো। শহরে স্কুটার, মটোর সাইকেল, মোপেডের সংখ্যা খুব বেড়েছে। হেলমেটের পর হেলমেট, গোল গোল বলের মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে।

ঈশ্বর তোমাকে যখন যে অবস্থায় রাখবেন, তাইতেই সন্তুষ্ট থাকবে। বেশি আশা কোরো না, হতাশাই বেড়ে যাবে। জনলার ধারে বসে শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় ছুটে যেতে বেশ লাগে। কত রকমের বাঁচা চোখে পড়ে। তেমন যে লিখতে পারি না। কলমের সে রকম বেপরোয়া শক্তি থাকলে ফাটিয়ে দিতুম। ওই যে গাছতলায় উদাসমুখে ফিকে হলুদ রঙের শাড়ি পরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে,তাকে আমার নায়িকা করতুম। আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই থাকে ওই রকম। তেমন সুখের জীবন নয়। ছোট ছোট স্বপ্নের মালা গাঁথে। দিন ফুরোলেই সব ঝরে যায় শুকিয়ে।

দুঃখের যে কি নেশা ! খাঁ খাঁ দুপুরের মত মাতাল করে তোলে। চরিত্রের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। পৃথিবী বড় আপন হয়ে ওঠে। প্রকৃতি কত কাছে চলে আসে। এই যে গোপা নেই, কেউ নেই, ভীষণ একটা কষ্ট, ভীষণ হাহাকার, খারাপ লাগে না। হাসার চেয়ে কাঁদতে ভাল লাগে। হঠাৎ এই ফ্ল্যাটটা পেয়ে গিয়ে দুঃখটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছি না। বিষয় বড় বেয়াড়া জিনিস। বিষয় বিষ। দিনকতক দেখি তারপর বেচে দোব। খুব হয়েছে। আর আমি নতুন করে পিঁড়েতে বসতে পারব না। নতুন সংসার, অসম্ভব। ছেলেটা তো হস্টেলেই থাকবে। কি হবে আমার চার কামরার মঞ্জিল ! আজকাল সব সময় সব কিছুতেই মনে হয়—কি হবে ? কি হবে বেঁচে, লিখে, বই প্রকাশ করে ! কি হবে চাকরি করে ! কি হবে পড়ে !

শহরের ও-তল্লাটে থাকার সময় সম্মানিত প্রবীণ ডাক্তার সুরেন সরকার বেশ মিষ্টি জুতো মেরে আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিয়েছিলেন। অহংকার চুরমার করে দিয়েছিলেন। তখন খুব অভিমান হয়েছিল। এখন ভাবি বেশ করেছিলেন। জীবন-ফানুস থেকে যত তাড়াতাড়ি পিন ফুটিয়ে বাতাস বের করে দেওয়া যায় ততই ভাল। প্রথম জীবনে মানুষ ঘোরে থাকে। খানিকটা চ্যাংড়ামি খানিকটা আঁতলামি, অল্প বাঁদরামি মিলিয়ে যত বারফট্টাই! প্রথম উপন্যাস সবে বেরিয়েছে। ভেতরটা ছটফট করছে। সকলে জানুক, দেখুক, পড়ুক। বাহবা দিক। ঘরের টেবিলে এক কপি খাড়া করে রেখেছি। দু-চারজনকে সই করে উপহার দিয়েছি। এক সেট পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি তৈরি করিয়েছি। খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে সাইড ব্যাগ কিনেছি। আয়োজনের ত্রুটি নেই। কম বয়সে মানুষের অনেক ভীমরতি হয়। সেই পাজামা আর পাঞ্জাবি উড়িয়ে শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে হাজির। হাতে আমার প্রথম উপন্যাস। সাংঘাতিক তার নাম 'তোমার আমার'। কায়দার লেখা। পুরোটাই ফ্ল্যাশ ব্যাকে। বর্তমানের ব নেই, সব অতীত। তুমি আমায় কি বলেছিলে, আমি তোমায় কি বলেছিলাম। সব ভালো ভালো কথা। বই হয়ে বেরোবার পর নিজে আর একবার পড়ার চেষ্টা করে কেঁদে ফেলেছিলুম। মনে হয়েছিল পুলিসের স্বীকারোক্তি আদায়ের থার্ড ডিগ্রি। যে কোনও অপরাধীকে পড়তে দিলে, একপাতার পরেই বই ফেলে দিয়ে অপরাধ কবুল করে বসবে। আজকাল শুনেছি। চৌমিন দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। ঢাউস এক পাত্রে ওই ন্যালন্যালে কেঁচোর মত জিনিস গরম গরম, সামনে অপরাধী। খা ব্যাটা। ও তো খাওয়া যায় না, গিলতে হয়। চামচে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখে ঢুকিয়ে যাও। গলা থেকে পেট অবধি টানাপোড়েন। কোথাও ছেদ নেই। একবার শুরু করলে শেষ অবধি না ঢুকিয়ে থামা যাবে না। যেন মালগাড়ি চলেছে। শেষ বগিটা না যাওয়া পর্যন্ত লাইন ক্লিয়ার হবে না। পেটে ঢুকছে তো ঢুকছেই। শেষে ড্যালাড্যালা চোখে অপরাধী অফিসারের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় জানালে, বলবে। চোরাই মাল কোথায় আছে বলবে। অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার থেকে কাঁচি বের করে কুচ করে ন্যুডলসের জট কেটে দিলেন। আমার উপন্যাস আর চৌমিন এক জিনিস। মানুষের ওপর থার্ড ডিগ্রি।

প্রবীণ ডাক্তারবাবু বারান্দায় বসে আছেন। গেরুয়া পোশাক। হাতে স্বামী বিবেকানন্দের বই। সূর্য পাটে বসেছেন। পশ্চিম আকাশ লাল আগুন। ডাক্তারবাবুর চোখ চলে গেছে দিনান্তের আকাশে। মুখে খেলছে অদ্ভুত প্রশান্তি। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'কী চাই?'

প্রণাম করে বইটি হাতে দিয়ে বললুম, 'আমার প্রথম উপন্যাস। আপনার করকমলে।'

বলতে বলতে আমার ভাব এসে যাচ্ছিল, 'এক সময় আপনি আমাকে সাংঘাতিক ডিসপেপসিয়া থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, বেঁচে গিয়েছিলুম বলেই এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অনুগ্রহ করে আপনি পড়ে দেখবেন।'

গম্ভীর গলায় বললেন, 'তখন বলো নি তো!'

'আজ্ঞে কী বলিনি?'

'তোমার এই রোগ আছে?'

আমার মনে হল উনি আমাকে আদর করছেন। সোহাগ করছেন। করবেনই তো। আমি এই পাড়ার কত বড় কৃতী সন্তান। অনেকেই তো কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন, 'আমার আবার একটু লেখাটেখার রোগ আছে।' সোহাগ করলে বেড়াল যেমন ঘড়ঘড় করে, আমিও সেই রকম গলায়, লজ্জা লজ্জা করে বললুম, 'আজ্ঞে এ কী আর বলার মত ব্যাপার!'

'তা ঠিক, গুপ্তব্যাধি। লজ্জা করে না?'

হঠাৎ গলা চড়ে গেল।

'লজ্জা করে না, বুড়ো দামড়া! পৃথিবীতে করার মতো কাজ পেলে না! উঁ, আবার নাম রাখা হয়েছে, 'তোমার আমার'। কী আছে এতে?'

অপমানে আমার কান গরম হয়ে উঠেছে। কোনও রকমে বললুম, 'আধুনিক উপন্যাস'। নব রীতিতে লেখা।'

'বুঝেছি হে ছোকরা। তুমি হল একটা মেয়ে আর আমি হল লেখক নিজে। সেই তোমার সঙ্গে আমার যত্ত ফষ্টিনষ্টি। শোন হে ছোকরা, আমার সময় অত সস্তা নয়। আমার সময়ের দাম আছে। তোমার ওই আত্মপ্রলাপ পড়ার মতো সময় আমার একদম নেই। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার বই।'

মার খাওয়া কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছি, ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'শোনো, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, তারপর সব শূন্য। সব ডিসপেপটিক সাহিত্য। বাজে সময় নষ্ট না করে কিছু কাজের কাজ করার চেষ্টা করো। বাঙালীর অতি দুঃসময়।

ডাক্তারবাবু আর নেই। আমি আছি। কাজের কাজ কি আর করব! পরিশ্রম পোষায় না। সহজ কাজ, জ্ঞান দেওয়া। পাকাপাকা কথা বলা। ছাপার অক্ষরে দু-চারবার নাম দেখাতে পারলেই সার্টিফিকেট মিলে গেল। বুদ্ধিজীবী। প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট ওড়াও আর মুখেন মারিতং জগৎ।

শীততপনিয়ন্ত্রিত অফিস। আমার আগে আগে বিধুবাবু ঢুকছেন। নাকে পাটকরা রুমাল। ডাক্তারের নির্দেশ বাইরের গরম থেকে ভেতরের ঠাণ্ডায় হঠাৎ প্রবেশের সময় সাবধান। নাক দিয়ে ঠাণ্ডা ঢুকে ফুসফুসে চামর বোলালে চিরস্থায়ী ব্রংকাইটিস। বিধুবাবুর দেখাদেখি অনেকেই নাকে রুমাল চাপা দিতে শুরু করেছেন।

সকলেই ভীষণ বাঁচতে চায়, অথচ মৃত্যুর কি দাপট! একবার নোব মনে করলে রক্ষে নেই।

অফিসে ঢুকলেই আমার অন্য চেহারা। কে এগলো, কে পেছলো! ট্র্যাকে আমি এখন কোন্ পজিশানে? থেকে থেকে কাজ রয়ে রয়ে পরচর্চা। বড় কাগজের অফিস আজকাল আধুনিক যন্ত্রে সেজে উঠেছে। তার জ্বালা কম নয়! ইংলিশ মিডিয়াম কম্পোজ যন্ত্র বাঙলা ভাষাকে চিবিয়ে শেষ করে দিতে পারলে বাঁচে। যুক্তাক্ষর দেখলেই খচ্চচ বলার প্রবণতা।

চেয়ারে বসতে বসতেই হুঙ্কার—'চা বোলাও'।

॥ দুই ॥

আমি আবার গাছটাছ তেমন চিনি না। শহরেই জন্ম। শহরেই মৃত্যু হবে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে আর বিষাক্ত বাতাস নিয়ে। আমার ছেলের নাম কমল। গোপা বলেছিল, দাঁত ভাঙা, বিদঘুটে, ইনটেলেকচ্যুয়াল নাম রেখে ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট কোরো না। সুন্দর একটা মিষ্টি নাম রাখ।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। কমল সেই গাছের তলায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মা-মরা শিশুটি। স্কুলের গাড়ি আছে। আমি ইচ্ছে করেই গাড়ির ব্যবস্থা করিনি। বড় সময় নষ্ট হয়। ঘুরে ঘুরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে যাওয়া আসা। আমার একটু পরিশ্রম হচ্ছে, হোক। তাছাড়া ছেলেটার ওপর একটু টান থাক। শেষ যৌবনে মৃতদার মানুষকে বিশ্বাস না করাই ভাল। কখন কোথায় বাঁধিয়ে বসে থাকবে! গর্তে পড়ার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে মরে। তখন কে ছেলে, কার ছেলে! সব ভেসে বেরিয়ে যাবে।

'কমল!'

কিছুদূর থেকে রোজ আমি এইভাবেই ডাকি। বেশ দেখতে হয়েছে আমার ছেলেটাকে। টুকটুকে ফর্সা। ধারাল মুখ। বড় বড় নিষ্পাপ নীল দুটি চোখ। পৃথিবীর নোংরা ঝাড়ু এখনও গায়ে লাগেনি। আমাদের বংশে কেউ এমন সুন্দর ছিল না। মামার বাড়ির দিকেই গেছে। ছেলেটার ভাগ্য ভাল। চেহারা একটা

বাড়তি সম্পদ।

কমল সব সময় নিজের ভাবে থাকে। ওর জগৎ আলাদা। আমার জগৎ আলাদা।

কমল ঘুম ঘুম চোখে এগিয়ে এল। ওদের স্কুলের ইউনিফর্মটা ভারি সুন্দর। হাত বাড়িয়ে দিলুম। হাত ধরল। আমরা দু'জনে এগিয়ে চলেছি ফুটপাথ ধরে। বড়লোকদের গাড়ি এসেছে রঙ-বেরঙের। রাস্তাটা একেবারে ভরে গেছে। প্যাঁ পোঁ হর্ন। গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ। নানা ভাষায় নানা কথা বাতাসে উড়ছে। উড়ছে বড়মানুষের মেয়েদের শাড়ির আঁচল। ফুরফুরে আধুনিক চুল। এ যেন পরীদের সম্মেলন। রাস্তার দুধারে গাছ। বেশ টিপটপ জায়গা।

ভিড় ক্রমশ পাতলা হচ্ছে, যত এগোচ্ছি। কমল আপন মনে পাশে পাশে হাঁটছে। এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ বললে, 'তুমি একটা কাজ পারবে?'

'বলো বাবা?'

'তুমি এখন আমাকে একটা চকবার আইসক্রিম খাওয়াতে পারবে?'

'বাবু,ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়, তবে তোমার যে টনসিলের ধাত। সারা রাত কাশবে।'

'তাহলে জীবনে আর আমি আইসক্রিম খেতে পারব না!'

'দূর বোকা,জীবন তো সবে শুরু হল। এখনও কত বাকি। কত দেশ ঘুরবি। কত কি দেখবি। কত কি খাবি!'

'তাহলে তুমি আমাকে ওই নাসারী থেকে একটা কদম গাছ কিনে দাও।'

'কদম গাছ?'

কোথায় আইসক্রিম আর কোথায় কদম গাছ!

'কদম গাছ কত বড় হয় জানিস? কোথায় পুঁতবি?'

'টবে।'

'টবে কদমগাছ হয় না।'

'অমিত বলছিল বনসাই করলে টবে বটগাছও হয়। তুমি ওই বিশ্রী বাড়িটা কিনলে কেন?'

'সে কি রে', বিশ্রী কি রে? অমন সুন্দর নতুন ফ্ল্যাট!

'তুমি ওটা বিক্রি করে একটা বাগান কেন। বেশ বড় বাগান। অ্যাঁ বাবা। কাল তো রবিবার! কালই কেন না?' মোড়ে এসে একটা ট্যাকসি ধরে ফেললুম। কমলকে মামার বাড়িতে রেখে আবার আমাকে অফিসে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ কলমবাজি করে, ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরব। কে বলেছিল,

ভাগ্যবানের বউ মরে। সে একটা গাধা।

গাড়িতে ওঠার সময় কমল বললে, 'আমি যদি সামনে বসি তুমি রাগ করবে ?'

'রাগ নয়, দুঃখ হবে।'

'কেন ?'

'সব সময় তুমি আমার পাশে না থাকলে আমার দুঃখ হয়।'

'আমারও যে দুঃখু হল।'

'কেন ? দুঃখু হল কেন ?'

'তুমি আমাকে আইসক্রিমও দিলে না, কদমগাছও কিনে দিলে না।'

কমল শেষ পর্যন্ত আমার পাশেই বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। সোজা রাস্তা পেয়েছে। হু হু করে ছুটছে গাড়ি। কোলের ওপর সুটকেস রেখে কমল ডালাটা খুলে ফেলল। খুঁজে খুঁজে কী একটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'খেয়ে দ্যাখো।'

'অ্যাঁ!'

গোল মত কী একটা জিনিস, সামান্য চটচটে।

'এটা কী রে বাবু ?'

'খাও না, ওপরটা গলে গেলে ভেতরে শক্ত মতো একটা জিনিস পাবে, কুট করে কামড়াবে তখন।'

মুখে ফেলে দিলুম। চকোলেট জাতীয় জিনিস। বেশ ভালই স্বাদ। ভেতরে একটা বাদাম বসে আছে। খুব কায়দার জিনিস।

'কোথায় পেলি রে বুড়ো ?'

গম্ভীর চালে বললে, 'আমি পাই। আমার বন্ধুরা আমাকে কত কী দেয়! জানো কি তা ? এই দ্যাখো।'

একটা ছবি বের করে আমার হাতে দিল। থ্রি-ডাইমেনসানাল ছবি। বেশ মজার জিনিস। একটু এদিক ওদিক করলে আরো দুটো ছবি ফুটে ওঠে।

'এই দ্যাখো। নাড়াও নাড়াও বাজনা বাজবে।'

কমল আমার হাতে একটা কলম দিল। কলমটার ভিতর একটা কিছু করা আছে। এপাশ ওপাশ করলে টুংটাং বাজে।

'তোর বাক্সে কত কী আছে রে বুড়ো!'

'আমি জাদু জানি। দেখবে ? এই দ্যাখো আমার গোঁপ।'

ঠোঁটের ওপর একটা নকল গোঁফ লাগিয়ে, পেছনে হেলান দিয়ে কমল বসে আছে ভারিক্কি চালে। গাড়ি শরৎ বোস রোডের দিকে বাঁক নিচ্ছে। আমরা

প্রায় এসে গেছি। আর একটু পথ। কমল স্যুটকেস হাতড়ে আর একটা চকোলেট বের করেছে। কচি কচি হাত সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে দোলাতে দোলাতে বললে, 'এই নিন। অনেকক্ষণ তো গাড়ি চালিয়েছেন।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে গালে ফেললেন। তারপর পেছন দিকে এক লহমা তাকিয়ে কমলকে দেখে নিয়ে বললেন, 'বেশ ছেলেটি আপনার! দেখবেন জীবনে অনেক বড় হবে এই ছেলে। ভেরি বিগ।'

হুম্!

আমি হাসলুম। সবই নির্ভর করছে আমার ওপর। আমি বেচাল হয়ে গেলে ছেলেটার কী হবে ? কে দেখবে ? একই সঙ্গে মা হতে হবে, বাবা হতে হবে। চরিত্রটাকে ঠিক রাখতে হবে। চরিত্র যে কতভাবে হড়কাতে চায়।

এই রাস্তাটায় ঢোকার মুখে ডানপাশে একটা বাড়ি আছে। সাবেক কালের দোতলা বাড়ি। বেশ ফলাও করে তৈরি হয়েছিল এক সময়। অবস্থা পড়ে এসেছে এখন। মানুষের অবস্থার এই এক দোষ। কিছুতেই সমান যায় না। হয় পড়বে, না হয় উঠবে।

কার্নিসে বট অশথের চারা লক লক করছে। শেষ বেলার রোদে বেশ সুন্দর মনমরা মতো দেখাচ্ছে। এই শ্মশানচারী গাছ দুটি মানুষের দুরবস্থার একমাত্র সঙ্গী। শ্মশানে গোপার চিতা জ্বলছে, আমরা বসে আছি বটতলার বেদীতে। আমার দেশের ভিটেতে বটের স্বাস্থ্য দেখলে আনন্দ হয়। বোঝাই যায় চট্টোপাধ্যায় পরিবার ছারখার হয়ে গেছে।

এই বাড়িটায় মৃগাঙ্ক বোস বলে অদ্ভুত চরিত্রের এক ভদ্রলোক থাকেন। ভেতরদিকে গোটাকতক ঘর আছে বসবাসের উপযোগী। পেছনের বারান্দা রঙবেরঙের বেলজিয়াম গ্লাসে ঘেরা ছিল। একটা দুটো ভেঙে গেছে। বাকি সব এখনও ঠিক আছে।

মৃগাঙ্ক বোস এই পাড়ার সকলের প্রিয়। এমন একজন নিঃস্বার্থ আত্মভোলা মানুষ এ বাজারে দেখা যায় না। একটা ঘরের মার্বেলের মেজে খুঁড়ে তুলে, বিক্রি করে এক দুস্থ মানুষের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করেছিলেন। গোপা বলেছিল, 'আপনি ডাহা বোকা।'

মৃগাঙ্ক বলেছিলেন, 'লাল সিমেন্টের মেজেই তো যথেষ্ট। পোড়ো বাড়িতে ইটালিয়ান মার্বেল কি হবে! তবু একটা মেয়ের বিয়ে হোক।'

মৃগাঙ্ক বোস বিয়ে করেছিলেন। বউ ছেড়ে চলে গেছে। তিনি নাকি খুব আমার আমার করতেন। মৃগাঙ্কর মন্ত্র, তোমার তোমার। নিয়ে যাবে নিয়ে যাও। মৃগাঙ্ক দিতে পারলে বেঁচে যান। হিসেবপত্তর মাথায় আসে না। আমার বলতে নিজেকে ভীষণ নীচ মনে হয় তাঁর। একদিন স্ত্রীকে বললেন, 'তা তোমার যখন পোষাচ্ছে না, এ তো আর রক্তের সম্পর্ক নয়, তুমি তোমার ভাগ্য পাল্টে নাও।' সেই মহিলা এখন অভিনেত্রী। আর মৃগাঙ্ক বসু কাজ করেন গ্রন্থাগারিকের। আমাকে একদিন বলেছিলেন—লিভিং ওয়ার্লডের চেয়ে ডেড ওয়ার্লড ঢের ভালো। পৃথিবীর ভালো যা কিছু সবই হয়ে গেছে।/দেবতার কাল শেষ। বর্তমান হল দানবের কাল। চারপাশে অসংখ্য বই ছড়ান, মাঝখানে মৃগাঙ্ক বোস, মহাসাধক। কমলকে ভীষণ ভালবাসেন—আরে, তুই গোপার ছেলে। অবিকল কীটসের মতো দেখতে হয়েছে। আমি জানতুম, গোপা বেশিদিন বাঁচবে না।

আগে দেখা হলেই, আমাকে বলতেন, বাড়ি করছেন ? জানলা, দরজা কিনতে হবে না। এখান থেকে খুলে খুলে নিয়ে যাবেন। সব বামাটিক। এ জিনিস বর্তমানে দুর্লভ।

মৃগাঙ্কবাবুর আজ ছুটি নাকি ! ভেতরের ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ারে মোৎসার্টের কনসার্ট বাজছে। সুর এক একবার হু হু করে উঠছে ঝড়ের মতো আবার পড়ে আসছে যেন বাতাস।

বাড়িটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। কমল ডাকলে—জেঠু। উত্তর পেল না।

কমলের মামার বাড়িও প্রাচীন, তবে ভেঙে পড়েনি। মাঝেসাঝে হাত পড়ে। দু' এক বছর অন্তর রঙটঙ হয়। সোমা বাড়িটাকে ভীষণ ভালবাসে। ছুটিছাটায় এলে বাড়ির হাল বদলে দেয়। দোরগোড়া থেকেই কমল দিদা, দিদা করতে করতে ভেতরে ছুটলো। এই বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর হল, বাঁধান উঠোন আর সামনে পেছনে টানা দুটো বারান্দা।

কমলের মামা, নীলুদা আমার বাইরের বারান্দাতেই ছিলেন,কমলকে কোলে তুলে নিলেন। কমলের ভেতরটা নানা খবরে টগবগ করছে। শুরু হয়ে গেছে তার মামা, মামা।

নীলাদ্রিশেখর হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে আর কেবলই বলে চলেছেন, 'বলো মামা, বলো মামা।' এরই ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে পারলেন—'কি, আবার অফিসে যেতে হবে !'

'হ্যাঁ, শেষ হয়নি এখনও ঘানি ঘোরানো।'

'এই এক কষ্টকর ব্যাপার তোমার। যানবাহনের যা অবস্থা ! এত ছোটাছুটি। আমার চোখ দুটো ঠিক থাকলে একটু রিলিফ দেওয়া যেত।'

'আপনি ভাববেন না। সবই অভ্যাসের ব্যাপার।'

'চা হচ্ছে। খেয়ে যাও।'

'দেরি হয়ে যাবে। ট্যাকসি খাড়া করে রেখেছি।'

মামার কোল থেকে কমল বললে, 'পারো তো কদমগাছটা এনো।'

'কদমগাছ ?' নীলুদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। শহর এফোঁড় ওফোঁড় করে দৌড়তে হবে। এমন একটা সুন্দর বিকেল কিভাবে মাঠেমারা যাবে ! কোনও মানে হয় ! আমি অনেক ভেবে দেখলুম একমাত্র স্মাগলারের জীবিকাতেই কিছু থ্রিল আছে। একঘেয়ে নয়। আজ প্যারিস, কাল হংকং, পরশু সিঙ্গাপুর। বাতাসে ওড়ো আর আকাশে কেল্লা বানাও।

॥ তিন ॥

বেশ বৃষ্টি পড়ছে। শুয়ে শুয়ে শুনছি। আমাদের দু'জনের সেই জোড়াখাট। যে খাটে গোপা আর আমি অন্তত বছর দশেক কি বছর বারো শুয়েছি পাশাপাশি। ভালোভাবে মনেও নেই ক'বছর। সময়ের হিসেব রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। আজও আমরা দু'জনেই শুয়ে আছি। আমি আর কমল। দেড়খানা মানুষ। তাই খাটটাকে বিশাল মনে হচ্ছে।

ফুলের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। ঘুমোবার আগে ছবির বই দেখছিল। মাথার পাশে পড়ে আছে। একটা নাইটল্যাম্প আমাকে জ্বেলে রাখতেই হয়। কমলের মুখের ওপর নীল আলোর স্বপ্ন খেলা করছে। পাতলা ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে থিরথির করে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে। সারাদিন কত কী করে ! কত উত্তেজনা জীবনে। স্বপ্নে একে একে সব ফিরে আসে। আমারও স্বপ্ন দেখার কাল ছিল। এখন বাস্তবের কড়া আঁচে সেঁকা পাঁউরুটির জীবন। বৃষ্টির জন্যে সব জানালা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। পাখার বাতাসে ভেতরের গুমোট কাটছে না। ছেলেটা খুব ঘেমেছে। ঘুমোলে ভীষণ ঘামে। তোয়ালে দিয়ে পিঠ আর গলা মুছিয়ে দিলুম। কমল নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুল। কাউকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

গোটা দুই পাশ বালিশ করাতে হবে। একবার মনে হল নিজের কোলের কাছে টেনে নি। তারপর মনে হল গরম লাগবে। আরো ঘেমে যাবে।

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ খুব নেমেছে। শ্রাবণের ধারা। এমন বৃষ্টিঝরা রাতে কেবলই গোপার কথা মনে পড়ে। অভ্যাসটা এমন খারাপ করে দিয়ে গেছে! একলা শুতে পারি না। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এখনও তো উনু জ্বলছে। আগুনে ছাই পড়েনি। এইভাবেই রাত কাটে। ঘুম আসে। ঘুম ভাঙে। হরেক রকম স্বপ্নের উৎপাত। মাঝে মাঝে উঠে বসি। আবার শুয়ে পড়ি। আর থেকে থেকে মন চলে যায় সামনের বাড়িতে। এ-দেশের আষ্টেপৃষ্ঠে এত নীতির বাঁধন! কী হয়, একজন পুরুষ যদি একজন নারীর কাছাকাছি যায়! মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! এই নিঃসঙ্গতা ভাল লাগে? না, এ আমি কী করছি? আমার এইসব ভাবা উচিত? নিষ্পাপ শিশুটিকে দেখে শিখতে পার না, পবিত্র জীবন কাকে বলে! মধ্যরাত বড় সাংঘাতিক সময়। এক চিলতে আলো নেই কোথাও। শরীর শিথিল। মনে প্রবৃত্তির দাপাদাপি।

কমলকে জড়িয়ে ধরে আবার শুয়ে পড়লুম। রেশমের মত নরম চুলে আকাশের গন্ধ। শরীর কি সুন্দর শীতল! আমার এই উত্তপ্ত দেহের স্পর্শ দিতে কেমন যেন লাগছে! জীবনের তো দেখি একটাই উদ্দেশ্য—ভোগ। জিভ চাইছে সুস্বাদু খাদ্য। মন চাইছে আরাম। দেহ চাইছে নারীসঙ্গ। এ যেন অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন।

কী জ্বালায় পড়েছি মাগো! সারা রাত আমাকে এই ভাবে জাগতে হবে! জলে ভেজা কাঁচা কাঠের মত ধুঁইয়ে চলেছি। ইদানীং আবার অনেক গুণ বেরিয়েছে। ছবিওলা বিদেশী ম্যাগাজিন দেখতে শিখেছি। শুধু শরীর আর শরীর। বিভিন্ন ভঙ্গি। বিভিন্ন আবেদন।

আমার মাকে মনে করার চেষ্টা করছি। আসছেন না। কিছুতেই না। বাবাকে চেষ্টা করছি। কী আশ্চর্য, মনেই পড়ছে না। একেবারেই না। গোপা।

তখন সংসার সাজাচ্ছি। পাখি যেমন ঠোঁটে করে কুটো এনে এনে বাসা বাঁধে, আমাদেরও সেই খেলা চলেছে। গোপা খুব সাজিয়ে সংসার করত। একবার বাগরী মার্কেট থেকে আমরা দুজনে, ছোট বড় নানা মাপের গোটা চব্বিশ সুদৃশ্য কৌটো কিনেছিলুম। মশলা থাকবে, চা, চিনি, আটা, ময়দা, বেসন। কৌটোর গন্ধমাদন। ওজন বেশি নয়, কিন্তু আনতে জীবন বেরিয়ে গেল। ঘরের মেঝেতে পাশাপাশি সমস্ত কৌটো সাজিয়ে আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলুম দুজনে। মনে হল দুজনের জীবন সেই মুহূর্তে একটা কিছু ধরতে পেরেছে, তা হল আনন্দ। ক্লান্ত গোপা হঠাৎ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ঘাম ঘাম, তেল তেল ফর্সা মুখ। গালে গোলাপী আভা। টিকোলো নাকে লালপাথরের নাকছাবি। পেছন দিকে দু হাত তুলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মাথাটাকে ধীরে ধীরে নিচের

দিকে টেনে আনল। ওই সুন্দর শরীর। লাল চকচকে মেঝের ওপর লুটিয়ে আছে শরীর। হাল্কা নীল সিল্কের শাড়ি। ভারি নিতম্ব ক্রমশ দু ভাগ হয়ে দুটি সুগঠিত পা। অ্যালফ্যানসো আমের পাতলা আঁটির মত ধবধবে সাদা পায়ের পাতা। চারপাশে ছড়ান কৌটোর সংসার। শিশু কৌটো, কিশোর কৌটো, যুবক কৌটো। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। ভিজে ভিজে ঠোঁট। ঘরে আলো জ্বলল না। ছমছমে অন্ধকার। বারান্দার আকাশে বুটিদার তারা।

আর এইভাবে, এইভাবেই, টুক করে এসে পড়ল কমল। কেউ যদি প্রশ্ন করে, কমল তুমি কোথায় জন্মালে? উত্তর হবে ভালবাসায়।

ফটিকদা, তোমার ওই বেস্ট সেলার উপন্যাসে বলেছ, আধসের প্রেম ঢালতে। বিবাহিত প্রেম কি পাবলিক খাবে? পোয়াটাক রেপ-এর রসুন ফোড়ন। জ্বালাময়ী জ্বালিয়ে দাও।

কমল খিল খিল হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখেছ।

কী অদ্ভুত মানুষের মন! আমরা সেই সময় বলাবলি করতুম, ভাগ্যিস আমরা দুজনে আছি, আর কেউ নেই বাড়িতে। মনে করো, বাবা কি মা জীবিত থাকলে, আমাদের কী হত? অপেক্ষায় থাকতে হত, কখন সারা বাড়ির আলো নিভবে। এ কথা আমার মুখ দিয়েই বেরতো। গোপা শুধু হাসত।

এখন ভাবি, আমি কি শয়তান! ঠিক আছে, যৌবনের পর থেকে মানুষের স্ত্রীই সব। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস। তা বলে পিতা-মাতা একেবারে ভেসে যাবে! তার মানে আর বিশ বছর পরে, এই ছেলে আমার মনে করতে থাকবে, বুড়োটা না থাকলেই ভাল হত।

কিন্তু বুড়ো তোর কালে গোপার মত বউ পাবি? বৈদিক মতে বিয়ের প্রথা কি থাকবে? আধুনিকারা ক্ষেপে গেছে। ডায়েরি খুলে ডেট দেখবে। উত্তরপুরুষ বড় হবে ক্লেশে। লাঙা ঠোঁটে আন্টি শেখাবে—ইউ হ্যাভ নো ফাদার, ইউ হ্যাভ নো মাদার, পরারাম, প্যাম প্যাম প্যাম।

কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙলো, ভোর অনেকটা এগিয়ে গেছে স্রোতের ভেলার মতো। শুয়ে শুয়েই শুনছি কমল বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে খুব বকবক করছে।

'তোমাদের বেড়াল আছে কি?'

উত্তরে মহিলাকণ্ঠ, 'একটা আছে। তবে তেমন ভাল নয়। তোমাদের বেড়াল আছে?'

কমল সুর করে বলছে, 'বাবাকে বলেছি, দেখি কী হয়, ছোট মতো একটা বাঘের বাচ্চা পুষবো।'

'কী খেতে দেবে ?'

'দুধ।'

'বাঘে দুধ খায় ?'

'তুমি কিচ্ছু জান না, ভীষণ বোকা, বাঘে দুধ পেলে আর কিছু খেতে চায় না। হ্যাঁগো, তোমাদের কদম গাছ আছে ?'

'না গো, আমাদের বাগান কোথায় যে কদম হবে ?'

'দেশে। হ্যাঁ গো। তোমাদের দেশে ?'

'আমাদের তো দেশ নেই !'

'আমাদেরও নেই।'

কমল হঠাৎ পি পি শব্দ করতে করতে ছুটে ঘরে চলে এল। সারা ঘরে গোল হয়ে তিন চারবার পাক খেয়ে আবার ছুটে চলে গেল বাইরের বারান্দায়। চিৎকার করে ডাকল, 'মাসী তুমি কোথায় ?'

আমি তখনও বসে আছি বিছানায় মশারির ভেতর। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সঙ্গে গত বছর হৃষিকেশে আলাপ হয়েছিল আমার। তখন আমার মন একেবারে খালি। গোপা আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে গেছে। ভেতরে সব সময় একটা হু হু ভাব। স্বামীজী বলেছিলেন, 'বেটা, সুখ চাস ? রূপ চাস ? গন্ধ চাস ? স্পর্শ চাস ? শব্দ চাস ? সম্মান চাস ? সবাই চায় ; কিন্তু পাগলের মতো খুঁজিস কোথায় ? স্পর্শ ? হায় স্পর্শ !'

স্বামীজী স্পর্শের কথা বারে বারে বললেন। চমকে উঠেছিলুম। সত্যিই আমি তখন স্পর্শসুখের কাঙাল। স্বামীজী মৃদু হেসে বললেন, 'বেটা, গদিতে দেখলে পেলে না। কাপড়ে দেখলে পেলে না। ফুলের শয্যায় দেখলে, তার মধ্যেও পাওয়া গেল না। মখমলের বস্ত্রে খুঁজলে কিন্তু পেলে না। যেখানে স্পর্শই নেই সেখানেও অন্বেষণ করলে। স্পর্শকে অন্বেষণ করতে করতে তোমার মতই এক মানব আকৃতিকে পেয়ে তার মধ্যে স্পর্শ সুখ খুঁজলে। কি পেলে ? ধীরে ধীরে তুমি জড় হয়ে আসছ। তোমার লিঙ্গ কি কোনওদিন আর প্রথম রমণের সুখ পাবে মূর্খ ! হে কর্মহীন ! যদি তোমার অন্তরশক্তি জেগে যেত তো পরমানন্দময়ী পরাশক্তি তোমার সর্বাঙ্গে ক্রিয়ারূপে ব্যাপ্ত হয়ে যেত, আরে! তুমি স্বয়ংই স্পর্শের সুখদ সমুদ্র হয়ে যেতে !

হে অচেত মানব, তুমি চেত হও। ধ্যান কর। মোক্ষের জন্যে নয়, ধর্ম সাধনার জন্যে নয়, যোগ পদবী পাওয়ার জন্যে নয়, প্রশংসাপাত্র হওয়ার জন্যে নয়, সংসারে পূর্ণ মানব হবার জন্যে ধ্যান লাগাও। তুমি ধ্যান করো না, সৎকর্ম করো না, নিজের দামী শরীরকে ভালভাবে নির্বাহ কর না ! এ সব ছাড়া তুমি সুখ

পাবে কি করে !'

রোজ সকালে কিছুক্ষণ ধ্যান করার চেষ্টা করি। প্রথমে আমার শরীর। এই আমার পা, জানু, উদর, বক্ষদেশ, দুটো হাত, কণ্ঠ, নাসিকা, চোখ, মাথা। মন-পথিক তুমি এবার মস্তকে স্থিত হও। এর ঊর্ধ্বে আকাশ। ক্রমে মহাকাশ। ওঠো, ওঠো, ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে।

অতই সহজ ! মন গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে সামনের বাড়ির বারান্দায়। কমলের ওপর হিংসে হচ্ছে—কেমন ভাব জমিয়ে নিয়েছে তোফা। আবার আশাও হচ্ছে কমলের থ্রু দিয়ে এনট্রি নেব। সেদিন পাড়ার চায়ের দোকান থেকে মেয়েটির সামান্য ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। পাড়ার রয়টাররা নামও জানে। নাম থেকেই মেরে দিয়েছে। চিনু, কি সুন্দর নাম ? তারপর ডিভোর্সী। এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেছিল। কাটান ছেঁড়ান হয়ে গেছে। পুরনো হুইস্কির মতো গায়ের রঙ। মুঠোয় ধরা যায় কোমর। গুরু নিতম্ব।

বা রে ! কি সুন্দর ধ্যান হচ্ছে আমার ! পরমপদে লীন হয়ে বসে আছি।

কমল নাচতে নাচতে ঘরে এল, 'কি গো বাবা ! তুমি আজ উঠবে না ?'

মুখ নিচু করে আছি। কমলের দিকে তাকাতে পারছি না। ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে ! সাত সকালে এই সব যদি আমার চিন্তা হয়। নীল আকাশ, প্রসন্ন বাতাস, চিকচিক ডানাপায়রা, সব ভেসে গেল। ধ্যানের বস্তু হল একটি শরীর।

র‍্যাসকেল। আমি এত খারাপ। একটা রকবাজ যে আমার চেয়ে ঢের ভাল। আমি আমার ছেলেকে কি শিক্ষা দেব !

বাবু, তুমি জিতেন্দ্রিয় হও।

নেমে এলুম বাসী বিছানা থেকে। যেন কাঁকড়া বিছে কামড়াচ্ছে। সামনের দেয়ালে গোপার ছবি। তাকাতে পারছি না ভয়ে। ওই চিনুর সঙ্গে তুলনা চলে আসছে। গোপা ছিল নির্ভেজাল বঙ্গললনা। নরম। ঠাণ্ডা। সংসারী। প্রাচীন সংস্কারে বিশ্বাসী। কাছে টেনে না নিলে কোনও দিন কাছে আসেনি। চেপে না ধরলে ধরা দেয়নি। চিনু পুরোপুরি অ্যামেরিকান।

সাংসারিক কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমার এই কুচিন্তা কাটবে না। ঘিন ঘিন করে চলতেই থাকবে। এখনও কোনও কাজের লোক যোগাড় করতে পারি নি। শুধুমাত্র পুরুষের সংসারে অল্পবয়সী কি যুবতী মেয়েরা কাজে লাগতে চায় না। ভয় পায়। কেন পায় নিজের চিন্তা দেখেই বুঝছি। কাল রাতের যত বাসন সিঙ্কে পড়ে আছে। এখনও গ্যাস পাইনি। কেরোসিন কুকারই ভরসা।

কমল পড়তে বসে গেছে। ছেলেটাকে খাওয়াতে হবে। আমার তো সকালে

এক কাপ চা হলেই চলে যায়।

'বুড়ো দাঁত মেজেছিস ?'

'ইয়েস।'

'বাবা, সায়েব হয়ে গেলি যে !'

'ইয়েস।'

'ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল, এই তিনটে দিয়ে চালাচ্ছিস বুঝি ?'

'নোওপ'।

যত পারি বকবক করে যাই ছেলেটার সঙ্গে। দেখেছি, ছোটদের সঙ্গে বকবক করলে নিজের শৈশব ফিরে আসে। আহা ! কি সব দিন ফেলে এসেছি পেছনে ! কেন যে মানুষ বড় হয় ?

'বলতে পারিস বুড়ো, কেন মানুষ বড় হয় ?'

'তোমার মতো চাকরি করবে বলে।'

বুড়ো আপন মনে খাতায় আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বললে। সুগম্ভীর সোফোক্লিসের মতো।

'তুই বড় হয়ে কি করবি ?'

'তুমি যা বলবে।'

'তুই আমাকে ভালবাসিস বুড়ো ?'

'ইয়েস।'

ডিম সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এইবার ঠাণ্ডা জলে ফেলে খোলা ছাড়াতে হবে। বুড়ো ডিম খেতে ভালবাসে। ছেলেটাকে কোনও রকমে একটু মোটাসোটা করতে হবে। দেখি আর একটা বছর যাক, ওকে সাঁতারে ভর্তি করে দেব। আটমাসে জন্মেছে। তার ওপর মা নেই। ঘুরে ঘুরে মানুষ হচ্ছে। আমার স্বপ্ন তো একটাই। ছেলেটাকে সাংঘাতিকভাবে মানুষ করা।

'শোন বুড়ো, তুই ব্রেকফাস্ট কর, আমি চট করে মোড়ের মাথা থেকে বাজারটা করে আনি। কি কি করবে না মনে আছে ? বারান্দার রেলিং-এ উঠে ঝুঁকবে না। দেশলাই জ্বালাবে না। ছুরি ধরবে না। কেমন ?'

'ইয়েস। বাবা ?'

'বলো বাবা।'

'তুমি ভোরবেলা কাঁদছিলে কেন ?'

'আমি ? আমি তো তখন ঘুমোচ্ছিলুম।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।'

'তাই নাকি রে ? তাহলে স্বপ্ন দেখছিলুম। তুই স্বপ্নে হাসিস। আমি স্বপ্নে

কাঁদি। আজ কি মাছ খাবি ?'

'তুমি যা খাওয়াবে।'

'আমি তাহলে আসি।'

'বাথরুমে সাবান নেই।'

'আ, ঠিক বলেছিস। হ্যাঁ শোন, জল ঘাঁটবি না।'

'নোওপ।'

॥ চার ॥

হঠাৎ কলেজ স্ট্রিটের মুখে ফটিকদার মুখোমুখি।

'কি মশাই, ধরেছেন ? ক' পাতা হল ?'

'এখনও হাত দিতে পারিনি। ভেবেই যাচ্ছি। ভেবেই যাচ্ছি। প্রেম কি সোজা জিনিস মশাই। নরম তুলতুলে, মিষ্টি প্রেম।'

'ধ্যাত মশাই নরম প্রেম কে চায় ! টিন এজ লাভ স্টোরি বোম্বের সিনেমাঅলারা চটকে ছেড়ে দিয়েছে। পাকা প্রেম লিখুন। বেশ একটু পারভারশানের ফোড়ন দিয়ে। ঝানু, মোটামুটি পয়সাঅলা এক নায়ক খাড়া করুন। তারপর ছেড়ে দিন। চরে খেতে দিন। ইংরিজী বইটই পড়েন না ?'

'দেখি কি হয়। আমার একটা মস্ত দোষ, বানিয়ে লিখতে পারি না।'

'তাহলে নিজের জীবনেই ঘটিয়ে ফেলুন। আপনি তো মশাই ওপেন আছেন। শাসনে রাখার মানুষটি তো সরে পড়েছে !'

'আমার যে তেমন এলেম নেই দাদা।'

'আপনি একটি অগা। সন্ধের দিকে ঢুকুঢুকু হয় ?'

'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।'

রামপ্রসাদের জীবনচরিত লিখুন। শুনুন ভাল চান তো আগে পথে নামুন তারপর কলম ধরুন। চরিত্রহীন না হলে মহৎ সাহিত্য হয় না। কেরানী হওয়া যায়। এমন কি স্কুলমাস্টারও হওয়া যায় না আজকাল। চরিত্র চরিত্র করে দেশটা কমপ্লিটচরিত্রহীন হয়ে গেল। আপনাদের ওই ঘ্যানর ঘ্যানর বস্তাপচা সাহিত্যে পাবলিকেশন ব্যবসাটাই আমাদের লাটে উঠে যাবার জোগাড় হয়েছে। বইয়ের একটা এডিশান কাটাতে আমাদের জীবন শেষ।'

'চলি ফটিকদা।'

'চলি মানে ? আজ আপনার মাল খাওয়ার হাতে খড়ি হবে। পেটে তরল-লাথি না পড়লে লেখায় জোর আসবে না। রেডলাইট এরিয়ায় গেছেন কোনওদিন ?'

'পাগল হয়েছেন ?'

'চলুন আজ সেটাও হবে।'

'মাপ করুন মশাই। আপনার পাঁচ শো টাকা ফেরত নিন।'

'আপনার মুখ দেখে আমার করুণা হচ্ছে। নির্জন রাস্তায় কোনও মহিলার হাত চেপে ধরলে তার মুখের চেহারা এই রকমই হত। ঠাণ্ডা জল খাবেন ?'

'কিচ্ছু না, আমার কাজ আছে। আজ পালাই।'

হন হন হাঁটছি। মাপ করো রাজা ! সাহিত্য আমার মাথায় থাক। হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। কান গরম হয়ে উঠছিল। বাতাস লেগে এখন একটু শীতল হয়েছে। এতক্ষণ কি ভাবছিলুম জানি না। এখন ভাবছি লাল আলোর এলাকার কথা। ওই তো ওই মাথায় সেই বিখ্যাত জমজমাট প্রাচীন এলাকা। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে যেতে গিয়েও ভয়ে ফিরে এসেছিলুম। হাত পা কাঁপতে শুরু করেছিল। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় নি, এই আমার মহাভাগ্য। আমার সেই মহান পথপ্রদর্শক বলেছিল— দেখবি একদিন গেলেই ভয় ভেঙে যাবে।

শয়তান !

আমার সেই লম্পট বন্ধু নয়, শয়তান হলুম আমি।

মনে ষোল আনা ইচ্ছে। ভয়, যদি ধরা পড়ে যাই ! যদি পুলিসে ধরে ! যদি মাস্তানের হাতে পড়ে যাই। সেই চিরন্তন মধ্যবিত্ত। নিরাপত্তা চাই। ওরা আমার নিভৃত এলাকায় আসুক। আমার যাবার সাহস নেই। চরিত্রবান, আদর্শবাদীর মুখোশটি যেন খুলে না পড়ে। ব্যাটা ! ঘোমটার আড়ালে তোমার খেমটা নাচ চাই।

আরে রাস্তার অপর পারে, ভাঙা ফুটপাথে কে দাঁড়িয়ে ? নীলুদা। নীলুদা কি করছেন এখানে ! চোখে পুরু ঘোলাটে লেন্সের চশমা। মুখ সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। দু হাত সামনে প্রসারিত করে একবার এদিকে যাচ্ছেন একবার ওদিকে। প্রায় অন্ধ মানুষ। একেবারে অসহায়। চারপাশে থই থই জনারণ্য। বাস স্টপেজে যেমন হয়। মাঝে মাঝে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে পারছেন না।

তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে ছুটে গেলুম।

'নীলুদা, আপনি এখানে ?'

উৎকণ্ঠিত, অসহায় মুখ। ঘেমে গেছেন। চোখের এমন অবস্থা। হাত দুয়েক দূরের মানুষকেও চিনতে অসুবিধে হচ্ছে।

'কে, শ্রীকান্ত ?'

'আপনি কি করছেন এখানে ?'

নীলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। গরম, উৎকণ্ঠায়,

পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়েছেন। বাঁ হাত দিয়ে এলোমেলো চুল ঠিক করতে করতে বললেন, 'নীলুর কর্মফল ভাই। ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন। আসছিলুম ধর্মতলা থেকে। এইখানে এসে বাস ব্রেকডাউন। ওই যে তিনি দেহ রেখেছেন ! তারপর কতক্ষণ যে হয়ে গেল ! কোনও কিছুতেই উঠতে পারি না। একবার ওদিকে যাই, একবার এদিকে যাই। চোখের এই অবস্থা, বাসের নম্বর পড়তে পারি না। যাক তুমি এসে গেছ, আমার আর ভাবনা নেই।'

'আপনার কলেজ এবার আমি বন্ধ করে দেব।'

'আর তিনটে বছর শ্রীকান্ত। কোনও রকমে শেষ করে যাই। বাড়ি বসে থেকে কি করব ! শরীরের ক্ষমতা তো ঠিক আছে।'

'তা আছে। রাস্তায় এইরকম বিপদে পড়লে কে দেখবে ?'

'চারপাশে এত মানুষ, কেউ দেখবে না বলছ ?'

'মানুষ এখন হৃদরোগে ভুগছে নীলুদা !'

'তুমি এখন যাবে কোথায় ?'

'আপনাদের বাড়ি।'

'যাক ভালই হয়েছে। চলো তাহলে একসঙ্গে যাই। একটা কিছু ধরো।'

একটা কিছু ধরো মানে, ট্যাক্সি। ট্যাক্সি ধরা অত সহজ নয়। এ শহরের নাম কলকাতা। জগৎছাড়া জায়গা। বলার উপায় নেই, পাবলিক চাঁটাবে। বলবে, যা ব্যাটা আমেরিকায় যা। রেগানের দালাল। আরও আধঘণ্টা কসরতের পর, নঞ্ঝড়ে একটা ট্যাক্সি জুটল। গাড়িও বৃদ্ধ, চালকও বৃদ্ধ। চলনে ধীর, শব্দে মহান। মাঝে মাঝে নর্তকীর মতো গাড়ির শরীর এপাশে ওপাশে দুলে দুলে উঠছে।

নীলুদা চুপ করে বসে থাকতে থাকতে এক সময় বললেন, 'চোখ দুটো চলে গেলে পৃথিবী শুধু শব্দের পৃথিবী। আমার কি মনে হচ্ছে জানো, ঘষা কাঁচের টানেলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। চোখ দুটো এইরকম থাকলেও চলে যাবে। এর চেয়ে খারাপ হলে আমার কি হবে বল তো শ্রীকান্ত ?'

'অত ভাবছেন কেন ? আমি আছি। সোমা আছে। তাছাড়া আজকাল নতুন নতুন চিকিৎসা বেরিয়েছে। ভয় কি আপনার ? আপনি তো আর জলে পড়ে নেই।'

'তা ঠিক। তবে কি জানো, এখনও বাঁচতে হবে বহুদিন। কে আমাকে টানবে অত বছর !'

'ও ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা যাঁর প্রজা তিনিই দেখবেন।'

নীলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ ডান হাতটা আলতো করে আমার বাঁ

হাতের ওপর রাখলেন। সুপুরুষ মানুষ। স্বাস্থ্যবান। পুরুষ্ট কবজি। লম্বা লম্বা আঙুল। ফর্সা ধবধবে। নীলুদার দিকে তাকালুম। কিছু একটা বলতে চাইছেন। ইতস্তত ভাব। অবশেষে বললেন, 'তোমাকে গোপনে একটা কথা বলব?'

'বলুন না।'

'কথা দাও, আর কাউকে বলবে না।'

'না।'

'ঠিক বলছ?'

'বলার মতো আর কে আছে বলুন আমার। গোপা থাকলে প্রাণের কথা, মনের কথা হত।'

'তা হলে শোনো। পরামর্শ চাই তোমার। এক মহিলা আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। লক্ষ্য করো, তিনি মহিলা বলেছি, মেয়ে নয়। প্রায় আমার বয়সী। দু-এক বছর এদিক ওদিক হতে পারে।'

'কে তিনি?'

'একটি বিদেশী ব্যাঙ্কের অফিসার। বিলিতি এডুকেশান।'

'বিবাহিতা?'

'না না, এর মধ্যে কোনও পাপ নেই। গজল নয়, পুরোপুরি ধ্রুপদ।'

'কি করে বুঝলেন ভালবাসেন তিনি?'

'বোঝা যায়, বুঝলে? আমি একেবারে ব্লান্ট নই।'

'আপনার এই চোখের অবস্থা জেনেও ভালবাসেন?'

'তাহলে শোনো, আজ আমি তাঁর অফিসেই গিয়েছিলুম। দুটো কারণে, এক, আমার ব্যাঙ্কঘটিত একটা প্রয়োজন ছিল। দুই, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল। এরকম হয় বুঝলে শ্রীকান্ত? মানুষের এই রকম হয়। তুমি একটা জিনিস জেনে রাখো, নারী ছাড়া পুরুষ অসম্পূর্ণ, পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ। তুমি ভাবছ আমার মন দুর্বল বলে, আমি এইসব কথা বলছি। তা নয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি। মনের খুব সংগঠিত অবস্থায় প্রেম, ভালবাসা একটা ভাগবতী রূপ পায়। তুমি এটাকে আমার দুর্বল মনের সাফাই ভেব না।'

'আমি তা ভাবছি না নীলুদা। আমি আপনার শেষ কথা শোনার অপেক্ষায় আছি।'

'আমি যদি নেলীকে বিবাহ করি লোকে ছিছি করবে?'

'তা নয়, তবে সবাই অবাক হবে। আপনাকে সবাই সন্ন্যাসী ভাবে। ভাবে জিতেন্দ্রিয়। আপনার সেই মূর্তিটা আর থাকবে না।'

'কেন বিবাহ কি এতই ঘৃণিত?'

'ঠিক ঘৃণিত নয়, তবে কামনা-বাসনা-মাখা একটা সম্পর্ক। মনের ব্যাপার ঠিকই তবে দেহপ্রধান। সংসারী মানুষ বলতে সাধকরা একটু নিচের তলার মানুষকেই বোঝান।'

'আমি তোমার মত চেয়েছি শ্রীকান্ত।'

'আমি বলব, আপনি করুন, তবে সবার আগে যাচাই করে নিন, সুখের হবে তো!'

নীলুদা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। মুখে একটা আলোর দ্যুতি। কোথায় কোন জগতে চলে গেছেন কে জানে। অনেকটা সমাহিত অবস্থা। হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বললেন, 'কি বলছিলে, সুখের হবে তো! তাহলে শোনো, নেলী বলছিল, নারী যতক্ষণ না মা হচ্ছে ততক্ষণ সে মরুভূমি। মা না হলে জীবনের উত্তরণ ঘটে না, বিকাশ হয় না। কুঁড়িই থেকে যায়, ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না।'

'তিনি যদি শুধু মাতৃত্বের জন্যে বিয়ে করতে চান, তাহলে তো আরও অনেক সঙ্গত প্রশ্ন এসে যায়। তিনি সন্তান চান না আপনাকে চান? তা ছাড়া এই বয়েসে সন্তান যদি না আসে? মহিলার সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'দীর্ঘ দিন। তা দশ বছর তো হবেই।'

'তিনি এতদিন অবিবাহিত কেন?'

'আমার মতই একটা ভাব নিয়ে চলছিল। শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। লেখাপড়া নিয়ে কাটাও। মাঝে মাঝে দেশভ্রমণ। মনের মত পুরুষ চোখে পড়েনি। আমার মধ্যে কি দেখেছে কে জানে!'

'দেখতে কেমন?'

'কুৎসিত নয়। সুন্দরীই বলতে পারো। অদ্ভুত একটা পার্সোন্যালিটি আছে।'

'সংসারে কে কে আছেন?'

'এখানে কেউ নেই। একমাত্র দাদা ভিয়েনায়। নামকরা ডাক্তার। স্ত্রী অস্ট্রিয়ান। কালেভদ্রে আসেন। ভবানীপুরে বিশাল পৈতৃক বাড়ি। একা কিভাবে যে থাকে! এই অবস্থায় বলো আমি কি করি?'

'আপনার মন কি চাইছে?'

'সত্য কথা বলব? ঘৃণা করবে না বলো?'

'সে কি, ঘৃণা করব কেন?'

'তাহলে শোনো। নিজেকে চেনা হল সবচেয়ে বড় চেনা। নিজের মনের নাগাল পাওয়া বড় সহজ নয় শ্রীকান্ত। এ এক গভীর অতলান্তিক। বাসনারা সব ফুট কাটছে। এই মনে হল জয় করে ফেলেছি, সঙ্গে সঙ্গে পেড়ে ফেলে দিলে

চিৎপাত করে। সত্যি কথা বলব শ্রীকান্ত, কাম বড় প্রবল রিপু। কিছুতেই জয় করা যায় না। কখন যে কি রূপে আসবে। তুমি মুখে বলতে পার হেঁকেডেকে, লোকেও হয়তো বিশ্বাস করবে। তোমার মন কিন্তু মনে মনে হাসবে। সাংঘাতিক জিনিস এই মানুষের মন। সব প্রতিজ্ঞা ভেসে চলে যায়। মাঝে মাঝে বড় কাতর হয়ে পড়ি শ্রীকান্ত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ কোনও কিছুতেই মন যেন বশে আসতে চায় না। শুনবে তাহলে আমার খোলাখুলি স্বীকারোক্তি, মনের ওই অবস্থায় নারীকেই মনে হয় আমার ঈশ্বর। ছি ছি এ আমি কি করছি ? মনের কথা সব তোমাকে খুলে বলে ফেলছি ?'

'তাতে কি হয়েছে ? আমি তো আপনার বন্ধুর মতো। মনে কিছু পুষে না রাখাই ভলো, তাতে মনের অসুখ করে।'

'তা যা বলেছ। মন হল কারণ—শরীরের কিডনি, মূত্রযন্ত্র। চিন্তা জমতে জমতে ইউরেমিয়া মতো হয়ে যায়।'

'নীলুদা, আমার কেবল একটাই আশঙ্কা ভদ্রমহিলা আপনাকে চাইছেন, না চাইছেন একটি সন্তান ? ভালবাসা আগে না সন্তান আগে। বড় ধাঁধিয়ে ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছি দাদা।'

'আমারও যে বড় স্বার্থচিন্তা এসে যাচ্ছে শ্রীকান্ত। মনে হচ্ছে একেবারেই তো অসহায় হয়ে পড়বো,তখন কেউ একজন পাশে তো থাকবে ! একটু দেখাশোনা, তদারকি করবে।'

নীলুদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। গাড়ি ঝির ঝির করে চলেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো। হঠাৎ স্বার্থচিন্তা এসে গেল আমারও। এই তো আমার চরিত্র পেয়ে গেছি। মধ্যবয়সী এক প্রেমিক। নীলুদাকে নিয়েই তো আমার উপন্যাস ফাঁদা যায়। নিজের স্বার্থেই ভদ্রলোককে এগোবার উৎসাহ দেওয়া যায়।

'ভদ্রমহিলাকে একবার চোখের দেখা যায় নীলুদা ?'

'তুমি দেখতে চাও ?'

'মন্দ কি ?'

'তা চলো একদিন। বাড়িতেই যাওয়া যাক।'

'হিন্দু, বৈদিক মতে বিয়ে করবেন, না বিলিতি মতে রেজেস্ট্রি ?'

'ভয় পাচ্ছি শ্রীকান্ত ! মাকে কিভাবে বলব !'

'সে দায়িত্ব আমার।'

'সোমা ! সোমা যদি কিছু ভাবে ?'

'তার এতে ভাবার কি আছে ?'

'আমাকে যে সে অন্যভাবে শ্রদ্ধা করে।'

'কেউ বিয়ে করলে অশ্রদ্ধেয় হয়ে যায় ?'

'বিয়ের একটা বয়েস থাকে শ্রীকান্ত। প্রায় অন্ধ একটা লোক, যার ভগবৎ চিন্তাই করা উচিত, সে বউ নিয়ে দোরে খিল আঁটলে কি ভাববে ? যারা দ্বোজপক্ষে বিয়ে করে তারা কি প্রথমপক্ষের মত অসঙ্কোচে পিঁড়িতে বসতে পারে ? বাঁকা হাসি তাদের সহ্য করতেই হয়। বুঝলে শ্রীকান্ত, আর আমি ভাবতে পারছি না। নিয়তির হাতেই ছেড়ে দি নিজেকে।'

নীলুদার দ্বোজপক্ষের ওপর মন্তব্যে মন বেশ নাড়া খেল। দু বয়সের দুটি মানুষ পাশাপাশি বসে আছি, দুজনেরই এক সমস্যা। হঠাৎ আমার সেই মহেন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ল।

মহেন্দ্র মিত্র। হ্যাঁ প্রবীণ মানুষ। তবে নিটোল স্বাস্থ্য। বেশ বড় পদেই চাকরি করেন বিদেশী বিমান সংস্থায়। পাক্কা সাহেব। স্কচ ছাড়া খান না। গৌরবর্ণ গালে গোলাপী আভা। এত পয়সা, এত দাপট, তবু বড় দুঃখ। স্ত্রী প্রায় ত্যাগই করেছেন। চলে গেছেন বড় মেয়ের কাছে নিউইয়র্কে। একটি মাত্র ছেলে। সে একেবারে বাপকা বেটা। সাদা চোখে থাকেই না। সেও বড় চাকরে। কোন এক বিদেশী কোম্পানীর সেলসে আছে। অঢেল টাকা। বগলে বোতল। দু বগলে দুই ম নিয়ে তিনি সারা ভারত দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে বাবাকে হুকুম করছেন। কি হুকুম ? কলকাতার এক বড় হোমিওপ্যাথের কাছে হত্যা দিয়ে ছেলের হরেক ব্যামোর ওষুধ পাঠাও। সারা বছরই তাঁর শুকনো কাশি। হোমিওপ্যাথিতে কি একটা ওষুধ আছে পেট্রোলিয়াম। বম্বে থেকে বাপের কাছে টেলিগ্রাম এল সেও পেট্রোলিয়াম ইম্‌মিডিয়েটলি।

সেই সায়েব মহেন্দ্রবাবুর কি বেদনা ! স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেছে। কলকাতায় এলেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না। পার্কস্ট্রিটের আলোছায়া রেস্তোরাঁয় বসে, স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেতে খেতে একদিন হাহাকার করে উঠলেন, 'শ্রীকান্ত,আই হ্যাভ নো সেক্‌সলাইফ। অ-ওফ্-ওফ্।' তাঁর হৃদয়বিদারক আর্তনাদ শুনে বেয়ারা থমকে গেল। ভাবলে, সম্প্রতি কেউ হয় তো মারা গেছে।

'শ্রীকান্ত, অ্যাট দিস্ এজ, হাউ ক্যান আই ভিজিট এ প্রস্টিট্যুট !'

কি সাংঘাতিক সমস্যা রে বাবা ! এ যেন মাঝরাতে আলো ফিউজ হয়ে গেছে। গুরুজন, বলতেও পারছি না, মশাই জীবনের ফ্যুয়েল তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, এবার না হয় একটু পরকালের কথা ভাবুন।'

আজ আমরা দুজন পাশাপাশি বসে আছি। দু বয়সের দুই মানুষ। ভেতরে ধিকধিক আগুন জ্বলছে আমাদের। এ কোনও দুরারোগ্য অসুখ, না এরই নাম জীবন। অর্ধাংশ আর এক অর্ধকে খুঁজে ফিরছে, বর্ষার অন্ধকার রাতে জল দাও

জল দাও বলে চাতক আকাশ ফেঁড়ে ফেলে যেভাবে!

আমরা এসে গেলুম। আমরা যেন সদ্য মা হয়ে ফিরে আসছি নার্সিংহোম থেকে। দুজনেরই বুকে আত্মজ। রক্ত-মাংসের দুটি ডেলা। দপ দপ করছে। উত্তপ্ত। ওই দাশ পাবলিশার্সের ফটিকদাই আমার সর্বনাশ করেছেন। পাঁচশো টাকার টোপ ফেলে মাথাটাকে এমন করে দিয়ে গেলেন। সব সময়েই প্রেম ঘুরছে, তাতে আবার রেপের ফোড়ন, কিঞ্চিৎ বিকৃতির তেজপাতা, সামাজিক সমস্যার ঘিয়ের ছিটে, রাজনীতির হেলুনি। মনটাকে যে তুলে নিয়ে অন্য কোথাও রাখব, সে উপায় নেই। কি জ্বালায় পড়লুম রে ভাই।

নীলুদা বললেন, 'ভাড়াটা আমিই দোব শ্রীকান্ত, মিটার দেখে হিসেব করো।'

'আপনি দেবেন কেন?'

'আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। তর্ক করো না।'

ঝড়ঝড়িয়া গাড়ি ধড়ফড় করতে করতে চলে গেল। দরজার সামনে ছুটে এসেছে কমল। আনন্দে নাচছে, 'মামা, মামা।' পেছনে দাঁড়িয়ে কমলের দিদা।

ভদ্রমহিলাকে বেশ জমিদার গৃহিণীর মতো দেখতে। চোখে সরু সোনার ফ্রেমের চশমা। কথা খুব কম বলেন। কদাচিৎ হাসতে দেখেছি। শরীরের বাঁধন এখনও আলগা হয়নি। রাশভারি মহিলা। যত বয়েস বাড়ছে এক ধরনের সৌম্য প্রশান্ত রূপ ফুটে উঠছে। দুচোখে স্থির দৃষ্টি। মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। যখনই দেখি তখনই মনে হয় এইমাত্র স্নান করে উঠলেন। সব সময় ধবধবে সাদা ফিতে পাড় শাড়ি আর ব্লাউজ পরে থাকেন। অপরিচ্ছন্নতা মহিলার অসহ্য। সাধন ভজনের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছেন। জপের মালা নিয়ে ধ্যানে বসলে সহজে উঠতে চান না। সংসার মাথায় করে রেখেছে আশ্রিতা একটি মেয়ে। তার নাম কালু। কি আশ্চর্য, মেয়েটি মোটেই কালো নয়। তার বয়েস বোঝার উপায় নেই। কুড়ি হতে পারে। তিরিশ হতে পারে। আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী গঙ্গাসাগর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনেছেন।

ভারি মিষ্টি মেয়ে। পাপের কথা কি আর বলব, মেয়েটির দিক থেকে সহজে আমি চোখ ফেরাতে পারি না। পানের মতো মিষ্টি মুখ। পাতলা নাক দুপাশে সামান্য টেপা। আর হাসি। অমন হাসি সচরাচর চোখে পড়ে না। মুখের সঙ্গে সঙ্গে চোখও হাসে। নাকের ঠিক ওপরে ভুরুর কাছটা কুঁচকে যায়। আর অমন সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট সাজানো দাঁত বাঁধানো ছাড়া যে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। বড় সরল মেয়েটি। হালকা ফুরফুরে শরীর। যেন ষোল বছরের মেয়ে।

মনে মনে বলি, শ্রীকান্ত তোর যেমন মরণদশা। যাকে দেখিস তাকেই ভাল

লেগে যায়। আসলে সেই কথাই সত্যি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন। ভক্তসঙ্গে বসে আছেন নিজের ঘরটিতে। লোকজন আসছে যাচ্ছে। রাসমণির টেম্পল দেখছে, বিল্ডিং দেখছে। ঠাকুর যেমন বলতেন আর কি! হঠাৎ মাস্টারমশাইকে বললেন, বিবাহিত লোকেরা মেয়েদের দিকে কিভাবে আড়ে আড়ে তাকায়, দেখেছ মাস্টার।

যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে, সে বাঘ তো মানুষখেকো হবেই।

'জীবরা কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ। ঘরের দ্বার-জানলা ইসকুরু দিয়ে আঁটা, বেরুবে কেমন করে?' মাস্টার 'সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনীকাঞ্চনে মত্ত। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁশ হয়।'

আমাকে কে আর চালুনির জল খাওয়াবে? গোপা আমার বারোটা বাজিয়ে রেখে গেছে। আমার চোখ দুটো? আমার মন, আমার অভ্যাস!

কালু এসে কমলকে কোলে তুলে নিল। বেশ একটা নীল রঙের বড় বড় খোপওলা শাড়ি পরেছে। সবসময় ঘাড়ের কাছে ঝুলে আছে এলো খোঁপা। কালুর নিচু হওয়া। কমলকে কোলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একপাশে তার আঁচল সরে যাওয়া। কপাল কুঁচকে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকান। পৃথিবীর সব সরলতা মাখান তার মিষ্টি পানের মতো মুখ। পিচবোর্ডের মত পাতলা দুটো ঠোঁট। আমার যে কি হচ্ছে ভেতরে! আমি যতই বোকার মতো হাসি, যতই চাপা দেবার চেষ্টা করি, ভেতরে ভেতরে আমি ভীষণ জখম।

নীলুদা দু'হাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে টাল খেতে খেতে পৈঠে ভেঙে, চৌকাঠ টপকে ভেতরে যাবার চেষ্টা করছেন। কালু আস্তে কমলকে কোল থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল, 'দাদা, আমার হাত ধরুন। আমার হাত ধরুন।'

নীলুদা কমলের মাথায় হাত রেখে প্রথমে একটু আদরের ভাব দেখালেন, তারপর কালুর কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে চললেন।

এই হল মানুষের দোষ। কেউ সরল মনে মনের কথা বললে, সেই কথা ধরেই তার সব কাজের ব্যাখ্যা হতে থাকে। নীলুদা কালুর কাঁধে হাত রেখেছেন! কেমন অন্তরঙ্গ একটা অবস্থা। আর আমার সন্দেহ হচ্ছে, নীলুদা কি সত্যিই এত কম দেখছেন? মানে এতই কম যে কালুকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ভেতরে যেতে হচ্ছে! এই নীলুদা বিয়ের কথা ভাবছেন। ভাবছেন সন্তানের কথা। সেই সন্তান বড় হয়ে অন্ধ বাপকে দেখবে?

আমার মন? বিল্বমঙ্গল চোখ উপড়ে ফেলেছিল, আমার মনটাকে উপড়ে ফেলে দিতে পারলে ভাল হত। নীলুদার সন্তানের কথা ভাবতেই, আমি

নীলুদাকে মনের চোখে একেবারে সেই অবস্থায় দেখলুম। অন্ধ মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটি নারী-শরীরে দিশাহারা হয়ে ঘুরছেন। যৌবন-উত্তীর্ণা এক নারী। তিনি বিদেশী ব্যাঙ্কে দায়িত্বপূর্ণ পদে দাপটে কাজ করেন। সারাদিনে কত লোক চরান।

কমল বললে, 'বাবা, তুমি মুখটা অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা? তোমার কি পেটব্যথা করছে?'

কমলের দিদা বিরস মুখে বললেন, 'ভেতরে আসবে না?'

'এই যে যাই' বলে ভেতরের দিকে পা বাড়ালুম।

দোতলার ঘর থেকে ভেসে আসছে কালুর হাসির শব্দ। নীলুদা নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছেন যা কালুর খুব ভাল লেগেছে। ভেবেছিলুম কমল আমার পেছন পেছন আসছে, তাই বুড়ো বুড়ো করে ছেলে ভোলানো আদিখ্যেতা হচ্ছিল। সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে দেখি কমল সদরে দাঁড়িয়ে আছে দিদার পাশটিতে। লোকজন, রাস্তাঘাট দেখছে। একটু পরেই এ-পাড়ায় ফেরিওলারা আসতে শুরু করবে। ঘুগনি, ঘুঙুর বাঁধা চানাচুর, ঘড়ঘড়ে ঠেলা গাড়িতে চেপে ফুচকা। সব শেষে আসবে কুলপিমালাই। কোনওটাই কমলের চলবে না; কিন্তু ওর ভেতরটা দুলে দুলে উঠবে।

যেমন আমার ভেতরটা ইদানীং দুলে দুলে উঠছে। কোনওটাই আমার চলবে না তবু কি মতিভ্রম!

আমার এমন হবার কথা নয়। ওই যে উপন্যাসটা লিখতে হবে। বেস্টসেলার। তিন বছর নাম ঝুলে থাকবে লিস্টে। পাবলিককে খাওয়াতে গেলে নিজেকে আগে খাদ্য হতে হবে।

কালু নেমে আসছে। সিঁড়ির মাঝামাঝি দুজনে মুখোমুখি।

আমার কেন জানি না ধারণা, কালু খুব ধার্মিক। ধর্ম দিয়েই ওকে বশ করা সহজ। তাই সুযোগ পেলেই ওকে আমি ধর্মের কথা শোনাই। নিজে খুব সাত্ত্বিক হয়ে যাই। মানে পুরোপুরি শয়তান।

কালু থেমে পড়েছে। হাসছে। সেই হাসি। গলার কাছে সরু একটা হার চিকচিক করছে। আমি কতটা নিচে নেমে গেছি! অবাক হয়ে গেলুম। পুণ্যাত্মারা ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ছুটে যান আর আমার মন ছুটলো হারের রেখা ধরে শেষপ্রান্তটি যেখানে দুলছে সেইখানে। একেবারে পচে গেছি আমি।

কালু বললে, 'চায়ের সঙ্গে কি খাবেন মেজদা?'

আমি যেন খাওয়া-দাওয়ার ঊর্ধ্বে, সংসারের ঊর্ধ্বে। ভাবের ঘোরেই যেন প্রশ্ন করছি— 'কবে গুরুপূর্ণিমা?'

'গুরুপূর্ণিমা? মঙ্গলবার। কেন মেজদা?'

'না, আশ্রমে যেতে হবে তো! সেদিন আমার আবার উপবাস। তুমি উপোসটুপোস করো না? উপোস করবে, অন্তত মাসে একবার। দেখবে মন ভীষণ পবিত্র থাকে। আর মন পবিত্র থাকলে এক ডাকে ভগবানের সাড়া পাওয়া যায়।'

কালুর মুখ দেখে মনে হল, ভীষণ অবাক হয়েছে! বুঝতে পারছে না, হঠাৎ কেন আমি এসব কথা বলছি! কালু হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি ভগবানের সাড়া পেয়েছেন?'

'আমি?'

ঈশ্বরের মতো হেসে, আমি কালুর ডান গালে ছোট্ট একটা আঙুলের টোকা মারলুম। মেরেই ফিরে তাকালুম পেছনে। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে কমল। কমল বোধহয় আমাকে কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। সেই ফাঁকে শিশুর লাল জিভটা বেরিয়ে আছে।

কালু পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গেল দ্রুত পায়ে, যেমন সে নামে। বাতাসে আঁচল উড়ছে। শরীর ছুঁয়ে গেল আঁচল। অস্বস্তি আর আনন্দ একই সঙ্গে দুধরনের অনুভূতি। কমল কি ভাবছে। আবার শরীর ছুঁতে না পারি পরিধেয় স্পর্শ করে গেল। কমল কি ভাববে! তার কি এসব বোঝার বয়েস হয়েছে!

শুরু হল আমার অভিনয়।

'আয় বুড়ো। ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?'

'তুমি যাবে না বাবা?'

'কোথায় রে?'

'বলেছিলে আজ তাড়াতাড়ি এসে জুতো কিনতে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ যাবো তো। একটু চা খেয়ে নি।'

'তখন তো রাত্তির হয়ে যাবে বাবা। আবার আলো নিবে যাবে।'

'দ্যাখ না এক্ষুনি হয়ে যাবে। তুই আয় না ওপরে।'

'আমি দিদার কাছে যাচ্ছি। তুমি আমাকে ডাকবে। ডাকবে তো!'

'বাঃ, নিশ্চয় ডাকবো।'

কমল ছুটে চলে গেল বাইরের দিকে।

এ-বাড়ির দোতলাটা অপূর্ব সুন্দর। চওড়া মোজাইক ঢালা বারান্দা। চিক দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা। এখন গুটিয়ে গোল করে ওপরে রাখা হয়েছে। বড় বড় টবে নানা রকমের গাছ। পাম, ফার্ন, রবার। থাম জড়িয়ে অপরাজিতা লতিয়ে উঠেছে। পাশাপাশি বড় বড় ঘর। বাহারী পর্দা বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে।

এবাড়ির বাতাসে সব সময় মৃদু একটা ধূপের গন্ধ ভেসে থাকে। চারপাশ অসম্ভব পরিষ্কার। তকতক করছে। এ বাড়িতে এলেই আমার ভেতরটা কেমন করে। ওই যে ওপাশের ঘরটা। বারান্দার একেবারে শেষ মাথার ঘরটায় আমি আর গোপা একসঙ্গে এলে, থাকতুম। পশ্চিমের জানালা খুললেই কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝিরি ঝিরি শোভা। কয়েকবার পূর্ণিমার রাতে থেকে গেছি। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। চাঁদের আলোয় সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে। ঝকঝকে খাটে দুধের মতো সাদা বিছানা। আমি জানলার ধারে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় একটা দোলখাওয়ার চেয়ারে বসে আছি। আর অত বড় বিছানায় কনুইয়ের ওপর মাথার ভর রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে গোপা। নীল শাড়ি পরতে ভালবাসত। সেই নীল শাড়িতে গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। এইভাবে শুয়ে থাকলে মেয়েদের শরীরের ঢেউ ভীষণ স্পষ্ট হয়। মেয়েদের শোভা তো নিতম্বে। গোপা ওইভাবে শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গে গল্প করছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর হাত তুলছে। পা দোলাচ্ছে। পায়ের পাতায় পাতা ঘষছে। তখনও কমল আসেনি। আসবে। আমরা দুজনে তখন স্বপ্নে ভাসছি। পৃথিবী প্রায় উবে গেছে। আমি আছি আর গোপা আছে।

কত রাত জেগে কেটেছে। চাঁদ টলতে টলতে নেমে আসত পশ্চিমে, কৃষ্ণচূড়ার ওপাশে। টান করে পাতা চাদর কুঁচকে যেত। বাতাস লাগা পুকুরের জলের মতো। শেষ রাতের ফিনফিনে ঠাণ্ডা বাতাসে মিশত পাখার বাতাস। তবু আমরা ঘামছি। সে এমন এক ধরনের উত্তাপ যেন দুখণ্ড টাটকা পাঁউরুটি সবে বেরিয়ে এল বেকারি থেকে। সুখ বেশি দিন থাকে না। জীবনের ভাল ভাল মুহূর্ত বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়। একবার হারালে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তোর মালা ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়লে একে একে সব কুড়িয়ে পাওয়া যায়। মুহূর্তের মালা ছিঁড়ে গেলে মহাকালে চলে যায়।

'গোপা, আমার হাত ধরে শেষ পর্যন্ত যদি যাবে না-ই জানতে তাহলে কেন এসেছিলে আমার জীবনে!'

কোনও কোনও জীবনে এই রকমই হয়। বাবা গেলেন দিল্লি। সুপ্রীম কোর্টে এক মক্কেলের হয়ে লড়তে। ফিরে এল তাঁর শরীর। ম্যাসিভ স্ট্রোক। মাকে ধরে রাখা গেল না। সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক গোপা। আমাকে ঠুকরে রেখে চলে গেল। এ ফল আর জীবনের পুজোয় লাগবে না।

I cry I cry
To God who created me
Not to you Angels who frustrated me
Let me fly, let me die
Let me come to Him.

ওপাশের ঘর থেকে নীলুদা বেরিয়ে এলেন। সবে চান সেরেছেন। সারা গায়ে ফুরফুরে সাবানের গন্ধ। পেছন দিকে ওল্টান ঝাঁকড়া চুল। জল চিক চিক করছে।

'কি হল, তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে?'

'The world is come upon me, I used to keep it a long way off, but now I have been runover and I am in the hands of the hospital staff'.

'বাঃ স্টিভি স্মিথের কবিতা মুখস্থ করে বসে আছ। অনুবাদ করলে কি দাঁড়াবে, বহু দূরে রেখেছিলাম জগৎকে, এখন এসে পড়েছে ঘাড়ে। জগৎ আমায় চাপা দিয়ে সরে পড়েছে। আমি এখন হাসপাতাল কর্মীদের হাতে।'

বারান্দার রেলিংএর ধারে ধারে চওড়া রকের মত। নীলুদা বসে পড়লেন। দুপাশে পাম আর পাইনের টব। আমাকে বললেন, 'বোসো না শ্রীকান্ত।'

নিচে থেকে কমল চিৎকার করছে। 'বাবা তোমার হল! তোমার চা খাওয়া হয়নি বাবা?'

কালু চা নিয়ে ওপরে এল। গরমে কালুর নাকের ডগার ওপর পুঁতির মতো ঘাম জমে। সে আর এক শোভা। শুনেছি যেসব মেয়ের নাক ঘামে তারা প্রেমিকা হয়। হলেই ভাল।

নীলুদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

'কমলের চটি কিনতে।'

কালু চায়ের কাপ নামাবার জন্যে নিচু হয়েছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, 'আপনি বাজারে যাবেন, মেজদা?'

'হ্যাঁ। এই চা খেয়েই যাবো। কেন বলো তো!'

'আমি যাবো আপনার সঙ্গে।'

'বাজারে যাবে?'

'হ্যাঁ, কালকের বাজারটা সেরে রাখি। সকালে ভীষণ ভিড় হয়।'

'তুমি বাজার করো!'

নীলুদা অপরাধীর মতো বললেন, 'আগে আমিই করতুম, এখন আর সাহস পাই না।'

কিছুক্ষণ পরেই আমরা তিনজন রাস্তায় নেমে এলুম। কালু চুলে মনে হয় এক ঝলক চিরুনি বুলিয়েছে। শাড়িটা কুঁচিয়ে পরেছে। মুখে কি একটু পাউডার বুলিয়েছে। বেশ ফর্সা দেখাচ্ছে! মনকে ধমক দিলুম, দেখাক। তোমার তাতে কি? মেয়েটা তোমাকে মেজদা বলে। সম্মান করে। তোমার মন দেখতে পায়

না। পেলে হয়তো ঝ্যাঁটা মারতো। আবার নাও মারতে পারত। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কি!

কালুর হাত ধরে কমল চলেছে। কখনও নেচে নেচে উঠছে, কখনও অন্যদিকে তাকিয়ে চলতে গিয়ে কালুর গায়ে টলে পড়ছে। কি অসীম নির্ভরতা। যেন শুয়ে শুয়ে চলেছে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত। আমার মনে হচ্ছে বিদেশের কোন এক শহরে আমরা তিনজন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি। স্বামী, স্ত্রী আর ছেলে। কে বলবে কালু কারুর বাড়িতে আশ্রিতা। সামান্য কাজের লোক। আমি পেছন থেকে ওর পায়ের গোড়ালি এক নজরে দেখে নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা সুন্দরীকে হার মানায়। শায়ার যতটুকু অংশ শাড়ির তলা থেকে উঁকি মারছে, একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার। আমি ওদের দুজনের পেছনেই হাঁটছি। শাড়িটা কোমল শরীরে এত স্নেহে লেপটে আছে, মনে হচ্ছে আমার সামনে হেঁটে চলেছে মানবী নয়, মায়া। সমস্ত স্বপ্ন যেন ওই শরীরে।

গাধা।

আমি গাধা। আমার একটা পরিচয় আছে। মর্যাদা আছে। বংশ পরিচয় আছে। আমার সম্পর্কে সংসারের একটা সুন্দর ধারণা আছে।

তা আছে। তবে আমি যে বড় একা।

তোমার ছেলে?

সে তো একটা গচ্ছিত সম্পত্তি। সাবধানে রাখতে হবে। বাড়াতে হবে। তাকে আমি নাড়ি চাড়ি। তার হাজার কথা শুনি। সে কি আমার কথা শোনে। তার জগৎ আর আমার জগৎ ভিন্ন। সে আছে স্বপ্নে আর আমি আছি বাস্তবে।

হঠাৎ কমল খুব জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। কালুকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। বেচারা সামলাতে পারছে না। আমি পেছন থেকে চিৎকার করে বললুম, 'এই বুড়ো, কি হচ্ছে কি? পড়ে যাবি যে।'

কমল আমার দিকে দুষ্টু দুষ্টু মুখে তাকিয়ে বললে, 'আমি ইঞ্জিন।'

এগিয়ে গিয়ে কমলকে নিজের হাতে নিলুম, 'বুড়ো তুই হাঁপাচ্ছিস। এবার ধীরে হাঁট।'

পাশেই একটা রঙিন মাছের দোকান। রিঙ্কুস অ্যাকোরিয়াম। বিশাল বিশাল আধার, নানা বর্ণের মাছ খেলছে। কমল দাঁড়িয়ে পড়েছে। একেবারে নিশ্চল। চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। নাকের পাটা অল্প ফুলে উঠেছে। আমি, আমার পাশে প্রায় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কালু। আমার সামনে কমল।

আমি যত না মাছ দেখে আনন্দ পাচ্ছি, তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ হচ্ছে,

আমার পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে কালু। আমি তার কাঁধের ঢাল দেখতে পাচ্ছি। ঘাড়। এলো খোঁপা। এমন কি দেহের উত্তাপ পাচ্ছি শরীরে। যতক্ষণ থাকা যায় এইভাবে।

কমল বললে, 'কেনো না বাবা! ছোট মতো একটা কেনো না!'

'কে দেখবে বাবা। জল পাল্টাতে হবে। খাবার দিতে হবে। নইলে যে মাছ বাঁচে না।'

'কেন কালু পিসি দেখবে।'

'পিসির সময় কোথায় বাবা? সারা দিন কত কাজ করতে হয় পিসিকে।'

কালুরও মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে। আর হবারই কথা। ঈশ্বর যেন রং ঢেলে দিয়েছেন। সুন্দর। তাই গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ছে না। কালু বললে, 'মেজদা একটা কিনেই ফেলুন। আমি সব করব, যা যা করতে হয়।'

'ঠিক আছে, নীলুদার অনুমতি নিয়ে মাঝারি মাপের একটা কেনা যাবে।'

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলুম। ওই তো সিনেমা। নীল আলোর অক্ষরে নাম লেখা। বিশাল বড় ব্যানারে নায়ক নায়িকার জাপটাজাপটি। হলের সামনে তেমন ভিড় নেই। শো শুরু হয়ে গেছে। কতকাল সিনেমা দেখিনি। শেষ একটা বাঙলা ছবি দেখেছিলুম গোপার সঙ্গে। সে ছিল শীতকাল। অনেক রাতে চীনে খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম। তখন আমরা ও-বাড়িতে ছিলুম।

'কালু তোমার সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'হিন্দি ছবি ভালো লাগে না। ভালো বাঙলা বই, ধর্মের বই হলে দেখতে ইচ্ছে করে।'

আবার আমরা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি আবার ধর্মটর্ম কেন। ধর্ম একধরনের বর্ম। পরে থাকলে সহজে ছোঁয়া যায় না। এই বয়েসেই ধর্মে মতি। বড় বিপদ করলে। তোমাকে নিয়ে অবশ্য কোনও দিনই গরম-ঠাণ্ডা বই দেখা যাবে না। লোকে ছিছি করবে। শ্বশুর বাড়ি ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাকেও দূর করে দেবে। গোপার মা বড় কড়াধাতের মহিলা।

আমরা তিনজনে জুতোর দোকানে ঢুকে পড়লুম। একেবারেই ভিড় নেই। চেয়ারে বসেছি, একপাশে আমি, ওপাশে কালু, মাঝে বুড়ো। হঠাৎ চোখ চলে গেল কালুর হাঁটুর দিকে। শাড়িতে সেলাই। বিষণ্ণ হয়ে গেল মন। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার কাছে চাইতে পারে আব্দার করতে পারে। এমন কেউ নেই, যে কালুর জন্যে উপহার কিনে আনবে। রেস্তোরাঁয় বসিয়ে আদর করে খাওয়াবে।

দোকানের ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'কার জুতো?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না। কমল পা তুলে নাচাতে নাচাতে বললে, 'আমার। আমার চটি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আজকালকার ছেলেরা কিরকম স্মার্ট দেখেছেন। আমাদের কালে মুখ দিয়ে কথা সরত না।'

'ঠিক বলেছেন, আমরা লোক দেখলে মায়ের আঁচলের তলায় মুখ লুকোতুম।'

ভদ্রলোক জুতোর র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর আমি কমলের পাশ দিয়ে ঝুঁকে কালুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম, 'তোমার চটির অবস্থা শোচনীয়। বহু ভাল ভাল মেয়েদের চটি রয়েছে। তোমাকে এক জোড়া কিনে দিতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।'

মেয়েদের কান কি সুন্দর। পাতলা। ফর্সা। এই কানে বেশ পাথর বসানো সুন্দর একটা ঝুমকো ঝুললে কেমন হত। মানুষের জীবনের এই এক মজা, কেমন হত, কেমন হত করতে করতেই নাটক শেষ। সাজ, পোশাক খুলে সোজা চিতায়। যা হওয়াতে চায় তা আর হয় না।

কালু মাথাটা আমার দিকে আর একটু কাত করে মুখে সেই অদ্ভুত হাসি টেনে বললে, 'কি হবে। এই তো বেশ আছে। অনেক দিন চলে যাবে।'

'আমার যে খুব ইচ্ছে করছে।'

কালু সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাল। চোখ ফেরাতে পারছি না; কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। ধরা পড়ে গেলুম না তো। কমলের মাথার ওপর কি সব ঘটছে। নিচে জীবনের এক মানে, ওপরে জীবনের আর এক মানে। কালুর চোখে সন্দেহ নেই। সহজ, সরল, গভীর দৃষ্টি। বড় নির্জন দুটি জলাশয়। অনেক উচ্চতায় পাহাড়ের মাঝখানে যেমন থাকে। হঠাৎ হয়তো একটা নীল পদ্ম ফুটে ওঠে শরতের সকালে।

চোখ দুটো আধবোজা করে কালু যেন ক্ষমা চাওয়ার গলায় বললে, 'বড়মা বকবেন। আমাকে বলে দিয়েছেন, ফ্যাশানট্যাশান একেবারে করবে না। যা দেবার উনিই দেবেন।'

কমলের চটি নিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। আমাদের দুজনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বলি স্বাধীনতা। পৃথিবীতে কটা লোকের যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা আছে! এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এ করা যায় না—ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা ভাল ছেলে হয়ে। এরা আবার শ্লোক বেঁধেছেন, টাকা গেলে কিছু গেল। স্বাস্থ্য গেলে বেশ কিছু গেল। চরিত্র গেলে সবই গেল।

চরিত্র কাকে বলে রে?

কমল পা থেকে জুতো খুলবে না। নতুন জুতো পরেই যাবে। পুরনো জুতো দুপাটি নতুন বাক্সে প্যাক করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভদ্রলোক আমার হাতে দিলেন। নতুন জুতোয় কমলকে বেশ মানিয়েছে। এই বয়েসে মানুষের কি সুন্দর গুটি গুটি পা হয়।

আবার আমরা পথে। আলো ঝলমলে শাড়ির দোকান। কত রকমের শাড়ি ঝুলছে। অহঙ্কারী এক পুতুল নারী গাঢ় নীল রঙের একটি শাড়ি পরে কেমন বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। কালু যদি আমার বউ হত, এখুনি কালুকে ওই নীল শাড়িটা কিনে দিতুম। এমন ঝলমলে রাতে মনের মত সঙ্গী নিয়ে পথে পথে ঘুরতে ইচ্ছে করে। কখনও সরবত খাবো, কখনও কাবাব, কখনও সুগন্ধী আতর মাখান বেনারসী পান। তারপর এক সময় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসব বাড়িতে। আধুনিক বাড়ি নয়। ছোট দু কামরার গরিব গরিব আস্তানা। টিনের চাল দেওয়া বারান্দা থাকবে। বাঁশের আলনায় পাট পাট শাড়ি, ধুতি পাশাপাশি। ছোট্ট একটা তুলসিমঞ্চ পেছনের ছোট্ট মতো বাগানে। টিনের বালতিতে চাপা দেওয়া জল। পাশে মগ নয়, পেতলের ঘটি। নিকনো তোলা উনুন। একটা থুপ্পি মতো সাদা বেড়াল। যে খুব আস্তে আধবোজা চোখে মিউ করে ডাকে। তিনবারের চেষ্টায় একবার স্বর বেরোয়। বেশি রোজগার নেই; কিন্তু হিসেব করে বেশ চলে যায়। টিনের কৌটোয় কিছু খুচরো পয়সা, বড়, ছোট খানকয় নোট। দেয়ালে দেব-দেবীর ছবি। নিখুঁত চন্দনের ফোঁটা, সিঁদুরের টিপ। দরজা খোলা মাত্রই ধূপের গন্ধ।

পৈঠের উঁচু ধাপে দাঁড়িয়ে কালু আমার দিকে ফিরে বলছে, 'চাবি। চাবি তোমার পকেটে।'

পেঁচিয়ে আঁটসাঁট করে পরা সিল্কের নীল শাড়ি। গাঢ় নীল ব্লাউজ। আধুনিক হাতা কাটা নয়। হাফ হাতা সাবেকি। গোল নিতম্ব যেন পিছলে পায়ের দিকে পড়ে যেতে চাইছে। ফর্সা পাতলা পায়ে একটু আগে দেখা নীল স্যাণ্ডাক ব্যালেরিনা। কোথা থেকে চোরা আলোর আভা এসে পড়েছে ফর্সা, তেলতেলে মুখে। চোখ দুটো কালো হীরের মত জ্বলছে। মুখে পানের অবশিষ্ট। পাতলা লাল ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। 'চাবি দাও। কি, হল কি তোমার!'

'দেখছি।'

'আহা, আমাকে যেন দেখনি। দেখে দেখে চোখ বলে পচে গেল।'

'তুমি ঢুকো না। তুমি দুধাপ উঁচুতে এইভাবে সারারাত দাঁড়িয়ে থাক। অসুস্থ পৃথিবী শুয়ে পড়েছে। রাতের বাতাস চলেছে অভিসারে। আকাশে তারাদের গজল। ওই দেখ তোমারই হাতে পোঁতা তস্কর মাধবীলতা জানালা বেয়ে চালে

উঠেছে। তোমার মুখটা আর একটু বাঁপাশে ফেরাও। নাকের পাথরে আলোর ফলা আর একটু তীক্ষ্ণ হোক। কে বলে পৃথিবী ভয়ঙ্কর। এই মুহূর্তের শামুকখোলে কত জন্মান্তর কাটানো যায়, যে জানে সে জানে। তুমি দাঁড়াও আমি গাই—গয়াগঙ্গা, প্রভাসাদি, কাশী, কাঞ্চী কেবা চায়।

কমল ভীষণ জোরে কান ফাটানো সুরে ডাকছে—'বাবা। ও বাবা। তুমি শুনতে পাচ্ছ না কেন?'

কালু বললে, 'গল্প ভাবছিলেন, তাই না মেজদা!'

আমার মুখে প্রশ্নটা প্রায় এসেই গিয়েছিল, 'কালু,বাবারা প্রেমিক হতে পারে না।'

সামলে গেলুম। বহু ভাব আছে, যা বাইরে আনতে নেই। ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মতো আলোয় আনলেই জ্বলে যায়। আর ছবি হয় না। সব সাদা।

'আর বলো কেন, একটা উপন্যাস লিখতে হবে গো। ভীষণ দুশ্চিন্তা।'

'তোমার গল্প কে পড়ে বাবা।'

কালু বললে, 'কত লোকে পড়ে। আমি সেদিন দুপুরে আপনার একটা গল্প পড়ছিলুম। পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলেছি। আপনি বৃদ্ধদের ছবি খুব সুন্দর আঁকেন। বৃদ্ধদের কাছ থেকে দেখেছেন তাই না!'

'আসলে আমি বৃদ্ধ হয়ে আসছি তো।'

'বৃদ্ধ। আপনার মাথার চুল পাকেনি। আপনি তো ছেলেমানুষ। ভীষণ ছেলেমানুষ। এই বয়েসের ছেলেদের মুখ কত পেকে যায়, গাল ভেঙে যায়। আমার বাবা বলতেন সৎচিন্তা করলে মুখের শ্রী ভাল থাকে, সুন্দর থাকে।'

কমল বললে, 'তুমি আমাকে একবার কোলে নাওনা বাবা।'

'কেন রে বুড়ো?'

'আমার নতুন জুতোয় কাদা লেগে যাবে যে।'

আমি আবার তেমন কোলেটোলে নিতে পারি না। ইতস্তত করছি। কালু বললে, 'আমি নিচ্ছি মেজদা।'

'এত বড় ছেলে কোলে উঠবি কি রে বুড়ো।'

'আমি বড় বাবা?'

'হ্যাঁ তো, তুমি কত বড়। আরো বড় হবে।'

কমল কালুর হাত ধরে আবার হাঁটা শুরু করল। দুকদম দূরেই বিখ্যাত খাবারের দোকান। সিঙাড়া, কচুরির গন্ধে বাতাস ম-ম করছে। জানতুম কমল এবার লাফাবে। ছেলেটা একটু পেটুক হয়েছে। তা এই তো খাবার বয়েস। মা বেঁচে থাকলে কত কি করে করে খাওয়াত। কালুর পাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে কমল

দুষ্টু দুষ্টু হেসে বললে, 'বাবাআ।'

'বুঝেছি বাবা। গন্ধ পেয়েছ।'

'হাঁউমাঁউ খাঁউ, সিঙ্গাড়ার গন্ধ পাঁউ।'

'পাঁউ তো চল যাঁউ।'

ভদ্র দোকান। ভদ্র বসার ব্যবস্থা। একালের যুবকদের তেমন হুল্লোড় নেই।

'কালু কি খাবে বলো?'

'না মেজদা।' কালুর চোখে-মুখে ভয়ের ভাব, 'আমি কিছু খাবো না। দোকানে বসে কিছু খেয়েছি শুনলে বড়মা ভীষণ রাগ করবেন।'

'কেন। দোকানে বসে খাওয়া খারাপ?'

'বড়মা আমাকে বলেছেন মেয়েদের যেন লজ্জা থাকে।'

'আর তুমি যে বাজার দোকান করছ!'

'বড়মা বলেন একাল আর সেকাল মিলিয়ে একটা কাল তৈরি করতে হবে।'

'তুমি তো বাইরের কারুর সঙ্গে যাচ্ছ না। তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

'না মেজদা,সত্যিই আমার লজ্জা করবে। সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে আমি খেতে পারি না।'

'আমি তোমাকে আড়াল করছি।'

কালু মাথা নিচু করল। মুখে সেই অদ্ভুত হাসি। ইচ্ছে করলেই মানুষ মানুষের কাছে সরে আসতে পারে না। অনেক বাধা। বংশ পরিচয়। অর্থনীতি। সমাজ।

খাবার এসে গেল। টেবিলের ওপাশে কালু আর কমল। আমি উল্টো দিকে কালুকে আড়াল করে আছি। দেওয়ামাত্রই কমল খেতে শুরু করেছে। একবার সিঙাড়া, পরক্ষণেই সন্দেশ। খাওয়ার কোনও ছিরিছাঁদ নেই। কালু হাত গুটিয়ে বসে আছে।

'কি শুরু করো। তুমি না খেলে আমি খেতে পারছি না।'

কালু মুখ তুলে ফিসফিস করে বললে, 'আপনার সামনে খেতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

'আমাকে তোমার লজ্জা! কেন?'

'আপনি আমার মনিব।'

'তুমি আমাকে নাই বা ওই চোখে দেখলে। মনে করো না আমি তোমার একজন আপনজন। নিজেকে অত ছোট ভাবছ কেন?'

কালু আমার মুখের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সিঙাড়ার একটা পাশ ভেঙে মুখে পুরল। কমলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার যে সব পড়ে যাচ্ছে। আমি খাইয়ে দোব বাবু!'

মুখে সন্দেশ, কমল হাসি হাসি মুখে বললে, 'না না।'

কালু বাঁ হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরল। কালুর বুকের কাছে মাথা রেখে আধবোজা চোখে কমল সন্দেশ খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। আর আমি অবাক হয়ে দেখছি। শিশুদের কি মজা। কোনও জাত নেই।

কালু বললে, 'আপনার ছেলে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। মাঝে মাঝে কি বলে ডাকে জানেন?'

হঠাৎ চুপ করে গেল। মুখ নামিয়ে নিল। ডিসে আঙুল খেলা করছে। মাঝের আঙুলে একটা লোহার আঙটি। আঙুলের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার শ্বশ্রূমাতা ভীষণ খটান।

'কি বলে কমল তোমাকে?'

কালুকে আর উত্তর দিতে হল না। কমল কালুর গায়ে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজিয়ে বলল, 'মা'।

কালু হাসছে। সেই অসাধারণ হাসি যা একমাত্র অতি পবিত্ররাই হাসতে পারে। যার মধ্যে কোনও পাপ নেই। আমিও কালুর মতই হাসার চেষ্টা করলুম। হাসি-মুখে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। হাসিতেই লুকিয়ে আছে কত কথা।

ফিরে আসতেই কমলের দিদা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালু তোমরা এত দেরি করলে?'

ছেলেমানুষের পেটে কথা থাকে না। কমল বললে, 'দিদা দিদা,আমরা কত কি করলুম। এই দ্যাখো না আমার জুতো। কত কি খেলুম।'

ভাগ্যিস বুদ্ধি করে এক বাক্স সন্দেশ এনেছিলুম। বড় কড়া প্রকৃতির মহিলা। ঘুষে তেমন কাজ হল বলে মনে হচ্ছে না। তেমন হাসি তো ফুটল না। সোনালী ফ্রেমের চশমায় আলোর ঝিলিক। কালুকে বললেন, 'পুজোর ফুল এনেছ?'

কালু একটু থতমত খেয়ে গেল। মাথা নিচু করে বললে, 'বড় ভুল হয়ে গেছে বড়মা।'

'কাল ভোরে পুজো হবে কিসে। সব মনে রইল,কচুরি-সিঙাড়া খাওয়া হল আর ফুলের কথাটাই ভুলে মেরে দিলে। যাও এক্ষুনি নিয়ে এসো।'

সেকি, এতটা হেঁটে কালু আবার সেই বাজারে ছুটবে?

বৃদ্ধা এবার কমলকে নিয়ে পড়লেন, 'তোমার পড়াশোনা আছে? না ইস্কুলে ছুটি পড়ে গেছে বলে সে পাট উঠে গেল।'

কমল আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'বাবা চলো বাড়ি যাই।'

'তোমাকে আমি বাড়ি যেতে বলিনি। পড়তে বসার কথা বলেছি। যাও

ওপরে গিয়ে মামার কাছে পড়তে বোসো। খেয়ে-দেয়ে দুজনে বাড়ি যাবে।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি একটু সাবধান হও বাবা। মা-মরা ছেলে দেখ ভেস্তে না যায়। বেশি আদর না দেওয়াই ভালো। বয়েসের তুলনায় ও কিন্তু একটু বেশি বুদ্ধিমান। সেকালে আমরা বলতুম পাকা ছেলে।'

কালু ধীরে ধীরে সদরের দিকে চলেছে। দুঃখী মেয়ে ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে যাবে আবার সেই অত দূর।

সাহস করে বললুম, 'মা,এই রাতে ও আবার একটা পথ যাবে। দিনকাল ভাল নয়। ফুল আমি এনে দোব।'

'তুমি যে বাবা কাগজের লোক। তাই কেবলই দিনকাল খারাপ দেখছ। খারাপের জায়গায় খারাপ আছে। নিজে খারাপ হতে না চাইলে কেউ কাউকে খারাপ করতে পারে না। ওর কাজ ওই করবে। তুমি তোমার ছেলের কথা ভাবো।'

বৃদ্ধা রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। কি একটা রাঁধছেন, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে।

কমলকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে কমলকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বুড়ো, তোর দিদা এত ক্ষেপে আছে কেন রে?'

কমল হতাশ গলায় বললে, 'দিদার খুব দুঃখু গো বাবা।'

'কিসের এত দুঃখ?'

খেতে পারে না দাঁত নেই, বেড়াতে যেতে পারে না পায়ে ব্যথা, কেউ গল্প করে না দিদার সঙ্গে, আর কেবলই বলে আমার একটা মেয়ে বাইরে, আর একটা মেয়ে ওপরে, আমার আর কে আছে?'

'তুই তো দিদার সঙ্গে একটু গল্প করতে পারিস?'

'করি তো! কত গল্প বলি। দিদা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শোনে।'

বারান্দার শেষ মাথায় নীলুদা বসে আছেন ইজিচেয়ারে। আজ আবার চাঁদ উঠেছে। মেঝেতে লতানে গাছের পাতার ছায়া ছড়িয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল, নীলুদা হয়তো মাকে বিয়ের কথা বলেছেন। বৃদ্ধার আতঙ্ক হয়েছে। সংসারের ওপর এতদিনের কর্তৃত্ব এবার চলে যাবে। ওই ঠাকুরঘর আর মালা আর দিন গোনা। ঈশ্বর তো সহজে দর্শন দেবার মতো সুবোধ বালক নন। কেবল শুনে যাও, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা শুধু চালিয়ে যাও। শুধু জপ করে যাও আর কেঁদে যাও। আনন্দ! কোথায় আনন্দ! নিত্য অফিস যাওয়ার মতো একঘেয়ে রুটিন। আসলে বোসো আর মালা ঘোরাও।

ভেবেছিলুম নীলুদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। না, জেগেই আছেন। বললেন, 'হোলো? জুতো কেনা হল?'

'হ্যাঁ, হোলো।'

'বোসো। আজ তো তোমার তেমন কাজ নেই। থেকে যাও না!'

'ওব্বাবা, এ যা দিনকাল, এক রাত বাড়ি ফেলে রাখা মানে, সব হাওয়া।'

'তুমি একটু বেশী ভীতু! তোমার পাড়া ভাল, কেউ কিচ্ছু করবে না।'

'না নীলুদা। সাবধানের মার নেই।'

'আবার মারেরও সাবধান নেই। তুমি ওটা বেচে দাও। এ বাড়িতে চোদ্দটা ঘর, তিনজন মাত্র প্রাণী। এখানে এসে থাক।'

'শ্বশুরবাড়িতে থাকতে নেই। বহুকালের সাবধান=বাণী।'

'সে শ্বশুড়বাড়ি আলাদা। এ বাড়ি মানুষ চায়। কদিন হল একটা কথা ভাবছি শ্রীকান্ত।'

'কি কথা নীলুদা?'

'এখন না, আড়ালে বলব।'

কমল সরে যেতেই নীলুদা বললেন, 'তুমি সোমাকে বিয়ে করে সংসারী হও। তোমার বয়েস আছে। একেবারে এলো হয়ে ঘুরে বেড়িও না। তাছাড়া ছেলেটা রয়েছে।'

'ওই ছেলেটার জন্যেই আমি আর বিয়ে করব না।'

'সেইজন্যেই তো এক ঘরানার মেয়ে নিতে বলছি। যাকে চেনো, জানো। সোমা সেরকম সংমা হবে না। মায়ের মতো একটু রাগী; তবে রাগ পড়ে যেতে মিনিট খানেকও লাগে না।'

'বিয়ের মত হলে সোমা আমার চেয়ে শতগুণ ভাল ছেলে পাবে।'

'আর পাবে না, দশ বছর আগে হলে পেত। নেলীর মত অবস্থা। কোনও সুন্দর যুবক বিয়ে করবে না। কেন করবে? কথায় আছে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি। এরা প্রায় মধ্যবয়সে পৌঁছে গেছে। তুমি রাজি থাকলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি। মেয়েটা আর কতকাল বাইরে পড়ে থাকবে!'

'নীলুদা, সোমা আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।'

'কে বলেছে?'

'আমার মনে হয়েছে।'

'তোমার মন, তার আবার মনে হওয়া। তুমি তো কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াও। কলেজে আমার ছাত্রছাত্রীরা তোমার বড় ফ্যান। তারা বলে শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অসীম ক্ষমতা—অবাস্তবকেই লেখার গুণে বাস্তব করে তোলে। পড়তে পড়তে মনে হয় এইটাই সত্যি। ঘোর কেটে গেলে মনে হয়, আচ্ছা

বোকা। মেয়েদের নিয়ে লেখ, মেয়েদের তুমি কিছুই জান না! যেটুকু জান, সব ভুল। তোমার কল্পনা। মেয়েরা হল স্বভাব-অভিনেত্রী। স্টেজে মেরে বেরিয়ে যায়। সোমাকে তুমি চেন না। তোমাকে সে ভালবাসে।'

'ভালবাসে?'

নীলুদা নীরব। আকাশে একখণ্ড চাঁদ। ভেসে ভেসে চলেছে। সোমা আমাকে ভালবাসে। হেডলাইন হবার মতো নিউজ। আমি একটা প্রেমের উপন্যাস লেখার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়ছি। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি দুটো চরিত্র। কালই আমার তাহলে বেনারস এক্সপ্রেস ধরা উচিত। প্রেম কাকে বলে, হাতে-নাতে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাক।

পাগল! আমি একটা রোমান্টিক ফুল। একটু আগে আমারই নির্বুদ্ধিতার জন্যে সরল, নিষ্পাপ একটা মেয়ে এখন বাজারে জল্ কাদায় ফুলের ছেঁড়া পাপড়ি কিনছে। আমার নিজেরও কম অপমান হল না! ঝিকে মেরে বউকে শেখানর মতো, কালুকে দাবড়ে, কমলকে ধমকে জামাইকে শেখান হল। ভদ্রমহিলা কেমন যেন হয়ে গেছেন। বিকট নীতিবাগীশ।

'নীলুদা, কমল রইল আপনার কাছে, আমি আসছি এখুনি।'

'কোথায় চললে?'

'যাবো আর আসব। এই মোড়ের মাথায়।'

বাইরেটা একেবারে বাহবা সুন্দর। ভুরভুরে চাঁদের আলো। ফুলের গন্ধ চুপিচুপি ঘুরছে। মনে হয় মৃগাঙ্কবাবুর জঙ্গলা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়েছে পায়ে পায়ে। আমার এই বাইরে আসার আসল উদ্দেশ্য কালুকে ধরা। আমার জন্যে বেচারার নিগ্রহ। মেয়েদের করুণ মুখ দেখলে আমার ভেতরটা দুলে ওঠে।

তা তো উঠবেই বাবা? তুমি যে গভীর জলের মছলি।

কে?

কে আবার, তোমার বিবেক।

বিবেকভায়া ঘুমিয়ে পড়।

মাথা নিচু, বেশ কিছুটা হাঁটার পর মনটা ভীষণ পবিত্র হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে এক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, আমরা সকলেই কারুর না কারুর পদানত। দয়া। মানুষের দয়ায় মানুষের বাঁচা মরা। কৃপা। কৃপা করো প্রভু। আমার সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকে। নিখিল, আমার বাল্যবন্ধু। বিয়ে-থা করল। ছোট্ট এক এক কামরার ঘরে সংসার পাতল। বেশ চলছিল। মাসের শেষে যা মাইনে পেত, তুলে দিত

বউয়ের হাতে। প্রথমে এল ছেলে, তারপর জোড়া মেয়ে। বেশ চলছে। নিখিল হাসে। মাঝে মাঝে রাগে। সপরিবারে এখানে ওখানে যায়। হঠাৎ নিখিলের চাকরি চলে গেল। সঞ্চয় শূন্য। চাকরি জোটে না। প্রভুরা অকরুণ। চেহারার জেল্লা মরে এল। বাড়ি ছাড়তে হল। সেই পুরনো গল্প। নিখিলের বউ এখন থিয়েটার করে। চেহারা পাল্টে গেছে। মূল্যবোধ বদলেছে। সেদিন দেখি তিনটে হুমদোর সঙ্গে বসে বিয়ার খাচ্ছে। তখন রাত প্রায় নটা। হাত-কাটা বিশ্রী এক ব্লাউজ। সাদা মতো এতখানি একটা পেট চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে ঝুলে আছে। কোথায় সেই লজ্জানত দৃষ্টি। সেই মধুর ভাষণ। সেই লাবণ্য। সিল্ক মোড়া একটা গিরগিটি।

মহাভারতের মানে সেদিন সুস্পষ্ট হল। ধার্মিক যুধিষ্ঠির পাশায় বসেছেন। বসতেই হবে। জীবনের সঙ্গে জুয়া তোমাকে খেলতেই হবে শ্রীকান্ত। লাইফ ইজ এ গ্যাম্বল। আর দুঃশাসন, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করবেই। পরিবার আবার কি ? ইজ্জত ? গাধা, বাঁচার জন্যে অথবা মরার জন্যে সব তোকে দিয়ে যেতে হবে। একে একে। খুলে খুলে। নান্য পন্থা। সেই সর্বশক্তিমান, যাঁকে দেখিনি, যাঁর কথাই শুনে আসছে মানুষ যুগ যুগ ধরে, তিনি কি ইচ্ছে করলে আমাদের একটা কিছু পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন না ? অবশ্যই পারতেন। যাঁর ফ্যাক্ট্রিতে মানুষের মত জটিল যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, তিনি ইচ্ছে করলে একটা কাপড়ের কল বসাতে পারতেন না। উদ্দেশ্যটাই যে আলাদা। আগে নিজেকে বিকিকিনির হাটে বিকোও, তারপর চোগাচাপকান পর। বড় দাস। ছোট দাস। দাসানুদাস। প্রভুর পদতলে নতজানু হও। প্রভুরও প্রভু আছে।

যে আগেভাগেই ষড়যন্ত্রটা জানতে পারে, সে এক সময় সব ছেড়ে ছুড়ে এক জায়গায় বসে পড়ে। তারপর হাত জোড় করে বলে, দাসোহম। আমি আর কারুর দাস নয়। তোমার দাস।

এই যে আমি। নিজেকে মোটামুটি বিকোতে পেরেছি। লেবেল মেরেছি, বুদ্ধিজীবী, লেখক। সেই দাস-পুত্র কমল তাই ইউনিফর্ম পরে ইংরেজি স্কুলে পড়ছে। কালুর বাবা, ভাল ভাবে বিকোতে পারেনি। গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে এসে টেঁসে গেছে। ছেঁড়া শাড়ি পরে কালু সেবা করছে বড়মায়ের। তার স্বাধীনতা নেই। ভালবাসার অধিকার নেই। সব সময় ভয়।

ঈশ্বর ! চালাকি পেয়েছ ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন আমাকে পাঠালে এখানে ! নাঃ, তোমাকে প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। তুমি সব চেয়ে বড় স্বৈরাচারী। ডেসপট ? সেই কারণেই রাজাদের মধ্যযুগে বলা হত, ঈশ্বরের খোদ

প্রতিনিধি। তোমার এত শক্তি, ক্ষুদ্র মানব আমি। পারবো না তোমার সঙ্গে।

I love Your stubborn purpose,
I consent to play my part
But now a different drama is being acted :
For this once let me be.

কঠিন উদ্দেশ্য তোমার ভালবাসি প্রভু
আমার ভূমিকায় আমি আছি বেশ
তবে এখন এক ভিন্ন পালা
একটিবার অংশ নিতে দাও ॥

আমার চলা থেমে গেছে। কোথায় চলেছি আমি। শেষ লাইনটা তোমাকে শোনাই শ্রীকান্ত ক্রীতদাস: To live your life is not as simple as to cross a field.

বাঁচা কি এতই সহজ যেন মাঠ পেরিয়ে চলে গেলে হেঁটে ॥

মুখ তুলতেই সামনে কালু। সিনেমা হাউসের নীল আলো পড়েছে মুখে। আমাকে দেখে চমকে উঠল ভূত দেখার মতো। মিহি ঘামে ফর্সা মুখ প্রতিমার মুখের মতো তেলতেলে। বুকের কাছে ধরে আছে বড়সড় শালপাতার একটা মোড়ক।

'আপনি ? আপনি এখানে কি করছেন ?'

'আমি তোমার জন্যেই বেরিয়ে এসেছি।'

নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলুম। যা ভেবেই বলে থাকি, এর অর্থ খুব গভীর। সত্যি সত্যিই কালুর জন্যে সব ছেড়ে, মানমর্যাদা গৃহসম্পদ সব ছেড়ে, আমি বেরিয়ে আসতে পারব ? বলতে কি পারব—

আজ ক্যোঁ পরবা নহী অপনে অসীরোঁ কী তুঝে।—
তোমার কাছে বন্দী হতে পরোয়া করি না আমি ॥

কালু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে কিছুক্ষণ। অদ্ভুত এক মায়া ছড়িয়ে গেছে সারা মুখে। খুব ধীরে বললে, 'বড়মা জানতে পারলে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। অন্য কোথাও আমি কাজ করতে পারব না যে। আমি যে ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম।'

আবার সেই ভয়। ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে। আমি বললুম, 'চলো, অত ভয় পাচ্ছ কেন ?'

'আমরা এক সঙ্গে ঢুকবো না কি ?'

'কেন ?'

'না না, আমি আগে যাই। আপনি একটু পরে আসুন।'

কালু হাসছে। সেই হাসি। কালু চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে ফিরে তাকাল। আর ঠিক সেই সময় সিনেমার বিকেলের শো ভাঙল। কুলকুল করে লোক বেরোচ্ছে। সেই স্রোতে আমি ভেসে গেলুম। কত রকমের নারী-পুরুষ। ঘামের গন্ধ, সেন্টের গন্ধ, সিগারেটের গন্ধ। কথা আর কথা। অজস্র শব্দ। এলোমেলো। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, চওড়া-চওড়া পিঠ। উঁকি মারা ব্রেসিয়ারের ফিতে। অল্প অল্প ঘামে ভেজা। বড় খোঁপা, এলো খোঁপা। সব গায়ে গা লাগিয়ে চিলতে চিলতে ঘরের দিকে ছুটছে। মুখে মুখে ফিরছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম। আজকের রাতের হিসেব চুকল। কাল সকালে আবার খাতা খোলা হবে। নতুন তারিখ। নতুন হিসেব। জমার ঘর। খরচের ঘর। বোকার প্রশ্ন—কি পেলে?

বেশ রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। কমল এল না। মামার বিশাল বিছানায় শুয়ে পড়েছে। গভীর নিদ্রা। কমলের দিদা বললেন, 'এই এত রাতে টানাটানি করে কি হবে বাবা। আবার তো সেই কাল সকালেই আসতে হবে। ঘুমুচ্ছে ঘুমোক।' কেমন করে যেন বললেন। তেমন সহজ শোনাল না। যাক গে। মানুষের মন মেজাজ তো সব সময় সমান থাকে না। বৃদ্ধার কিছু একটা হয়েছে। কমলও আজ কাল আসতে চায় না। কালুর সঙ্গে খুব ভাব-ভালবাসা হয়েছে।

পৃথিবীতে কত রকমের ভাব, কতরকমের ভালবাসা আছে?

পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটাকতক কুকুর শুধু জেগে আছে, এখানে ওখানে। ফ্ল্যাটের তালা খুলে কয়েক পা এগোলে আলোর সুইচ। রাস্তা থেকে ছিটকে আসা চাঁদের আলোয় আঁধার কিছু তরল। আমার আবার ভূতের ভয় আছে। গোপা জানতো। হাসত। এখন আমি জানি শুধু।

এক পা, এক পা এগোচ্ছি, আর ভয়ে মরছি। আমার মতো লোকের একজন সঙ্গী ছাড়া জীবন অচল। কমল পাশে থাকলে তবু সাহস কিছুটা বাড়ত। সদ্য রঙ করা দেয়াল। পালিশ করা দরজা। সব যেন জীবন্ত। বিজবিজ করছে। সুইচ টিপলুম, আলো জ্বলল না। প্রথমে ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ভয়ে হাত পা হিম হয়ে গেল। সাহস করে বার কতক খটখট করলুম। সর্বনাশ, আলো ছাড়া ওপরে যাব কি করে! সিগারেট খাই না। পকেটে দেশলাইও নেই।

আবার হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে একেবারে রাস্তায়। গোপার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। এ যেন উনুনে আগুন দিয়ে সরে পড়া। রেগে আর কি হবে? সে এখন সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কেবল আমার স্মৃতিতে একটি পদচিহ্ন। ফেলে যাওয়া একটি নাম। দু দিকে দু বাহু মেলে ধুধু চাঁদের আলোয় পড়ে আছে নির্জন

রাস্তা। সব বাড়িই অন্ধকার। কেবল বহু দূরে পাঁচতলা একটা বাড়ি বাতিঘরের মত জ্বলছে।

সামনে হলদে বাড়ির দিকে কি ভেবে একবার ঘাড় তুলে তাকালাম। বুকটা ধ্বক করে উঠল। রেলিং-এ কনুই, পরনে সাদা শাড়ি, সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকেই দেখছে। নিজের বিব্রতভাব কাটাবার জন্যে মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম, 'একটা দেশলাই ফেলে দেবেন! বড় বিপদে পড়ে গেছি।'

'দেশলাই, দাঁড়ান আসছি।'

'আসতে হবে না, আপনি ফেলুন, আমি লুফে নিচ্ছি।'

মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিচের দরজা খুলে গেল। টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন। স্বপ্নপুরীর দরজা খুলে গেল। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। সব সাদা। শাড়ি সাদা, ব্লাউজ সাদা। সাদা চাঁদের আলো। দুনিয়াটাই সাদা।

'আপনি আবার কষ্ট করে নেমে এলেন কেন?'

'তাতে কি হয়েছে? দেশলাইয়ে হয় না কি?'

'এখনও জেগে আছেন!'

'আর বলবেন না, বড় বিপদে পড়ে গেছি।'

'বিপদে!'

'এত রাত হয়ে গেল, মামা এখনও ফিরলেন না।'

'উনি আপনার মামা?'

'হ্যাঁ, আমার বড় মামা।'

'কোথায় গেছেন, কিছু বলে গেছেন?'

'কিচ্ছু না।'

'তা হলে!'

'আপনার তো সব জানা আছে। কোথায় ফোন করি বলুন তো?'

'ফোন? চলুন যাচ্ছি।'

দরজায় আবার তালা লাগালুম। মহিলা আলো ধরে সাহায্য করলেন। সারা পাড়া অন্ধকার। তার ওপর এক জন মানুষ ফিরছেন না। একজন কি দু'জন মানুষের তুলনায় বাড়িটা বেশ বড় হয়ে গেছে। কত দিনের প্রবাদ আজও কত সত্য, 'কারুর ভাতে ঘি, কারুর শাকে বালি।' কারুর ঘর জুটছে না, কারুর ঘরে ঘরে থাকার মানুষ নেই।

আমার মনে হচ্ছে একটা পাঁচ তারা হোটেলে এসে পড়েছি। কি ডেকরেশান! কি ফার্নিচার? পুরু কার্পেট। অসম্ভব অসম্ভব সব ব্যাপার। তাক লেগে যাবার মতো কাণ্ড। পয়সা আর রুচি থাকলে মানুষ কত ভাল ভাবে

বাঁচতে পারে !

সবই হল, তবে টেলিফোনে ডায়াল টোন নেই ! একেবারেই মৃত ! হায় শহর ! বেশ চলছে যা হোক । দেয়াল ঘড়িতে ফিন্‌ফিন্‌ করে বারোটা বাজল । আমার ভেতরটা দুলছে । ভদ্রলোক আসছেন না । আমার আর কিসের দুশ্চিন্তা ? আমার বরং আনন্দের দিন । যাকে দূর থেকে দেখে কেমন যেন হয়ে যেত, সে আজ আমার সামনে নরম সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে, হতাশ হয়ে বসে আছে । সারা ঘরে ভাসছে চাঁপাফুলের গন্ধ ।

'কি করা যায় ?'

মহিলার প্রশ্নে কল্পজগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলুম । সত্যিই তো, কিছু একটা করতে হয় । বললুম, 'এই সময় ফোনটা আবার অচল হয়ে গেল ।'

বেশ বুঝলুম । একেবারেই ফাঁকা কথা । আমি যদি এপাড়ার এক নম্বর মাস্তান হতুম, কি এই মহিলার একজন ডাকাবুকো প্রেমিক, তাহলে কি করতুম ! কি করা উচিত আমার ! দলবল নিয়ে চারদিকে ছুটতুম । আমার চ্যালারা বলত, 'গুরু তোমার কেস, জিন্দা অওর মুর্দা মাল আমরা নিয়ে আসছি ।' কিছু না হোক থানায় ছুটতুম ।

মহিলা বললেন, 'থানায় গেলে কেমন হয় !'

'থানা ?' আমতা আমতা ভাব আমার । থানা অনেক দূরে । বিজ্ঞের মতো, আসলে চোরা শয়তানের মত, যোগ করলুম, 'আজকাল থানায় গিয়ে কিছু হয় না । ছোটাছুটিই সার হয় । আর একটু দেখাই যাক না । আমার মনে হচ্ছে, এসে যাবেন এখুনি ।'

একটা প্রশ্ন জিভে এসে গিয়েছিল, কোনও রকমে ঠেকালুম, 'মামা কি বার-এ যান ?'

ঘুরিয়ে বললুম, 'আজ শনিবার তো ?'

মহিলা প্রখর বুদ্ধি ধরেন । বললেন, 'না না, বারেটারে যান না । ওসব দোষ নেই ।'

'না না, আমি ও ভেবে বলিনি ।'

একটা হাই উঠল আমার । জ্বর-জ্বর লাগছে । লুচির সঙ্গে ডিমের তরকারি আমার সহ্য হয় না । ওরা জোর করে খাইয়ে দিলে । অম্বল মতো হয়ে গেছে । এখন গরম একটা কিছু খেতে পারলে শরীরটা জুতে আসত ।

'তাহলে একটু কফি করি ।'

চমকে উঠলুম । মহিলা থটরিডিং জানেন ।

একটু ন্যাকামি করলুম, 'এত রাতে আবার কফি কেন ? তার ওপর আলো

নেই ।'

'তাতে কি হয়েছে । আমারও ঘুম পাচ্ছে । ঘুমটা ছাড়ান দরকার । বসুন আপনি । আমি আসছি । কফি করতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না ।'

মহিলা চলে গেলেন । কায়দার বাড়ি । এপাশ, ওপাশ, চারপাশ খোলা । সিনেমার সেটের মতো । আজ শহরে অদ্ভুত এক বাতাস খেলছে । ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা । মন কেমন করানো । স্মৃতির কফিন খুলে দিয়েছে । মৃত প্রিয়জনেরা যেন বেড়াতে বেরিয়েছে ।

আজ আর আলো নাই বা এলো, নাই বা এলেন সেই ভদ্রলোক । কমলের কথা ভাবার চেষ্টা করলুম । নিরস । রোমান্স নেই । বেশ বুঝলুম, কমলকে আমি তেমন ভালবাসি না । এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে । আমি যেন আবার আমার সেই বিবাহপূর্ব জীবনে ফিরে গেছি । বড় মন্দ আমি ।

এই শেষ কথাটা ভাবার মধ্যেও একটা চপলতা রয়েছে । আমার কাছে ভাল আর মন্দের কোনও তফাৎ নেই । আমার কোনও আদর্শ নেই । খানিকটা অ্যাম্বিশান আছে । আর আছে হাল্কা চালে, প্রজাপতির মতো নেচে নেচে উড়ে-উড়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবার বাসনা । আমার চরিত্রের কোনও মেরুদণ্ড নেই । সাজানো গোছানো কিছু বচন আছে । আর আছে ভালমন্দ ভাবনা ।

কফি আসছে । এপাশে ওপাশে গোটাকতক সেজ জ্বলছে সুদৃশ্য । হলুদ আলোয় ঢেউ তুলে, দুধের মতো সাদা শাড়ি পরে আমার স্বপনচারিণী আসছেন । কামুন্দীর মতো যাঁর গায়ের রঙ । বিদেশিনীর মতো মুখ । মহিলার শরীরে কি আরব রক্ত আছে ?

'নিন, কফি নিন । কি করি বলুন তো ? প্রায় সাড়ে বারোটা বাজল ।'

'আমার মন বলছে, কোথাও কোনও কাজে আটকে গেছেন । ফোন ডেড, চেষ্টা করেও খবর দিতে পারছেন না ।'

'তা হবে ! তবে দিনকাল তো ভাল নয়, সময়ে না-ফিরলে খারাপটাই মনে আসে ।'

মহিলা পায়ের ওপর পা তুলে আমার সামনে বসলেন । এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি পায়ে একটা হালকা চটি রয়েছে ।

'আপনার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি ।'

'তাই না কি ?'

'ভালই লাগে । মেয়েদের সঙ্গে খুব মিশছেন, তাই না !'

কি উত্তর দেব ভেবে পেলুম না । গোপাই ছিল আমার জীবনে একমাত্র মেয়ে । স্ত্রীকে আবার মেয়ে বলা যায় কি ? মাছের কালিয়া আর মাছের ঝোলে

অনেক তফাৎ। উপাদান এক হলে কি হবে। শেষেরটা পথ্য, প্রথমটা বিলাসিতা। যাকে বিয়ে করা যায় সে আর মেয়ে থাকে না। একটু লুকোচুরি থাকবে, হারাবার ভয় থাকবে, ঈর্ষা থাকবে, শত্রুতা থাকবে, একটু পাপ থাকবে, তা না হলে সবই তো সহজ। অনায়াস সরল-কর অঙ্কের মতো। হয় শূন্য উত্তর, কিছুই মিলল না, আর না হয় এক, দু'জনে মিলেমিশে একাকার।

'কি লিখছেন এখন ? নতুন কিছু লিখছেন ?'

'পুজো এসে গেল।'

'পুজোয় তো আপনাদের ওয়ার্কশপ খুলতে হয়। সাতখানা, আটখানা।'

'সে যাঁরা প্রথিতযশা। সাত আটখানা না হলেও তিন চারখানা তো লিখতেই হবে। কৃষ্ণেন্দু, অপরেশ, অনিল।'

'কি করে লেখেন ?'

'লিখে লিখে লেখাটাকে এমন সড়গড় করে ফেলেছেন, ভাবতে হয় না, প্রয়োজন শুধু স্পিডের। ওঁদের জগতে একটা কথা খুব শোনা যায়, নামানো। দেখা হলেই পরস্পরকে প্রশ্ন, কি নেমে গেছে ?'

'খুব কষ্টের জীবন তাই না ?'

'আঙুল আর কাঁধের কষ্টই বেশি। মেশিন ঠিক থাকলে, আইডিয়া আর প্লট নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই। পাতার পর পাতা বাঙলা, তেকোণা অক্ষর পেতে যাওয়া। বাঙলা অক্ষর তো বড় বেকায়দার। ট্রাঙ্গেলের ছড়াছড়ি।'

'ওই লেখকের লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে, তবে লেখেন বড় কম।'

'কে বলুন তো !'

'সুবিমল চৌধুরী। ভারি মিষ্টি হাত। আমার মনে হয় কম লেখেন তো, তাই এত ডেপ্‌থ।'

ইচ্ছে হচ্ছে, আমার লেখা সম্পর্কে আর একটু আলোচনা হোক। মহিলা একেবারে সে রাস্তা মাড়াতেই চাইছেন না। শেষে আমিই জিজ্ঞেস করলুম, 'আমার লেখার কি কি ডিফেক্ট ?'

'তেমন তো পড়িনি। যেটুকু পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, ডেপথ কম। সব ঠিক ঠিক ফুটছে না। সুপারফিসিয়্যাল। আপনি বেশি কথা বলে ফেলেন। অত না বললেও চলে। তাছাড়া, সিচ্যুয়েশান তৈরি করতে পারেন না। আরও একটু পাকতে হবে।'

শুনছি, আর চমকে চমকে উঠছি। এখন আর চমকালে কি হবে ? নিজেই তো ডেকে এনেছি সমালোচনা। বেশ হয়েছে।

'আপনি পুজোয় কখানা লিখছেন ?'

'একটা। তাইতেই প্রাণ যায়। মাথায় কিছু আসছে না।'

'দেখে লিখুন। বিদেশী বই দেখে ঝেড়ে দিন।'

'মন চায় না।'

'আপনাকে আমি অনেক প্লট দিতে পারি। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।'

'আপনার কাছে প্রেম আছে ?'

'হ্যাঁ প্রেম আছে, খুন আছে, সেক্স আছে, সব আছে।'

'লেখেন না কেন ?'

'লিখি তো। আমি ইংরিজিতে লিখি। দুখানা বেরিয়ে গেছে, আর একটা ছাপছেন উইণ্ডাস।'

'আপনি লেখিকা ! এই এত অল্প বয়সে ?'

'অল্প বয়েস ? আমার বয়স কত বলুন তো ?'

'মেয়েদের বয়েস বলা শক্ত।'

রহস্যের হাসি হাসলেন মহিলা। ফিন্ করে একটা বাজল বিদেশি ঘড়িতে। জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার নাম ?'

'আমার নাম এষা গুপ্ত।'

'আরেব্বাস, আপনার 'লাফিং হায়না' আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। পায়ের ধুলো দিন।'

মুখের কথা নয়, সত্যিই আমার ইচ্ছে করছিল, পা-দুটো জড়িয়ে ধরি।

'আমার বাবা আর মাকে নিয়ে লেখা।'

'আপনার মা স্প্যানিশ ?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাঁ বলেন কি ?'

'দেখছেন না, আমার চেহারায় একটু বিদেশি ছাপ রয়েছে।'

'ওই বইতে যা লেখা রয়েছে, সব সত্যি ?'

'সব সত্যি।'

'এত ভাল বাঙলা শিখলেন কি করে ?'

'আমার বাবাকে ভালবেসে।'

'মাকে ভালবাসতেন না ?'

'একদম না, শি ওয়াজ নোম্যাডিক।'

'এখন কিছু লিখছেন ?'

'মেটিরিয়ালস সংগ্রহ করছি। এইবার একদিন বসে যাব।'

'সাবজেক্ট ?'

'আপনি আর আপনার ছেলে।'

'সর্বনাশ!'

মহিলা হাসলেন। হঠাৎ মনে হল আমি ছোট হতে হতে কীটের মতো হয়ে গেছি। প্রবল এক চরিত্রের সামনে বসে আছি। আমার মতো দশ-বিশটাকে যিনি কড়ে আঙুলে খেলাতে পারেন। অজগরের সামনে ছাগল। হাসতে হাসতেই ফড়াক ফড়াক করে আলো জ্বলে উঠল। যেখানে যেখানে চাঁদের আলো গড়াচ্ছিল, সব মুছে গেল। বেশ একটা মায়ার জগৎ তৈরি হয়েছিল, আলোর খোঁচায় নিমেষে অদৃশ্য।

সিল্কের রঙের ঝলমলে দেয়ালে সুন্দর সুন্দর পেন্টিং ঝুলছে। বাড়িটাকে মনে হচ্ছে ফারওয়ার বৈঠকখানা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পবস্তু দিয়ে নিখুঁত সাজানো। এই মহিলার মন জয় করতে হলে আমাকে ঠেলে যে উচ্চতায় তুলতে হবে, সেই ঠেলার মানসিক শক্তি আমার নেই। আমার মোহ ছেড়ে গেছে। যুদ্ধে নামার আগেই পরাজিত। একটু আগে ভাবছিলুম, এই মহিলার মন জয় করার জন্যে নিজেকে কি ভাবে মেলে ধরব! ভাঁড়ামি করব! যেমন লেখায় করি। বাঙলা অথবা বোমবাই ছবির হিরো হব! দিশি মাস্তান হব! কলেজী আঁতল হয়ে, এলিয়ট, রিলকে ঝাড়ব। কামু, কাফকার ভায়রা ভাই হব! জ্যোতিষী হয়ে শনি বক্রী, মঙ্গল নীচস্থ করব! না যৌবনে যোগী হয়েছি বলে বৃহদারণ্যক শোনাব! সুবিমল চৌধুরীকে হিংসে হচ্ছে। কেমন নিঃশব্দে আসন পেতেছেন সম্রাজ্ঞীর নিভৃত অন্তরে।

ভাবতে ভাবতেই গাড়ি এসে গেল। সব শেষ। আরব্যরজনীতে যবনিকাপাত।

বড়মামার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। পুরোপুরি নীল রক্ত। চেহারায়, সাজে, পোশাকে, চলনে বলনে। বোম্বে ফ্লাইটে এক বিদেশিনীকে রিসিভ করে, 'পার্কে' শুইয়ে তারপর আসছেন।

'জুলি, ফোন ডেড?'

'হ্যাঁ। সারা সন্ধে তো আলো ছিল না। এই এল।'

'ও টপিক্স আর তুলিসনি।'

আমি বললুম, 'আপনার দেরি হচ্ছে দেখে খুব ভেবে পড়েছিলেন।'

'ন্যাচারলি। আমার উপায় ছিল না। হঠাৎ টেলেক্স। এদিকে ফোন ডেড।'

'আমি তাহলে আসি।'

'আসি মানে! আমাদের মিডনাইট ডিনারে, গিভ আস কম্পানি। আপনার মত একজন লেখক, বাড়িতে। জুলি, লেট আস সেলিব্রেট।'

'আপনার ভাগিনী আমার চেয়ে হাজার গুণ বড় লেখিকা। শি ইজ গ্রেট। আর এক দিন হবে, আজ আমার স্টম্যাকে শর্ট সার্কিট হয়ে আছে।'

'অলরাইট, অলরাইট। অ্যাজ ইউ প্লিজ। তবে কথার ঠিক থাকবে তো?'

'অবশ্যই থাকবে। এ বাড়ি তো আমার কাছে স্বপ্নের মতো।'

ঘরের সব জানলা খুলে দিলুম। চাঁদের আলোয় ভেসে গেল। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। 'এমনই বরষা ছিল সেদিন।' বরষা নয়, পূর্ণিমা ছিল। গোপাটাকে কিরকম পাকা পাকা দেখাচ্ছিল। লাল টকটকে বেনারসী। তার জমিতে আবার সোনালী কাজ করা। বিয়ের দিন আর যাই করুক মেয়েরা খোঁপাটা খুব যত্ন করে করে। ভেতরে কি সব পুরেটুরে দেয় মনে হয়। গোপার অবশ্য খুব চুল ছিল। ছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। সেই চিতায় যখন চাপান হল। প্রথমেই চুলগুলো কি রকম ফুরফুর করে পুড়ে গেল। পোড়া পোড়া চুল, আগুনের আঁচ নিয়ে দমকা বাতাসে আবার উড়ে উড়ে শূন্যে নাচানাচি। বিউটি, বিউটি। হ্যাঁ, এমন বিউটি যে ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। জল এসে যায় চোখে। গোপা তো বুড়ি হয়ে যায়নি। বেশ ছিল শরীরটা। যৌবনটাকে বেশ ধরে রেখেছিল। কেবল জীবনটাকেই ধরে রাখতে পারল না।

আমার সাদা বিছানায়, সাদা লোমঅলা কুকুর-বাচ্চার মতো চাঁদের আলো হুটোপাটি করছে। জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে চুপ করে। চোখের সামনে সাদা তোয়ালে ঢাকা পাশাপাশি দুটো মাথার বালিশ। বড়টা আমার। ছোটটা কমলের। কমল আজ নেই।

গোপাকে আজ শোয়াই। গোপা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সোনার কাজ করা লাল বেনারসী। লাল ব্লাউজ। হাতাটা কাপ হয়ে বসে আছে হাতে। কপালের মাঝখানে সোনালী টিপ। যে নেই, তাকে ফিরিয়ে এনে আমার এই বিছানায় কিছুক্ষণ শোয়াতে পারবো না? তবে আমি কিসের লেখক?

চাঁদের আলোয় গোপার মুখ লালচে দেখাচ্ছে। পাকা সিঁদুরে-আমের মতো।

মনে আছে গোপা, বিয়ের রাতে বাসরে তুমি কি করছিলে? মাথায় গাট্টা মেরেছিলে। দুষ্টু। প্রথম রাতেই কি ভাব। যাই বলো বাপু, তুমি আমার চেয়ে বেশ পাকা ছিলে।

গোপা, তোমার মনে পড়ে, সেই আমরা যেবার দার্জিলিং বেড়াতে গেলুম, তোমার এমন পরিকল্পনা, গরম জামা নিতে ভুলে গেলে। ম্যালে, শীতে কাঁপছ, এদিকে মুখে বলছ, কোথায় শীত! তুমি একটা পাগলি ছিলে, সুইট পাগলি। তারপর সেই বৃন্দাবন দাস লেনের খুশি-বউদি তোমার গায়ে শাল জড়াতে

জড়াতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জড়িয়ে ধরলে কি দার্জিলিং-এর শীত কাটে গো ঠাকুর'পো, কলকাতার শীত কাটে। এমন মেয়েটাকে পেলি কোথায় ! তোর বেশ এলেম আছে তো ?

গোপা, আমাদের চারপাশে কত ভাল ভাল মানুষ আছে !

বৃন্দাবন দাস লেনের সেই বউদি এখন কোথায় ! তুমি তো যাব যাব করে দিনকতক খুব নাচলে। শেষে নিজেই চলে গেলে।

তোমার মতো স্বার্থপর মেয়েমানুষের বিয়ে করাই উচিত হয়নি।

রাগ করলে কি করব। তোমার সব কিছু দিয়ে আমাকে দুর্বল করে দিয়ে, সব কিছু নিয়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম করে রেখে, চলে গেলে।

কি, ঘুম পাচ্ছে ? খুব ঘুম ! তোমার সেই বিখ্যাত হাইটো তোল। মাথার উপর দু'হাত তুলে শরীর টানটান করে। বুকের কাছটা, তুলতুলে জায়গাদুটো সূর্যতুর পদ্মের মত উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠুক। তোমার পা দুটো টানটান করে দাও। শ্বেতশুভ্র গোছ দুটো বেরিয়ে পড়ুক, অদেখা সৌন্দর্যের মতো।

সেদিন কি সুন্দর আলতা পরানো হয়েছিল তোমাকে। চিতার আগুন সেই রাঙা পায়ে চুমু খেতে গিয়ে ভক্তিতে কাঁপছিল গোপা ? না কামনায় ? তুমি জান। একমাত্র তুমিই জানো।

এইবার যাবে বুঝি ? কেন ? চাঁদ হেলে পড়েছে ? রাত ভোর হয়ে আসছে ? কোথায় আছ এখন ? কেমন আছ তুমি ?

যাও তাহলে। ফিরে যাও, মৃত মানুষের জলসায়। মাঝে মাঝে এসো, কেমন ? আমি ভুলে গেলেও এস। বিস্মরণের পৃথিবীতে, কে কাকে কতদিন মনে রাখে গোপা ? দিন যায়, দিন যায়, লেখা-রেখা মুছে যেতে থাকে। স্মৃতির চেয়ে ফটোগ্রাফ বরং বেশি স্থায়ী।

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ যেন বদলে গেলুম। সব মানুষেরই মনে হয় এই রকম হয়। ভোগের একটা জোয়ার মতো আসে। ইন্দ্রিয় পটলের দোলমার মত ফুলে ফেঁপে ওঠে। জোয়ার শেষে ভাঁটার টান ধরে। ভেতরটা ঝলঝলি খলখলি হয়ে যায়। মোটা মানুষ রোগা হয়ে গেলে, সেই রোগা শরীরে তার মোটা অবস্থার পাঞ্জাবির মতো।

সামনের সুদৃশ্য বাড়িটার দিকে আর ভয়ে তাকাই না। এষা ছাদে আসে। কাপড় জামা শুকোতে দেয়। তাকালে এবার নিশ্চয় কথাও বলবে। আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে তার বিচরণ। উইণ্ডাস যার বই ছাপে তার কাছে আমি তো

এক ফেকলু। মানুষ নই, কেলে হাঁড়ি-মাথা এক কাকতাড়ুয়া। তাছাড়া আমাকে আর কমলকে নিয়ে একটা কিছু লেখার চেষ্টায় আছেন। ভয়ঙ্কর কথা ! আমি কোনও উপন্যাসের চরিত্র হতে চাই না। রক্ষে করো বাবা।

ওই দাশ পাবলিশার্সের ফটিকচন্দ্র দাশ, ওই ভদ্রলোকই আমায় ক্ষেপিয়ে ছিলেন। বেস্ট সেলার হতে গিয়ে নিজেকেই প্রায় বেচে ফেলেছিলুম। সেলার হতে গিয়ে সোলড হবার দাখিল। আজই বিকেলে গিয়ে এই চিটচিটে ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব নাকের ডগায়। প্রেমের গল্প দেহের মশলা দিয়ে লেখার ক্ষমতা আমার নেই। একেবারে জাত-বাঙালী। ওষুধ খাওয়ার মাপা গেলাসে জীবন খরচ করায় অভ্যস্থ। আমার কি আর অত রঙ্গাই-নাচ সাজে। আমার পিতা মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে কোর্ট-কাছারি করতেন। জোড়া খিলি পান মুখে পুরে, পিক্-পিক্ পিক ফেলতেন ; আর খুব নরম গলায় মাঝে মাঝে মাকে ডাকতেন, হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা। কি হবে লিখে ! যশ, খ্যাতির কি দাম। অর্থেই বা কি হবে ! আজ আছি, কাল নেই। ফট করে যে কোনও মুহূর্তেই হয়তো চলে যেতে হবে। যে জগতে কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়, সে জগতে একটা পুরুষ, একজন নারী, বিছানা, বালিশ, ডিম ভাজা, তেলমালিশ, সবই অর্থহীন। জীবন এক দীর্ঘ নিদ্রা। স্বপ্ন দেখে চলেছি রকমারি। ঘুম ভাঙলে কি দেখব, জানা নেই। অপেক্ষা করতে হবে ঘুম যতক্ষণ না ভাঙছে।

একটা লরি এসে দাঁড়াল সামনের বাড়িতে। এষা আর এষার মামা সামনের বারান্দায় এসে দেখে গেলেন। পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে এষা। দেখব না, তবু দেখছি। একেবারে নাচিয়ের ফিগার। স্প্যানিশ বিউটি। চুলের ঢল নেমেছে কি সাংঘাতিক ! অল্প সোনালী আভা। হুইস্কির মতো গায়ের রঙ। আজ যেন বড় মারাত্মক দেখাচ্ছে। আমি যদি বিশাল, বিশাল বড়লোক হতুম, সাংঘাতিক আমার প্রতিপত্তি, তাহলে হয়তো এষার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠাতুম। সঙ্গে মটর দানার মতো হীরের আঙটি। বলা যায় না এষা রাজি হয়ে গেল। তারপর ! সুখ হত ! ভালবাসার জোয়ার বয়ে যেত কি জীবনে ? কিছুই হত না। সোনার থালা থেকে খাবার খাওয়া। থালা ভালবাসে ! থালার সঙ্গে ভালবাসা হয় কি !

শ্রীকান্ত, সুখ চাই, সুখ। সুখের অন্বেষণ করো। বাইসাইকেলের দোষ কি জানো ! যতক্ষণ প্যাডেল করবে গড়গড় চলবে। থামলেই থেমে গেল। পাল তোলা নৌকোয় সে ভয় নেই। বাতাস ভরে রাখো পালে। কৃপাবাতাস। হালটি ধরে বসে থাক নিশ্চিন্তে। চলুক ভেসে। এটুকু জানো তো, নদীর শেষ সমুদ্রে।

ধুমধাম শব্দে কি একটা নামছে লরি থেকে। কিছু এলো। ভদ্রলোকের হরেক

ব্যবসা। টাকার শেষ নেই। শখেরও শেষ নেই। যতই বলি না কেন কৌতূহল নেই, স্বভাব না যায় মলে। একবার উঁকি মারতেই হল। লরি থেকে বিশাল লম্বা এক খাঁচা নামছে। খাঁচা কি হবে রে বাবা! বাঘ পুষবেন না কি! যাক, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

কমল মামার বাড়িতে থাকলে আমি আর রান্নার হাঙ্গামায় যাই না। বড় ভজঘট। একটা টোস্টার কিনে এনেছি। মুচমুচে, হাল্কা বাদামী টোস্ট হয়। চাপ দিলে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, একটা একটা করে। মাখন মাখিয়ে মরিচ ছড়িয়ে মুচমুচ খাও। খেতে খেতেই অম্বল। অম্বল তো এখন ন্যাশন্যাল ডিজিজ।

এখন আমার সবচেয়ে বড় ভাবনা, কমল। ওর মামার বাড়িটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। নীলুদা এই বয়েসে বিয়ে-পাগলা হয়ে গেল! একে ক্ষীণ দৃষ্টি, তার ওপর বয়েসেও তো নেহাত কম নয়। যাঁকে বিয়ে করবেন তাঁর বয়েসও বেশি। দেখাই যাক কি হয়! হয়তো দেহের চেয়ে প্রেমই বড় হবে। আর আমার শাশুড়ি! দিন দিন বড় মেজাজী, বড় মুড়ি হয়ে উঠছেন। ক্যাঁট-ক্যাঁট কথা বলেন। বউ মারা গেছে, শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে আবার কিসের সম্পর্ক! কমলকেও আর যেতে দেব না। আমার ছেলেকে অন্য কেউ বকলে বা অবহেলা করলে আমার খুব খারাপ লাগে। বাইরে আমরা দেখতে পাই না, রক্তে রক্তে অদৃশ্য একটা বন্ধন কাজ করে। শ্রীকান্তেরই সৃষ্টি তো কমল! কালু ভালবাসে। কালুর ভালবাসার দাম কি! কে পোঁছে কালুকে ও বাড়িতে। আজ যাও বললেই, কাল চলে যেতে হবে। মানুষের কাছে কি মানুষ সহজে পাত্তা পায়। এই যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি খাতির পায়, সে তো এক ধরনের দুর্বলতা। ভেতরের কলকব্জা নাড়া খায় আর আমরা আসুন আসুন করি। আমরা একটা কিছু চাই। বলতে পারি না, ভাবে প্রকাশ করি। কই মেয়েদের কাছে মেয়েরা তো খাতির পায় না। মেয়েরা মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

শ্রীকান্ত, স্বার্থের অপর নাম ভালবাসা। তোমার কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা আছে। ঘষটে ঘষটে বেড়াই, তোয়াজ করি। স্বার্থ মিটে গেলে মার লাথি। এক্সপ্লয়টেসান, বাঙলা জানি না। ব্যবহারিক জগতে সবই ব্যবহারের সামগ্রী। জুতো, ঝ্যাঁটা, কেটলি, ছাঁকনি, স্ত্রী, পুরুষ, বড় কর্তা, ছোট কর্তা, সবই নাচ ময়ূরী নাচ রে।

অনেক ভেবেছি। বেশি ভাবলে বাঁচা দুঃসাধ্য। স্রোতের মাঝখানে কুটোর মতো ফেলে দাও নিজেকে। বিকেল উতরে যেতেই সেই ফটিকচন্দ্র দাশের কাছে

হাজির। একজন নামী, একজন মাঝারী আর দুজন নয়া লেখক গোল করে ঘিরে রেখেছেন প্রকাশককে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপালকের চাপা একটা অহঙ্কার তো থাকবেই। পুরনো গাড়ি বেচে, নতুন গাড়ি কিনেছেন। জাপান থেকে কালার টিভি আর ভিডিও এসেছে। ফ্রীজের ঠাণ্ডা দুধ আর গণ্ডাগণ্ডা সন্দেশ হল পথ্য। গোটা তিনেক বইতে পুরস্কার উঠেছে। প্রতি সপ্তাহেই বেস্ট সেলার।

ঢুকেই শুনলুম, কি একটা ব্যাপারে, ফটিকদা উঠতি দু'জনকে ধ্যাৎ ধ্যাৎ করে খারিজ করে দিচ্ছেন। বেফাঁস বা অমনোমত কিছু একটা বলে ফেলেছিল বোধ হয়। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে আমার সঙ্গে চোখাচোখি। এক গাল হেসে, অদ্ভুত খ্যাঁসখ্যাঁসে গলায় বললেন,' 'আজ দুখানা বধ করেছি।'

তার মানে 'পাকা চুলে এলো খোঁপা' দু কপি আজ বিকিয়েছে। সারা দিনে মাত্র দু কপি। নামী, প্রবীণ লেখক, একাধিক পুরস্কার প্রাপক গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। এক সময় বিশাল চাকরি করতেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। আমার দিকে অনুগ্রহ করে ফিরে তাকালেন, জ্যামিতিক ভঙ্গিতে। অল্প একটু হাসির মতো ভাব করলেন। জীবনে যাঁরা বড় হন, তাঁদের অসম্ভব মাত্রাজ্ঞান। কি লেখায়! কি জীবনচর্যায়। এই মনে হল আমাকে ভীষণ চেনেন, এখন মনে হচ্ছে একেবারেই চেনেন না। এই সাসপেনস তৈরি করতে পারেন বলেই না অতবড় লেখক। কখন কি করবেন, কোন দিকে মোড় নেবেন, কারুর বোঝার ক্ষমতা নেই, যতক্ষণ না শেষ চ্যাপ্টারের শেষ লাইনটি পড়া হচ্ছে। সে তো লেখার ব্যাপারে। জীবনের ব্যাপারে কি হবে! আমাকে চেনেন কি চেনেন না, তার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে কি? শেষ নিঃশ্বাসে জানা যাবে।

ফটিকদা বললেন, 'বসুন না, ও চেয়ার নেই বুঝি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লেখক উঠে পড়লেন, স্কাই হপার প্লেনের মতো। যে বিমানের ওঠা-নামার জন্যে রানওয়ের প্রয়োজন হয় না। লাফিয়ে উঠে পড়লেন, পরনে ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবি, অতি মিহি দিশি ধুতি। চোখে সোনার চশমা। তিনি বললেন, 'আমি চলি ভাই।'

দাশ বললেন, 'কপি দিচ্ছেন কবে?'

'পরশু সকালে চলে এস।'

বাইরে একটা আকাশী রঙের নতুন গাড়ি দেখে এসেছি। মনে হয় ওঁরই গাড়ি আর এও শুনেছি গাড়িটি প্রেজেন্ট করেছেন জামাই শ্বশুরকে। এমনও হয় ভগবান। মেয়ে শুনেছি অসাধারণ সুন্দরী। জামাই বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার। উল্টো হয়েছে তাই। কোথায় শ্বশুর জামাইকে গাড়ি দেবেন, তা না জামাই শ্বশুরকে।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

উঠতি লেখকরাও উঠে পড়লেন। ফটিকদা আর একবার উপদেশ দিলেন, 'লিখতে না জানলে লেখা যায় না। লেখা মেসবাড়ির রান্না নয়, যে যেমনই হোক পাবলিক মুখ বুজে খেয়ে নেবে। রান্নার বই দেখে রাঁধা যায় না। রান্নার হাত চাই। জগন্নাথ-লেখক আমরা চাই না। বাঙলা সাহিত্যে ব্লাড চাই।'

উপদেশের ঠেলায় ঘর খালি হয়ে গেল। দাশ পাবলিশার্সের বিখ্যাত ফটিকদা আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হ্যা হ্যা করে হাসলেন, তারপর বললেন, 'কেমন দিলুম ?'

'ভালই ঠুকেছেন। লেখা স্বর্গীয় জিনিস। ভূতে ধরার মত না ধরলে ঘষটানোই হয়, লেখা হয় না।'

'ধরলেই পারেন। নিজেই লিখবেন, নিজেই ছাপবেন, নিজেই বেচবেন।'

'অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে। আমার একটা আদর্শ আছে। বাভিচারে যেতে চাই না। আমি তো মশাই সেই পাবলিশার্স নই, যে, যে-লেখিকা কোলে বসবে তার বই ছেপে ছেপে তাকে লেখিকা বানিয়ে দোব।'

পকেট থেকে ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট সামনে মেলে ধরলুম।

'কি হলো ? এ আবার কি রঙ্গ ?'

'পারলুম না ফটিকদা। প্রেম দিয়ে, পারভারসান দিয়ে, রেপ দিয়ে, রাজনীতি দিয়ে জগাখিচুড়ি আমি বানাতে পারব না। এই নিন আপনার অ্যাডভানস্।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার বয়েস কতো ?'

'এগজ্যাট বলতে পারব না। মনে হয় পঁয়ত্রিশ চলছে ?'

'শরীরে কোনও ব্যামো আছে ?'

'তেমন কোনও ব্যামো নেই।'

'জপ, তপ, ধর্ম মাথা খেয়েছে ?'

'না।'

'তাহলে নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে কি লাভ ? লেখকে আর বারবধূতে কোনও তফাৎ নেই বুঝেছেন ? পাঠক যা চাইবে যে ভাবে চাইবে সেইভাবে সাজিয়ে দিতে হবে। নকশাল চাইলে নকশাল হতে হবে। আদিবাসী চাইলে তাই সাজতে হবে। শ্রমিক আন্দোলন চাইলে শ্রমিক নেতা সাজতে হবে। হাওয়াটা দেখতে হবে। দেখতে হবে গদির রঙ। মনে রাখতে হবে বই কিনবে লাইব্রেরী। টাকা গ্র্যান্ট করবে সরকার। আর মনে রাখতে হবে সিনেমা। গোটাকতক সিনেমায় লাগাতে পারলেই মার দিয়া কেল্লা।'

'আমি মশাই জীবনে প্রেমে পড়িনি। আমার কোনও বিকৃতি নেই। সোজা

বিয়ে করেছি, সংসার করেছি। একটি ছেলে গছিয়ে স্ত্রী সরে পড়েছে।'

'স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছেন তো ?'

'সে-তো বিবাহিত-প্রেম, ম্যারেড লাভ।'

'ধ্যার মশাই। লেখেন কি করে ! কল্পনার ক নেই। ওই প্রেমটাকে পেছিয়ে নিয়ে যান। দীঘা, গোপালপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ফুলেশ্বরে নিয়ে যান। খুব মিষ্টি করে, নরম হাতে একেবারে হাবুডুবু খাইয়ে দিন। তারপর হিন্দুমতে নয়, রেজেস্ট্রি ম্যারেজ। ব্যাস, ওটাকে ওইখানেই ছেড়ে দিন। এইবার আপনি খারাপ হয়ে যান। প্রভু আমি নষ্ট হয়ে যাই। আর একটা সেকসি মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। ওই একই প্রেম শুধু একটু কড়া করে চাপিয়ে দিন। একেবারে কেলোর কীর্তি করে। পাগল হয়ে যান, ম্যাড। এমন সব কাণ্ড করুন, পাঠক যেন পড়তে পড়তে খাট থেকে ছিটকে পড়ে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ঘাড়ে, কানের পাশে জল থাবড়ে আসে। অল্পবয়সীর সামনে বই লুকোবার চেষ্টা করে। পড়ার পর গুরুজনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করে। নীতিবাগীশ প্রবীণরা যেন ছি ছি করতে থাকেন। ছি ছি করছেন অথচ পড়ছেন। কত বড় অপকর্ম আপনি করছেন তা দেখার জন্যে বই হাতে হাতে ঘুরছে। এদিকে ওই মিষ্টি মেয়েটার সঙ্গে, আপনার প্রথম প্রেমিকার সঙ্গে ব্যবধান বাড়ছে। খিটিমিটি। মারধোর। ভায়োলেনস। মাঝে মাঝে চেপে ধরে সেকস, যা প্রায় রেপের মতো। হয়ে গেল প্রেগনেন্ট। আসছে অবাঞ্ছিত সন্তান। ডেলিভারির সময় প্রথম প্রেমিকা, মিষ্টি বউ হয়ে গেল ফট্। খেল খতম, পয়সা হজম। নবজাতকের দিকে তাকিয়ে আপনি ভাল হতে শুরু করলেন। আপনাতে আপনি ফিরে আসছেন আবার ; কিন্তু আপনার মিসট্রেস আপনাকে ছাড়ছে না। তক্ষকের কামড়। নেঙড়াচ্ছে, চুষছে, চটকাচ্ছে, ব্ল্যাকমেল করছে। মাঝে মাঝে ভাবছেন আত্মহত্যা করবেন। পিছুটান ছেলেটা। এইবার আপনি যা চান। ক্রাইম বা থ্রিলারের দিকে ঘোরাতে চাইলে মেয়েটাকে ফিনিশ করিয়ে দিন। আর তা না হলে নিজে ফিনিশ হয়ে যান। এডিশানের পর এডিশান। টেন পারসেন্ট আপনার, নাইনটি আমার।'

'মাত্র টেন পারসেন্টের জন্যে অত নিচে নামতে পারবো না।'

'কত হলে পারবেন ?'

'টোয়েনটি, টোইন্টি ফাইভ।'

'বাবা, আশা তো কম নয় ! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ! আগে কৃষ্ণেন্দু, অপারেশ, অনিলের লেভলে আসুন। দু-একটা বই ফিলমে ধরুক। আপনার ওই যে ওই বইটা, 'বুড়ো খোকা'র জন্যে কথাকলি কত দিয়েছিল ?'

'প্রথমে দুশো, তারপর স্ত্রীর অসুখ বলে কেঁদে কক্কে তিনশো। তারপর মার।

গেলেই মারতে আসে।'

'ঠিক হয়েছে। যাকে-তাকে বই দিলে ওই রকমই হয়। বইটা কিন্তু ভাল সেল দিয়েছিল।'

'হাল্কা লেখা তো!'

'হাল্কারই তো যুগ পড়েছে মশাই, কে আর ভারি চায়। হাল্কাই লিখুন না। আমার নীতি হল লেখকের টাকা আমি মারব না। টোইন্টি বলে টোপ ফেলব, এগারো শো বলে বাইশ শো ছাপব, আর ঠেকাবার সময় টেনও ঠোকাবো না, ন্যাজে খেলব, ও-পলিসি ফটিক দাশের নয়। নিন টাকা তুলুন। ফিফটিনই দোব। তবে বইমেলার আগে আমি বই বের করতে চাই।'

ফটিক দাশ উঠে পড়লেন। বাইরে অপেক্ষা করে আছে ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডার। পরিশ্রম করেন। সৎ প্রকাশক। ফাইভ, টেন, যা দোব বলেন তা দেন। তাগাদা মারতে হয় না। কাটা কাটা রস-কষহীন কথা। যতক্ষণ দোকানে থাকেন কর্মচারীরা জুজুবুড়ি। মুখে একটা পান পুরলেন। তিন তিনটে বই অ্যাকাডেমি মেরেছে। ছাপলেই এডিশান।

॥ ছয় ॥

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে তুষারের সঙ্গে দেখা। ওই লোকজনের মধ্যেই চিৎকার করে উঠল, 'আরে শ্রীকান্ত। ইয়াহু। কোথায় এতদিন ডুব মেরেছিলে গুরু। তোকে যে আমি গরু খোঁজা খুঁজছি। তোকে আমার খুব দরকার মাইরি।'

তুষার একটা ছোটোখাটো ডিরেক্টার। এক সময় অল্পস্বল্প সাহিত্য করত। মাঝে কিছুদিন বেপাত্তা হয়ে গেল। পুনরুদয় সিনেমা পাড়ায়। ডিরেক্টার। দুজনে দু'জগতের। দেখা-সাক্ষাৎ নেই বহুদিন।

তুষার বললে, 'চল, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'এখন আমি কোথায় যাবো? ছেলেটাকে একলা ফেলে এসেছি।'

'কোথায় ফেলে এসেছিস? জলে? ছেলের জন্যে ছেলের মা আছে। তুই গিয়ে দুধ খাওয়াবি রাসকেল!'

'ছেলের মা নেই রে। ওপরে হাওয়া হয়ে গেছে।'

তুষারের হাসি হাসি মুখ করুণ হয়ে গেল, 'অ্যাঁ, গোপা মারা গেছে? কি হয়েছিল রে?'

'কে জানে! পড়ল আর মরল। মাথা ধরে, মাথা ধরে, অসহ্য যন্ত্রণা। হাসপাতালে গেল। শেষ। ডাক্তাররা এক একজনে এক এক রকম বললেন।'

'বুঝেছি, ব্রেন টিউমার। আমার বোনটা মারা গেল গত বছর। ওই এক ব্যাপার।'

'চিত্রা মারা গেছে?'

তুষার বিষণ্ণ মুখে বললে, 'হ্যাঁ।'

আমিও একটা ধাক্কা খেলুম। চিত্রার মতো সুন্দরী, ভালো মেয়ে কলকাতায় খুব কম ছিল। ভীষণ ভালো নাচত। বেঁচে থাকলে এক নম্বর হতই।

তুষার বললে, 'আমাকে ভীষণ ভালবাসতো রে! আমার ডান হাত ছিল। যাক গে। যেতে তো একদিন সকলকেই হবে। আগে আর পরে।'

'কি দরকার বল না?'

'তোর 'বুড়ো খোকা' গল্পটা কাউকে দিয়েছিস? ছবি করার জন্যে কেউ নিয়েছে?'

'না রে।'

'ভীষণ হিলারিয়াস। তুই একটা ঘণ্টা আয় না আমার সঙ্গে। বেশি দূরে নয়, কাছেই।'

ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে ছটা। এক ঘণ্টা মানে সাড়ে সাতটা। আটটার মধ্যে ফিরতে পারবো। বললুম, 'চল, তাহলে!' লোভও হচ্ছে। সিনেমায় লেগে গেলে মার কাটারি। পদক্ষেপ। কদম কদম।

তুষার একটা দরকচা মারা গাড়ির মালিক। নিজেই চালায়। বসে আছি পাশে। তুষার বকবক করছে। বেশির ভাগই অতীতের কথা। সেই কলেজ, কমান রুম। দু-একজন বান্ধবী। অল্পস্বল্প দুষ্টুমি। ফেলে-আসা জীবনের জন্যে হাহাকার। অতীতের জন্যে মানুষের এই হাহাকারের কোনও মানে হয় না। যা গেছে, তা তো গেছেই।

তুষার হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'তোর চলে-টলে?'

'কি চলে?'

'লেখকের আরক। ইনস্পিরেশান ফ্লুইড।'

'আমি আবার লেখক! তার আবার ইনস্পিরেশান?'

'কেন রে! দু-একজন তোর লেখার কথা বলে।'

'ধুর, রবীন্দ্র-শরতের দেশে কলমবাজি অত সহজ নয়। এ দেশের পাঠক-পাঠিকারা ভীষণ বোদ্ধা। ফুকো মাল এক লাথিতে উড়িয়ে দেয়।'

তুষার চুপ করে গেল। সেই নীরবতায় হঠাৎ মনে হল আমি এক গর্দভ। বোকার মতো মায়ামৃগ ধরতে ছুটেছি। গাড়ি ধ্যাধ্যাং করে প্রায় পার্কস্ট্রিটের কাছে এসে পড়েছে। আমার মন একেবারে বেঁকে বসেছে। যাবার উৎসাহ আর

নেই।

'তুষার, তুই আমাকে নামিয়ে দে।'

'কেন রে?'

'ধুর ওই সব প্রডিউসার-মোডিউসার, মোদো-মাতালে ব্যাপার। ওসব আমার সহ্য হবে না। তুই কথা বলে নে। হয় হবে, না হয় না হবে। ও ভাই তুই ঠিক করে নে।'

'চল না, একটা ক্যারেকটার দেখবি। তোর লেখার ম্যাটিরিয়েল পাবি। পয়সা মানুষের কি সর্বনাশ করে নিজের চোখে দেখবি। পয়সাঅলা লোক হল খেজুর গাছের মত। ট্যাপ করে রস বের করে নিতে হয়। মাল কলকাতায় এসে পড়েছে, আবার কবে আসবে ঠিক নেই, আজই তোর কিছু বাণিজ্য হয়ে যাক। কি করবি সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে। সংসার তো শূন্য। তোর আর আছেটা কে! অন্য কোনও মেয়ে হলে অতটা শূন্য মনে হত না, গোপা ওয়াজ রিয়েলি সামথিং। কয়েকবার আমি দেখেছি, গোপার কোনও ডুপ্লিকেট হতে পারে না। অসম্ভব।'

বাকিটা পথ তুষার আমাকে অবাক করে দিলে। বিয়ের পর বার তিনেক তুষার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আর একবার আমরা তিনজনে একসঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলুম! হ্যাঁ, দীঘায় গিয়েছিলুম। এই সামান্য মেলামেশাতেই গোপা যেন তুষারের মনে একেবারে কেটে বসে গেছে। সেই সব দিনের ঘটনা, গোপা কি কথায় কি বলেছিল, কি শাড়ি পরেছিল, কেমন করে হেসেছিল, তুষার বলে চলেছে। ভয় লাগছে, অন্যমনস্ক হয়ে ভিড়িয়ে না দেয়! সন্দেহ হচ্ছে, গোপাকে কে বেশি ভালবেসেছিল, আমি না তুষার! দীঘায় ওরা দুজনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ সমুদ্রে স্নান করেছিল। আমি নামিনি। সমুদ্রকে আমি ভয় পাই। সমুদ্র কেন, যা কিছু বিশাল, তাই আমার কাছে ভীতিপ্রদ। বিশাল পর্বত। বিশাল অরণ্য। তুষার কি তাহলে গোপার প্রেমে পড়েছিল! গোপা এখন বহুদূরে। প্রেম অপ্রেমের ঊর্ধ্বে। গোটা চারেক লোকের মনে গোপা আছে, তাই গোপা ছিল, এখন আর নেই। বিশালের বিচারে থাকা না থাকা সমান। তবু এখন আমার ঈর্ষা হচ্ছে। তুষারকে আর তেমন ভাল লাগছে না। একটু আগে মনে মনে যার প্রশংসা করছিলুম, এখন তার অজস্র খুঁত বেরোতে শুরু করেছে। ব্যাটা মাল খেয়ে খেয়ে আগের চেয়ে বেশ মুটিয়েছে। ভুঁড়ি হয়েছে দ্যাখো। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ভাঁটার মতো। সিনেমার ফেকলু ডিরেক্টার। সিনেমাফিনেমা সব বাজে, আসলে মেয়েছেলের ধান্দা। আজকাল এই সব খুব হয়েছে। যত ভাবছি তত জ্বলে জ্বলে উঠছে ভেতরটা। আর মনে হচ্ছে, নেমে

যাই।

তুষার হঠাৎ বললে, 'গোপা তোকে যে কি ভালবাসতো, তোর কোনও ধারণা নেই। আমাকে বলেছিল, বিয়েটা আগের জন্মেই ঠিক হয়ে থাকে, কার সঙ্গে কার জীবন জুড়বে। আমি ভীষণ সুখী। ইয়ারকি করে বলেছিলুম, শ্রীকান্ত যদি আর কারুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তুমি কি করবে? আত্মহত্যা! হেসে বলেছিল, শ্রীকান্ত আর কাউকে ভালবাসতে পারবেই না, কারণ আমার ভালবাসায় কোনও ফাঁক নেই। ওর কাছে যখন আমি নেই, তখনও আমি আছি।'

তুষার বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরাল। গাড়ি চলছে। তুষার বললে, 'তুই আর বিয়ে করিসনি শ্রীকান্ত। আর তো কয়েকটা দুরূহ আগুনে বছর, কাটিয়ে দিতে পারবি না! খুব পারবি। ছেলেটাকে তেড়ে মানুষ কর। ওইটাই তোর ধ্যানজ্ঞান হোক। লিখছিস লেখ। চাকরি-বাকরিও করতে হবে পেট চালাবার জন্যে। তবে লেখাটেখা সব বাজে ব্যাপার। যশ খ্যাতির জন্যে অনেকেই করে, কিন্তু জাত লেখক, জাত গাইয়ে, জাত নাচিয়ে অন্য জিনিস। শুরু থেকে তাদের জীবনের ধরতাইটাই অন্য রকম হয়। ছেলেটার জন্যে জীবনটাকে উৎসর্গ করে দে। সব সময় মনে রাখবি, তারার চোখে একজন তোর দিকে তাকিয়ে আছে। মধ্যরাতের আকাশে তার চোখে ঘুম নেই। সে হল গোপা।'

এই কথা শোনার পরই মনে হল, তুষার আমার চেয়ে অনেক বড় আত্মা। আমি ওর নখের যোগ্য নই। তুষার একটা ক্রিস্ট্যাল। আমি একটা মাটির ঢ্যালা। মুখে চোখে একটা অন্যধরনের জ্যোতি বেরোচ্ছে। সারাটা দিন আমি কি জঘন্য, ঘিনঘিনে, আঁসটে চিন্তা করি! কি ভাবে তাকাই! জানালার শার্সিতে আটকে পড়া ভুসো নীল মাছির মত দিনের পর দিন ছ্যাঁ ছ্যাঁ করছি। কমলযোনিতে অন্ধ কীট। চোখ বুজোলেই দেহকাণ্ড ভেসে উঠছে। এ-বই, সে-বই, মহাপুরুষের মহামহা উপদেশ, দুরারোগ্য ব্যাধি কোনও ওষুধই ধরছে না।

গাড়ি একটা ছিমছাম হোটেলের কার্বে ঢুকে পড়ল। তুষার হেসে বললে, 'ভয় নেই, নেমে পড়। যাঁর কাছে যাচ্ছি, ভেরি গুডম্যান। লিটল নমিন্যাল ভাইস প্রেন্টি অফ ভারচু। নে নেমে পড়। কাঁটটা তুলে দি।'

হোটেলটার বেশ অভিজাত ইংরেজ-ইংরেজ চোহারা। লোচ্চাদের লপেটা লোচ্চামি নেই। দালাল, ব্যবসাদারদের পশু-পশু চেহারা চোখে পড়ে না। চারপাশ নিস্তব্ধ। হাসপাতালের মতো।

দোতলায় ধবধবে সাদা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তুষার বেল টিপল। দরজা খুলে গেল। কম বয়সী এক মহিলা। মনে হল নেপালী। পর্বতকন্যার

রূপ যেন ফেটে পড়ছে। অনিন্দ্যসুন্দরী। দামী সিল্কের শাড়ি দেহে যেন বিপ্লব তুলেছে। নাকের পাশে হীরে, তা না হলে অত জ্বলজ্বল করে! 'বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ভয় করে। সারা পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বর এমন এমন সব রূপের ফাঁদ পেতে রেখেছেন, অঘটন ঘটে গেলেই হল।

তুষার ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা কোথায়?'

মেয়েটি ইংরেজিতেই বললে, 'বাবা চান করছেন। ভেতরে আসুন।'

ঘরের মধ্যে ঘর। এলাহি ব্যবস্থা। বসার জায়গায় আমাদের বসিয়ে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল।

তুষার বললে, 'অবাক হচ্ছিস! নেপালের অভিজাতরা ভীষণ সুন্দর হয়। অঢেল টাকা। অধিকাংশেরই বিলিতি শিক্ষা।'

মেয়েটি ফিরে এসে আমাদের উল্টো দিকে বসল। দামী সেন্টের মৃদু গন্ধ বাতাসে। মুখের ত্বক সিল্কের চেয়েও মসৃণ। মেয়েটি মৃদু হেসে বললে, 'আপনি কাল এসেছিলেন। তাই না!'

তুষার বললে, 'আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন তার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দি, আমার বন্ধু শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বড় লেখক। কাগজের অফিসে চাকরি করে।'

নমস্কার বিনিময়ের পরে মেয়েটি বললে, 'আই অ্যাম সরি, আই কান্ট রিড বেঙ্গলি।'

আমি বোকার মত হাসলুম। মনে মনে বললুম, 'বাঙলা' আজকাল বাঙালীই কি পড়ে। একটা বইয়ের এডিশান কাটতে জীবন শেষ হয়ে যায়। বুকের ওপর লুটিয়ে থাকা মুক্তোর মালা দু আঙুলে নাড়াচাড়া করছেন সুন্দরী। দুঃখ কষ্টের পৃথিবী যেন এ-ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। ওই রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায় থমকে আছে। বেরোলেই পেছন পেছন চলতে শুরু করবে।

লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। পরনে নিখুঁত বিলিতি পোশাক। মুখে অমলিন হাসি। করমর্দনের জন্যে আমাদের দিকে চওড়া হাত এগিয়ে দিলেন একে একে।

সোফায় বসে বললেন, 'কি খাবেন বলুন!'

তুষার নিখুঁত সংযত গলায় বললে, 'নাথিং।'

'ঠাণ্ডা একটা কিছু।'

'তাহলে সফট।'

তুষার আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি এরই একটা স্টোরি সিলেক্ট করেছি। ভেরি হিলারিয়াস।'

'স্টোরির আউটলাইনটা আমাকে দেবেন। আমি পড়ে দেখব। একজন বড় ডিরেক্টর আজ সকালে আমাকে কনট্যাক্ট করেছিলেন। যদি হিন্দিতে যাই তাহলে বাঙলা ছবির কথা পরে ভাবব। বাঙলা ছবির মার্কেট ইজ ভেরি ব্যাড। উইক স্টোরি। উইক ডাইরেকশান।'

ভদ্রলোক সোনালী রঙের একটা সিগারেট ধরালেন। মেয়েটি উঠে চলে গেছে ভেতরের ঘরে। ভদ্রলোক কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছেন। কোল্ড ড্রিংকস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

আমরা দু'জনে প্রায় দুম করে পথে এসে পড়লুম। অনেকটা উঁচু থেকে উল্কার মত খসে পড়েছি। আমার চেয়ে বেশি লেগেছে তুষারের। আমি আসার সময় মাঝে মাঝে ভাবছিলুম, যদি হাজার পাঁচ পাওয়া যায়, ওই রকমই তো দেয় শুনেছি, তাহলে গ্রিলের দেনাটা শোধ হয়ে যাবে। এরপর কাঠের মিস্তিরিরটা কোনও রকমে শোধ করতে পারলেই মুক্ত পুরুষ।

ওই জন্যে আশা করতে নেই। নিরাশাটা তখন বেয়াড়া রকমের স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসহ্য লাগে।

চৌরঙ্গির কাছে এসে তুষার কথা বললে। এর আগে পর্যন্ত আমরা দু'জনেই চুপচাপ ছিলুম।

তুষার বললে, 'কিছু মনে করিসনি, শ্রীকান্ত। পয়সার এই খেলা রে ভাই। কখন কোন পথে যে হাঁটবে! অন্য টোপ গিলে বসে আছে। ফোড়ের তো অভাব নেই।'

'আমি কিচ্ছু মনে করিনি, তুষার। আমি কেবল তোর কথা ভাবছি।'

'আমি অভ্যস্থ। এসব আমার গা-সওয়া। তবে আমার প্রতিজ্ঞা, তোর ওই গল্পটা আমি করবই এবং হিটপিকচার হবে। আমার হল গণ্ডারের গোঁ। আমি বাঙাল বাচ্চা। চল কোথাও বসে এক কাপ চা খাই।'

'না' বলতে পারলুম না। এদিকে ভেতরটা ছটফট করছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেন জানি না, কেবলই মনে হচ্ছে কমল আমাকে ডাকছে। চায়ের সঙ্গে সামান্য টা হল। রাত বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। পথে পথে লোক ঘুরছে পায়ে পায়ে। সাধু, শয়তান, পকেটমার, বেশ্যা, দালাল, ফুর্তিবাজ। ভগবান যেন ফুটকড়াইয়ের ঝাঁকা উল্টে দিয়েছেন।

আজকাল গাড়ি রাখার মহা সমস্যা। কোনও রকমে এক জায়গায় ঢুকিয়ে প্রায় আধমাইল হেঁটে আমরা দুজনে এক কালের সেই বিখ্যাত দোকানে চা খেতে ঢুকলুম। ছাত্রজীবনে এখানে বড় বড় সব খেলোয়াড়দের জমায়েত হত। সে

পরিবেশ আর নেই। এখানে এখন কাদের আড্ডা হয় আমরা জানি। পর্দাফেলা কেবিনে কেবিনে মানুষের দুরকমের ক্ষিদেই মিটছে। পেটের আর দেহের।

চা এল, সঙ্গে হাওয়ার ফিশ ফ্রাই। জানি খাওয়া যাবে না। তবু নেওয়া। কিছু না হোক নাড়াচাড়া করে, আঁসটে গন্ধ শুঁকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে তুষার বললে, 'তুই তো একেবারে একা হয়ে গেলি। কি ভাবে, কাটাবি বাকি জীবনটা?'

'কাটিয়ে দোব। যদ্দিন না বড় হয়ে পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে তদ্দিন ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করব। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাব। বুড়ো হয়ে গেলে আর ভাবনা কি? চোখ যাবে, দাঁত যাবে, কান যাবে, স্মৃতি যাবে। ধৈর্য ধরে কিছু দিন অপেক্ষা করলেই, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।'

তুষার হাসল। আমাদের পাশ দিয়ে শ্যামলা রঙের ভীষণ চেহারার একটি মেয়ে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আধবুড়ো একটি লোককে প্রায় বগলদাবা করে কোণের দিকে একটা কেবিনে ঢুকল। বয় সঙ্গে সঙ্গে পর্দা টেনে দিল। পেছন থেকে মেয়েটির চলে যাওয়া, কোমরের কাছে তিন স্তর চর্বির ঢেউ, ঘাড়ের কাছে কায়দার খোঁপা, শরীরের গুরু মধ্যভাগ, সব কিছু পরিবেশটাকে কেমন যেন করে দিয়ে গেল।

তুষার বললে, 'তুই ভালো দেখে আটপৌরে একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেল, যে তোর ছেলেটাকে একটু স্নেহ-যত্ন করবে। যৌথ পরিবার ভেঙে আমাদের কি কাল হয়েছে দেখেছিস? ছেলেমেয়েরা সব ঝিয়ের কোলে মানুষ হচ্ছে। ভালবাসা, যত্ন কিছুই পায় না। ছেলেবেলাটাই মারাত্মক। ওই সময় মানুষের মন তৈরি হয়। ওইসব নোঙরা অশিক্ষিতা মেয়েছেলের কাছে কি শেখে বল! এ তো আর রয়েল ফ্যামিলি নয়, যে শিক্ষিতা গভর্নেস রাখবি। সে দেশও নয়। আমাদের পরে যারা আসছে, তারা আরও স্বার্থপর, আরও নিষ্ঠুর হবে। আমাদের আর বাঁচার পথ রইল না।'

আমি বললুম, 'সংসার থেকে একবার বেরিয়ে এসেছি। বয়েসও বেড়ে গেছে। মন নষ্ট হয়ে গেছে। সংসারের ঝুঁকি আর নোব না রে। বছরখানেক কষ্ট করে কাটাই, তারপর ছেলেটাকে ভালো কোনও আবাসিক স্কুলে দিয়ে দোব।'

'তাই কর। তবে তুইও তো মানুষ!'

'মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করব। কত ভালো ভালো ভাব আছে। হবি আছে। লেখাটাকে জাতে তোলার চেষ্টা করব।'

'খুব মনের জোর চাই রে! খুঁত-খুঁত করে বেঁচে থাকার মানে হয় না। বুড়োবার আগেই বুড়িয়ে যাবি।'

'দেখি, এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মনটাকে যদি সামান্য একটু তুলতে পারি তাহলে স্পিরিচ্যুয়াল ফিয়ারে পড়ে যাব, তখন জীবনের অন্য মানে পেয়ে যাব।'

'অত সোজা নয় রে। এক সেন্টিমিটার তুলতে যা জোর লাগবে, রকেট পাঠাতেও অত ফোর্সের প্রয়োজন হয় না। পারলে খুবই ভাল। না পারলে জীবন একেবারে ঝামা হয়ে যাবে। এই রক্তমাংসের শরীরের যে কত ফ্যাচাং!'

দাম মিটিয়ে আমরা উঠে পড়লুম। তুষার বললে, 'চল তোকে পৌঁছে দি।'

'কোনও প্রয়োজন নেই। তোকে অনেক দূর যেতে হবে। আমার বেশি দূর নয়। চলে যাব টুকটুক করে।'

তুষার বিদায় নিল। কেন জানি না মনে হল, মানসিক দিক থেকে তুষার আমার চেয়ে অনেক সবল। আমি বলি এক, ভাবি এক, করি আর এক। কতকগুলো ভয় না থাকলে আমি যে-কোনও দিন চরিত্রহীন হয়ে যেতুম। কে আমাকে বাঁচায় জানি না, তবু বহুবার পড়ে যেতে যেতেও খাড়া থেকেছি। যেমন এই মুহূর্তে আমার নানা রকম কদিচ্ছা হচ্ছে। রেস্তোরাঁয় একটু আগে দেখা ওই মেয়েটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক আমার সামনে দিয়ে অনুরূপ আর একটি গজেন্দ্রগমনে চলেছে। চলছে, থামছে। আড়ে আড়ে চাইছে। সাদা রুমালে মাঝে মাঝে ঠোঁট মুছছে। বেশ সাবধানে। লাল এনামেল যাতে চটে না যায়। সারা শরীরে ইচ্ছাকৃত অশ্লীল ঢেউ ভাঙছে। আমি ইচ্ছে করলেই পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু পারছি না যেতে। খুব নিচু, অথচ ভীষণ শক্তিশালী দেহতরঙ্গে আমি মাছি হয়ে গেছি। ওরা বুঝতে পারে। মেয়েটির চলন আরও মন্থর হয়েছে। বারে বারে তাকাচ্ছে। একবার একটু হেসেছে। ইচ্ছে করে আঁচল ঠিক করার ফাঁকে আমার নজর কাড়ার চেষ্টা করেছে। আমি কমলকে ভাবার চেষ্টা করেছি। আসেনি। আমি একই সঙ্গে গীতা আর বেদান্তের শ্লোক মনে আনার চেষ্টা করেছি। আসেনি। এসেছে দেহবাদী পশ্চিমের আধুনিক অবক্ষয়ী নির্দেশ। গোপাকে ভাবার চেষ্টা করছি। কোথায় সে। ইতিমধ্যে মেয়েটি চলে এসেছে আমার বাঁ কাঁধের পাশে। ফোলা ফোলা মুখের শুকনো চামড়ায় সাদা সাদা পাউডারের গুঁড়ো। চোখ দুটো ছাগলের মতো। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হলদেটে। ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে। সিনথেটিক শাড়ি। বহুদিন কাচা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল, বস্তিবাড়ি, নোঙরা পথ, অপরিষ্কার বাথরুম, খ্যানখেনে গলা কদর্য এক বুড়ি, ভ্যাপসা নর্দমার গন্ধ।

আমার গতি নিমেষে বেড়ে গেল। আমি কমলকে দেখতে পাচ্ছি। কালুকে

দেখতে পাচ্ছি। কমলের দিদা ঠাকুরঘরে। ধূপ জ্বলছে। নীলুদা গান গাইছে। আমার ঘরের সাদা বিছানায় সাতটা সাদা লোমঅলা কুকুরের মতো চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি জিতে গেছি। আমার প্রবল ইন্দ্রিয় পরাজিত।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কালু। কোলে কমল। রূপোর তবকের মতো চাঁদের আলোর চিলতে পড়ে আছে পথে। কালুর বুকের ওপর পাতার ছায়া নাচছে।

দূর থেকে কালুর গলা শুনছি, 'ওই যে তোমার বাবা আসছেন।'

আমি কাছে এসে গেছি। একেবারে সামনে। কালুকে আজ ভীষণ তাজা দেখছি। মনে হয়, বাজার-দোকান করতে হয়নি। দুপুরে বেশ বিশ্রাম হয়েছে। ঠাণ্ডা আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিল যেমন ওর শোবার অভ্যাস। কমল কালুর কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

'কি রে বুড়ো!—তুমি এত বড় ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ! কষ্ট হচ্ছে না!'

'আপনার ছেলে তো ফং কংএ। কোনও ওজন নেই।'

'কি রে বুড়ো, কোলে কোলে বেশ আছিস!'

'যাও তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

'কেন রে?'

'তুমি এত দেরি করলে কেন?'

'কাজ ছিল বাবা। অনেক কাজ।'

'তুমি অফিসে বললে না কেন, আমাকে বুড়ো তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।'

'কাল থেকে তাই বলব বাবু। এসো আমার কোলে এস। তোমার জন্যে এত বড় একটা চক্‌লেট এনেছি। আমার পকেটে আছে।'

কমল দু'হাত বাড়িয়ে কালুর নরম কোল থেকে আমার কেঠো কোলে ঝাঁপিয়ে চলে এল। গাটা কেমন যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। চক্‌লেট এত প্রিয়। শুনলো। তেমন উৎসাহ নেই কেন?

'হ্যাঁ গো, এর শরীর খারাপ না কি?'

'হ্যাঁ মেজদা। দুবার বমি করেছে। দুপুরে যা খেয়েছিল সব বেরিয়ে গেছে। মনে হয় গাটা একটু গরমও হয়েছে। কেমন যেন নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। চলুন একবার ডাক্তারখানায় নিয়ে যাই।'

'আজ বেশ রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে ডাক্তারবাবুকে কল দেওয়া যাবে।'

'আজ তাহলে আপনি এখানে থেকে যান। টানতে টানতে আর অত দূরে নিয়ে যেতে হবে না। ছোড়দি এসেছেন।'

'ছোড়দি?'

'সোমাদি।'

'সোমাদি এসেছে? আসার কথা ছিল না কি?'

'তা আমি জানি না মেজদা।'

বাবা, সোমা এসে গেছে! অ,গরমের ছুটি পড়েছে। তাহলে আমাকে তো এখুনি চলে যেতে হবে। সোমার ওই অহঙ্কারী ভাব আমার অসহ্য লাগে। তাকালেই মনে করে, আমি প্রেমে পড়ে গেছি। কাছে গেলেই দূরে সরে যায়। ভাবে অভব্য জামাইবাবুদের মতো আমি অসভ্যতা করে ফেলবো। সোমা পি-এইচ ডি করেছে, আমি করিনি। তাইতেই অহঙ্কার একেবারে গগন-ছোঁয়া। আমি আর ভেতরেই ঢুকবো না। সোজা মোড়ে গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।

'কালু, আমি আর রাত করব না। ভেতরে আর গেলুম না। তুমি বলে দিও।'

গোঁ চেপে গেলে আমার পক্ষে সব কিছু সম্ভব। ছেলেটা দুপুর থেকে অসুস্থ। বমি করছে। নেতিয়ে পড়ছে। জ্বর এসে গেছে, দুপা দূরে ডাক্তারখানা। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে ডিসপেনসারি চোখে পড়ে। কেউ একবার গিয়ে ডেকে আনতে পারল না! এ বাড়ির প্রায় সব কটাকেই আমার জানা হয়ে গেছে একমাত্র কালু ছাড়া। সে অবশ্য এ বাড়ির কেউ নয়। আমার শাশুড়ির মতো বিষয়ী খুব কম দেখেছি। এক তো বড়লোকের মেয়ে বলে অহঙ্কার। তারপর বড়লোকের বউ। সোমা আবার মাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আর নীলুদাটা ভণ্ড। সারা জীবন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাবে থেকে এখন বিয়েপাগল। জীবনে আর এ বাড়িতে আসব না। গোপা মারা গেছে, আমার আর এখানে আসার দরকার কি? আর সোমা যদ্দিন থাকবে তদ্দিন তো কোনও মতেই আসছি না।

বাড়ি এসে গেছি। কি আর এমন অসুবিধে হল। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। কেবল কমল যেন আরও কাবু হয়ে পড়েছে। গা বেশ গরম। আমার কাঁধে মাথা রেখে কোলে চেপে ওপরে উঠে এল। কি অদ্ভুত মানুষের জীবন! কাল এই সময়টায় কেমন ফুরফুরে ছিলুম! একটা বিরহী-বিরহী ভাব! আর আজ। বন্ধ সিন্দুকের মতো আমার মনের অবস্থা।

কমলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে জানলাটানলা সব খুলে দিলুম। চাঁদের আলো পাগলের মতো পাতায় পাতায় নাচানাচি করছে। অহঙ্কারী মেয়ে যেন জড়োয়ার গয়না পরে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। মাটির সমুদ্র যেন আকাশে উঠে এসেছে। তাকালেই মনে হচ্ছে দূর থেকে আমারই মতো কোনও নিঃসঙ্গ পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কমলের মাথার তলায় একটা বালিশ রাখতে রাখতে ফিসফিস করে বললুম,

'আজ আর কিছু খায় না।'

কমল মিষ্টি গলায় বললে, 'না বাবা। তুমি খেয়ে নাও।'

'আজ আমারও নো মিল রে বুড়ো!'

'তুমি কিছু খেয়েছ বাবা?'

'না রে বুড়ো। আজ আমরা দু'জনেই রাত-উপোসী হব। তুই একটু একা থাক। আমি ঝট করে চানটা করে আসি।' হাত তুলে আমার গাল ছুঁয়ে কমল বললে, 'যাও বাবা।'

বাথরুমটাকে মনে হয় কারাগার। চারপাশে উঠে গেছে খাড়া দেয়াল। উঁচুতে ঘষা কাঁচের জানালা। বেশ চান করছি। হঠাৎ দরজায় দুর্বল হাতের টোকা। কল বন্ধ করলুম।

বাইরে থেকে কমল করুণ গলায় বললে, 'বাবা বমি করে ফেলেছি।'

তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলুম। সারা গা বেয়ে জল চুইয়ে পড়ছে।

'কোথায় করেছিস?'

কমল কেঁদে ফেলল, 'বিছানার চাদরে বাবা। চাপতে পারিনি।'

স্তম্ভিত। মাথায় রক্ত চড়তে চাইছে। ওই অতবড় বিছানা! অত সুন্দর চাদর। এত রাতে ওইসব পরিষ্কার করতে হবে। কমলের ভীরু, অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কত দূর ভাবে আমাকে! কত পর ভাবে! মা বেঁচে থাকলে ও কি এমন কেঁদে কেঁদে বলত। চাদর নষ্ট করে ফেলেছে বলে ভয় পেত! শিশু হলে কি হবে! কমল জানে বাবা তার বাইরের জগতের। বেশি জুলুম সহ্য করবে না। চড়চাপড় চালিয়ে দেবে। বকবে, ধমকাবে।

কমল কান্না চাপতে চাপতে বললে, 'বাবা আমি পরিষ্কার করে দোব বাবা। আমি দোব। তুমি রাগ কোরো না। শুধু বলে দাও কি ভাবে করব।'

এবার আমার কাঁদার পালা। প্রথমেই বেসিন থেকে জল নিয়ে কমলের মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, 'বুড়ো, তুই সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়। একদম কাঁদিসনি। একদম ভাবিসনি। করে ফেলেছিস তো কি হয়েছে! আমি আছি না!'

আমার শেষ কথাটার মধ্যে বেশ জোর ছিল। এই বলার মধ্যে কোনও অভিনয় ছিল না। আমার প্রাণের কথা। ছোটদের আমরা ছোট ভেবে উপেক্ষা করি। বৈষয়িক ব্যাপারে তারা ছোট। অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে তারা বড়রও বড়। পরিষ্কার মন দিয়ে তারা সহজেই আমাদের চিন্তা তরঙ্গ ধরে ফেলে। কমল বুঝে ফেলেছে কর্তব্য ছাড়া আর তেমন কোনও সূক্ষ্ম টান আমার ভেতর নেই। সকাল

বেলা ফেলে দিয়ে আসি, রাতের বেলা তুলে নিয়ে আসি। খুব সহজ রুটিন। মনে সব সময়েই একধরনের বিরক্তি।

কমল সোফায় মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। এখনও সহজ হতে পারেনি। ওই অবস্থাতেই কান্নাচাপা গলায় বললে, 'হঠাৎ করে ফেলেছি বাবা। ইচ্ছে করে করিনি আমি।'

চাদর নষ্ট হয়েছে। গদিতে দাগ লেগেছে। সেজন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। কমল আমাকে ধরে ফেলেছে সেইটাই আমার লজ্জা। আমার বেদনা। আমার ভয়। মানুষের শৈশব কত অসহায়। এই মা-মরা ছেলে! দামী চাদর, বিছানা নষ্ট করে ফেলেছে বলে একটা চড় যদি আমি হাঁকাতুম, বাধা দেবার কে ছিল। কি করতে পারত ও। নিষ্ঠুরেরই তো দুনিয়া।

সব পরিপাটি করে ওকে বিছানায় শোয়াবার জন্যে তুলতে গেলুম। ঘুম জড়ানো গলায় বললে, 'আমাকে মেঝেতে বিছানা করে দাও বাবা। আবার যদি হয়।'

'হয় হবে। তার জন্যে আমি আছি। তোর এখন কেমন লাগছে বুড়ো!'

'একটু একটু কষ্ট হচ্ছে।'

'গা গুলোচ্ছে?'

'একটু একটু।'

কমলকে শুইয়ে কপালে হাত রাখলুম। চুলে ভরা ছোট্ট কপাল। মিষ্টি করুণ একটা মুখ। বড় বড় চোখের পাতা। ভেজা ভেজা। এই ছোট্ট এতটুকু একটা মানুষ। কত ধাক্কা খেতে খেতে বড় হতে হবে। কত কাঁদতে হবে! কত জ্বলতে হবে! পথ বড় অনিশ্চিত। বিপদ-সঙ্কুল। এই পাহাড়, বন, সমুদ্র নিয়ে। এই ঝোপ ঝাড় জঙ্গল নিয়ে। এই ঘাতক নিয়ে, পাতক নিয়ে গোলাকার যে বস্তুটি, মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরে ঘুরে চলেছে, কে বলেছে মানুষ সেখানে এসেছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়! কে ঈশ্বর! সব ভাঁওতা, আর ধাপ্পা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এলে সব মানুষ স্বভাবে সমান হত। আকাশ থেকে ছত্রীবাহিনীর মতো জনে জনে ফুড প্যাকেট ফেলতেন। এমন, 'যাও তুমি চরে খাও' গোছের একটা ব্যাপার হত না। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলত না। কিসের ভরসায়, কার ভরসায় এখানে আসা! কেনই বা আসা!

কমল পাশ ফিরতে ফিরতে বললে, 'তুমি শুয়ে পড় না বাবা!'

কমলের চুলে আমার আঙুল খেলা করছে। ছেলেটার কোঁকড়ানো চুল হয়েছে। ভারি সুন্দর। ভেলভেটের মত নরম। যদি পাপে না ধরে ছেলেটাকে এত সুন্দর দেখতে হবে! এ তো আমারই গর্ব! আমাদের দু'জনের সৃষ্টি।

আমাদের তিনজনের একই সঙ্গে একটা ছবি তোলাবো, তোলাবো করে তোলানো হয়নি। একপাশে আমি, একপাশে গোপা মাঝখানে কমল। তাকিয়ে দেখার মতো ছবি হত। যদি একটা মেয়ে হত, সে আরও সুন্দর হত। বহুকাল পরে ছবিটা দেখে সবাই বলত, 'সুন্দরের ফ্যামিলি।'

'গোপা,ঠিক হচ্ছে তো ? দ্যাখো তোমার ছেলের কোনও অযত্ন করিনি। এই দ্যাখো কেমন সেবা করছি। তোমার মতো পাশে শুয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে নিতে পারছি না। আমার বুক যে তোমার বুকের মতো নরম নয়। শরীরে মা, মা, গন্ধ নেই।'

কমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ও বাড়িতে আজ কি খেয়েছিল দুপুরে ! বিদঘুটে বিদঘুটে রান্নার জন্যে আমার শ্বশুর বাড়ি ফেমাস। কম খরচে পেট ভরানোর মতলব। বারান্দায় চাঁদের আলোয় গিয়ে বসার ইচ্ছে হচ্ছে। ভেবেছিলুম, আজ একটু লিখব। সে আর হল না। দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, সামনের বাড়ির বারান্দায় কেউ আছেন কিনা ! বাড়ি অন্ধকার। ভালই হয়েছে। বড়লোকের তো রোজই পার্টি থাকে।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নীল আকাশের গায়ে চাঁদ আটকে আছে। কতদিন ভালো জলসা শুনিনি। কোনও উৎসবে যাইনি। এইভাবে আমাকে জীবন কাটাতে হবে ! কি চাই আমি ? কিসে আমার সুখ ! কে খুব কাশছে। কেশে কেশে যেন দম আটকে ফেলার যোগাড়। মনে হয় হাঁপানি আছে।

না, লিখতে হবে। অসম্ভব একটা কিছু লেখা চাই। জীবনটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে হবে। প্রেম, রেপ, পারভারসান নয়। সংশয়, দ্বন্দ্ব, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবেশ-প্রস্থান, সব মিলিয়ে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে, যেখানে গেলে মনে হবে, জীবনের রহস্যটা ধরে ফেলেছি। সব লেখার শেষ লেখা। অনেক ভাবনা আসে,কিছুতেই ঠিক মতো সিচুয়েশানে ফেলতে পারি না। ফসকে যায়। গোঁজে যায়। জোলো হয়ে যায়। সেই কবিতাটা বারে বারে মনে পড়ে,

> Death and a writer's work. Just before dying,
> he has his lastwork read over to him. He still
> has'nt said what he had to say. He ordered it
> to be burned. And he dies with nothing to
> console him and with something snapping
> in his heart like a broken chord.

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে লেখক বললে, পড়ে শোনাও আমার পাণ্ডুলিপি। কই,যা বলতে চেয়েছি তা তো এখনও বলা হয়নি। পুড়িয়ে ফেল। পুড়িয়ে ফেল। কথা

শেষ না হতেই মারা গেল লেখক। কোনও সান্ত্বনা নিয়ে গেল না। ছিন্নতন্ত্রীর মতো কিছু একটা শব্দ হল হৃদয়ে।

সামনের বাড়ির জানালায় মৃদু একটা আলোর আভা ফুটে উঠল। কালো একটা ছায়া নড়ছে চড়ছে। সেই মেয়েটি ! হয়তো বাথরুমে যাবে। ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে জল ঢালবে গলায়। আজ মনে হয় বাড়িতে আর কেউ নেই। মামা মনে হয় সেই বিদেশিনীর সঙ্গে পাঁচতারায় তারা গুণছেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ওই মেয়েটিও আমার মতো নিঃসঙ্গ। ও বুঝতে পারে না। আমি পারি। আমার কষ্ট হয়। এ কি জ্বালা, পাশে এমন একজন কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলা যায়। জীবন কি গুটিয়ে রাখার জিনিস ! ঘুড়ির মত বেড়ে যেতে হয়। লাট খাবে, গোঁত মারবে। প্যাঁচ হবে। লাটাই, সুতো, ঘুড়ি সবই হাতে রইল, ওদিকে নীল আকাশ কেবল ডাকছে।

সামনের বাড়ির বারান্দার দরজা খুলে গেল। মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাতলা, সাদা নাইটির নিচের দিকটা বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে। রাস্তার দিকে ঝুঁকে আছে। পিঠে লুটোপুটি খাচ্ছে রেশমী চুল। বড় সামনা-সামনি। কথা না বলে থাকি কি করে !

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি ঘাড় তুলে তাকাল। জিজ্ঞেস করলে, 'কি এখনও ঘুমোন নি ?'

'না, ঘুম আসছে না। আপনি ?'

'আমার ফার্স্ট পার্ট হল। সেকেণ্ড পার্ট শুরু হবে। কমল. কি করছে ? বুড়ো ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীষণ শরীর খারাপ।'

'কি হয়েছে ?'

'জ্বর। বমি করছে।'

'ওষুধ দিয়েছেন ?'

'কাল সকালে। রাতটা দেখি।'

'আমি যাবো ?'

'আপনি !'

আমার কথা আটকে গেল।

মহিলা বললেন, 'দরজা খুলুন। আমি আসছি।'

'এত রাতে কষ্ট করবেন ? মামা রাগ করবেন।'

'মামা নেই। কাল ফিরবেন।'

দরজা খোলার জন্যে নিচে নামছি। পা দুটো টলছে। নেশা হয়েছে। বুকের

কাছটা কেমন যেন করছে। জেহান রিকটাসের সেই কবিতার লাইন মনে পড়ছে :

Who is She? I don't know but She is beautiful.
Rising in me like a Summer moon,
She is posted like a Sentinel.
Like a torch, like a gleaming light.

কে সে আমি জানি না/কিন্তু ভারি সুন্দর/গ্রীষ্মের চাঁদের মত আমার আকাশে/প্রহরীর মতো মোতায়েন/বাতি/না উজ্জ্বল আলো ॥

দরজাটা পুরো খুলিনি। একে গভীর রাত। কার চোখ কোথায় জেগে আছে। এক পাল্লার ফাঁক দিয়ে সে গলে এল। ফিনফিনে নাইটি। পায়ে নরম চটি। রাতে সমুদ্র জ্বলে। এ দেহও যেন জ্বলছে। কাঁধ, পিঠ, পুরোবাহু। ফ্লোরেসেন্ট রঙ মেখেছে ? গন্ধ। পোশাকের শব্দ। সরু সরু সাপের মতো চুল হিসহিস করছে। দরজার ছিটকিনি লাগাবার সময় আমার হাত কাঁপছে মদ্যপের মত। সে আগে আগে উঠছে। আমি পেছনে, আমাকে যেতে হচ্ছে না। অজগরের নিশ্বাস আমাকে টানছে। আমার চোখের সামনে সুডৌল নিতম্ব। দুলছে চুল। দুলছে শরীর। আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। সেই পোকার অবস্থা। বারে বারে আগুন ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসছে। প্রতিবারই পাখা পুড়ছে একটু একটু করে। মনে হচ্ছে। কি আশ্চর্য, সত্যিই মনে হচ্ছে, কমলের এই অসুখ যেন দীর্ঘদিন চলে। সত্যিই আমি শয়তান। চরিত্রহীন। অসংযমী। কেন মানুষ হঠাৎ হঠাৎ পিছলে যায়, এই মুহূর্তে আমি যেন বুঝতে পারছি। কি কঠিন এই নিজেকে ঠিক রাখা ! সব প্রতিজ্ঞা, সব আদর্শ নিমেষে টলে যায়। একধাপ থেকে আর এক ধাপে যখন পা তুলছে এষা, তখন আমার কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে।

এষা ঘরে ঢুকে সোজা খাটের দিকে এগিয়ে গেল। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে একটু সেন্ট ছড়িয়ে রেখেছিলুম।

এষা বললে, 'ঘরে কম পাওয়ারের আলো নেই ? শুধু শুধু এত চড়া পাওয়ারের আলো জ্বেলে রেখেছেন কেন ?'

'কমটাই জ্বালা ছিল। আপনি আসছেন বলে চড়া আলোটা জ্বেলে গিয়েছিলুম।'

এষা মৃদু হেসে কমলের মাথার কাছে খাটের একধারে বসে পড়ল। মৃদু আলো। সাদা ধবধবে বিছানা। সাদা ফিনফিনে নাইটি পরা বাদামী মেয়ে। এ যেন স্বপ্ন ! স্বপ্ন নেমে এসেছে ঘরে। গোপা কখনও নাইটি পরেনি। এ আমার

এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই পোশাকে নারীর নগ্নতা আরও রহস্যময়।

এষা একপাশে হেলে, কমলের মাথার বালিশে হাতের কনুই রেখে, আর এক হাতে কমলের মাথার এলোমেলো চুল সমান করতে করতে বললে, 'জ্বর খুব বেশি নয়।'

এষার একটা পা মেঝেতে আর একটা পা উঠে আছে। পোশাকের বড় বিপজ্জনক অবস্থা। খুব সহজ। কোনও গ্রাহ্যই নেই। এইভাবে বসলে কি হয় এষা যেন জানেই না। যে কোনও বিবাহিত পুরুষ, যার বিবাহিত জীবন অর্ধসমাপ্ত তার যে খুব অসুবিধে হয়। যে অন্য নজরে নারীকে দেখতে শিখেছে তার সামনে ওভাবে না বসলেই পারত ! একে মধ্যরাত, তায় চাঁদের আলোর প্লাবন, তার ওপর ভিজে ভিজে দমকা বাতাস, সঙ্গে বিদেশি সেন্টের সুবাস, কি যে হবে ! ঘড়ি চলছে, সময় চলছে, মানুষের নিয়তির চাকা নীরবে ঘুরছে।

এষা এবার কমলের পাশে আধশোয়া হল। যেন স্বপ্নে কমলের মা এসেছে। আমার চেয়েও নিঃসঙ্গ, আমার চেয়েও অসহায় একটি শিশুকে বুকে টেনে নিতে। হায় শৈশব ! কোথায় গেল আমার পবিত্র, ঝরণার জলের মত নির্মল, স্বচ্ছ শৈশব !

'আপনার ছেলেটি ঠিক যেন দেবদূত। সকালে আমার সঙ্গে কত কথাই বলে। আপনি ভীষণ দেরিতে ওঠেন। দিনের সবচেয়ে ভাল অংশটাই দেখতে পান না। দেখুন, কি সুন্দর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে। গভীর ঘুম।'

আমি কমলের নিশ্চিন্ত ঘুম দেখার জন্যে অশান্ত হয়ে ছুটে এলুম। খুব কাছে। এষার শরীরের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে দেখছি, ঘুমন্ত শিশুর পবিত্র মুখ। আমার বুকের তলায় কাত হয়ে আছে স্ফিংকস নারী। আমি মুখ দেখছি। দুটো মুখ। শিশু ও নারী। আমি আরও কিছু দেখছি।

কমলকে জড়িয়ে আছে অনাবৃত একটি হাত। মাঝের সরু আঙুলে ঝলমল করছে আংটির পাথর।

এষা বললে, 'কি সুন্দর তাই না ! কার মত মুখ হয়েছে !'

'এ বংশের কারুর মতো নয়।'

'তাই ?'

শ্রীকান্ত আর একটু সাহসী হও না ! ক্ষতি কি ! মহিলার মন বোঝার চেষ্টা কর। কি আছে কার মনে, নাড়াচাড়া না করলে বুঝবে কি করে !

বড় বেশিক্ষণ ঝুঁকে আছি সামনে। আর না। সোজা হলুম।

এষা বললে, 'কফি আছে ?'

'আছে।'

'কিছু খাবার আছে ! সন্ধেবেলা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। আপনি খেয়েছেন ?'

'না, আজ আর খাইনি কিছু।'

'কি আছে ?'

'চানাচুর আছে। ডিম আছে। পাঁউরুটি, মাখম, জেলি আছে।'

'বাঃ, অনেক কিছু আছে। কাল সকালের ব্রেকফাস্টটা সেরে রাখলেই হয়।'

'আপনি শুয়ে থাকুন, আমি করে আনছি।'

'তা কখনো হয় ! এসব ব্যাপারে আমি এক্সপার্ট। আমার হাতের ওমলেট খেলে ভুলতে পারবেন না।'

'একটু অহঙ্কার হল না ?'

'চ্যালেঞ্জ। চলুন আপনার কিচেনে।'

এ মেয়ের প্রাণ আছে। সেন্ট পারসেন্ট বেঁচে আছে। বেশির ভাগ মেয়েদের মতো অর্ধমৃত নয়। জীবনের প্রতি তিতিবিরক্ত নয়। এই তো চাই। যদ্দিন আছ, ওরই মধ্যে মজা করে বাঁচো। কোন মেয়ে বলে, মাঝ রাতে ব্রেকফাস্ট হবে।

রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে এষা বললে, 'বেশ ভালই হয়েছে বাড়িটা। এইবার আমি একটু একটু করে সাজিয়ে দিয়ে যাবো। আমার সাজাতে ভীষণ ভাল লাগে।'

'সত্যি সাজিয়ে দেবেন ?'

এষা থেমে পড়ল। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'সত্যি। কমল ভালো হয়ে উঠুক। উঠলেই কাজ শুরু করব।' মুখ দেখে মনে হল, এষা আমার খুব কাছের মানুষ। আমি তো একেবারেই গোলা মানুষ। এর তার বই থেকে ভাব চুরি করে লেখা তৈরি করি। কোনও চরিত্রই আমি তেমন বুঝি না। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে বসে আছি। রান্নাঘরে ঢুকে বললুম, 'এই প্রথম আমার রান্নাঘর নারী-পদ-স্পর্শে ধন্য হল।'

'বাবা, একেবারে সাধু ভাষা।'

'সাধুভাষায় কম খরচে অনেক বেশি কথা বলা যায়।'

'তা অবশ্য ঠিক। সমাস আর সন্ধির বাঁধনে আঁটসাঁট।'

নিমেষে এষা সব গোছগাছ করে ফেলল। এগবিটার খুঁজেছিল। নেই আমার। শুনে হতাশ হল না।

বললে, 'ওমলেটের ভালমন্দ নির্ভর করে ডিম ফেটানোর ওপর। ফাঁকি মারলেই ফেলিওর।'

আমার একমাত্র ভয় এষার নাইটি। বড় বেশি স্বাধীন। বিদেশি রমণীর

মতো। আগুন নিয়ে কাজ। টুক করে ধরে গেলেই হয়েছে। আজকাল চারদিকে যা সব হচ্ছে ! কোনটা দুর্ঘটনা, কোনটা আত্মহত্যা, কোনটা খুন বোঝার উপায় নেই।

গোটা চারেক মুরগির ডিম এক সঙ্গে ফাটিয়ে একটা পাত্রে ঢেলে এষা ফ্যাটাতে শুরু করল। কি তার কায়দা। বন্ধনহীন বুক দ্রুত হাতের চলনে থিরি থিরি কাঁপছে। আমার ওপর ভার পড়েছে পেঁয়াজ আর লঙ্কা কুঁচনোর। আমি দেখব, না ছুরি চালাব। সম্পূর্ণ বোলড আউট। পেঁয়াজের ঝাঁজে চোখ দিয়ে জল ঝরছে, না যা পেতে চাই সাহস করে তার কাছে এগোতে পারছি না বলে অন্তর-আত্মা কাঁপছে রাতের পাখির মতো ! যেও না রজনী।

ছিট্ করে একটু ডিমের গোলা এষার গালে গিয়ে লাগল। কাঁধের দিকে গাল নামিয়ে মোছার চেষ্টা করল। হল না। হাত দুটো জোড়া।

'দাঁড়ান আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

আঙুল দিয়ে তুলে আনলুম। খেয়াল ছিল না, আঙুলে লেগে আছে পেঁয়াজ আর লঙ্কার রস।

'ভীষণ জ্বালা করছে। লঙ্কার রস লেগে গেছে।'

'ইস খেয়াল ছিল না। দাঁড়ান ভিজে ন্যাপকিন দিয়ে মুছিয়ে দি।'

ফ্রিজের হাতলে পরিষ্কার ধবধবে ন্যাপকিন সকালেই ঝুলিয়েছিলুম। সেদিকে তাকাতেই এষা বললে, 'ওই হাতে ধরবেন ভেবেছেন ?'

'ধরব না ?'

'কি বুদ্ধি আপনার ! পেঁয়াজের গন্ধ হয়ে যাবে না ! আগে সাবান দিন হাতে।'

পেছনে দাঁড়িয়ে ভিজে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মোছবার সময় এষার মাথা আমার বুকের কাছে চলে এল। মাথা তার আশ্রয় পেল আমার বুকে। সামনে বাড়িয়ে রাখা দুটো হাত আপাতত স্থির। মুখ, চোখের পাশ দুটো, চিবুক এমন কি গলা আর ঘাড়ও মুছিয়ে দিলুম। এই সময় কেউ যদি একটা ছবি তুলে রাখত, স্বামী স্ত্রী বলে ভুল করত।

এষা বললে, 'আঃ কি আরাম !'

'একটু ওডিকোলোন দিলে আরও আরাম হত।'

আমি এবার তোয়ালেটা এষার কপালে চেপে ধরলুম। ছোট্ট চুলে ঘেরা কপাল। আমার কাঁধে, মুখে, চোখে অজস্র অলৌকিক আঙুলের মতো হিলহিল করছে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ আমি আর এ জগতে রইলুম না। ইংরেজ ঔপন্যাসিক হলে কত সহজে লিখতে পারতুম, একটি মাত্র লাইন, উই মেড

লাভ।

কোথায় ডিম। কোথায় ওমলেট। ভেসে গেল মাঝরাতের ব্রেকফাস্ট। চ্যালেঞ্জ! এমন ওমলেট ভাজব। যা আপনি কখনও টেস্ট করেন নি। দ্যাট ইজ দ্যাট। রিয়েলি দ্যাট।

Plic/ plic, ploc. fine phic
Trottinait Sur le toit.
Ouf, ouf, ouf, Soleil brille
Et d'un coup, hop! la boit.

চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে এষা আবৃত্তি করছে।

বেসিনের ট্যাপটা ঠিক মতো বন্ধ করা হয়নি তখন। কলের মুখে বাটি। জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে। এষার কবিতার মতো :

Plink, plink, plunk fine rain
is tapping on the roof.
Ooh, ooh, ooh, the Sun
comes out and shows it up.

দীর্ঘ তিনবছর পরে এই হল। শরীর ঝরণার ধারে শ্বেত পাথরের মত শীতল। মাটিতে শুয়ে আছে এষা। হাতে মাথা রেখে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে চুল। কালো আলোর ছটার মতো। চওড়া পিঠ ক্রমশ সরু হতে হতে কোমর। সেখানে শরীর সাগরের নিখুঁত একটি উদ্বেল ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পায়ের পাতায়। সানট্যান চামড়া। জায়গায় জায়গায় সোনালী। উপুড় করা শ্বেতপাথরের বাটির মতো দুটি বুক। কেউ বলতে পারবে না, একা আমি নিঃসঙ্গ।

এষা মাথা না তুলে শুয়ে শুয়েই বললে, 'আমি জানতুম এইরকমই হবে। এর চেয়ে অন্যরকম কিছুই হতে পারে না। দিস ইজ ট্রুথ। এই হল সত্য। দি ইটারন্যাল স্টোরি অফ এ ম্যান অ্যাণ্ড এ ওম্যান।'

আমি কোনও কথা বলতে পারছি না। ক্ষমা চাইব? না। সহজ হব? পারছি না। বয়েসটা যে বেড়ে গেছে। এ বয়সে লম্পট হওয়া যায়। প্রেমী হওয়া যায় কি?

এষা উঠে বসল। নিজের দিকে একবার তাকাল।

'একটা শাড়ি দিতে পারেন? এটা আর পরা যাবে না। ডার্টি হয়ে গেছে।'

পা টিপে টিপে ওঘরের দিকে চলেছি। ভয় এসেছে। কমল যদি উঠে পড়ে। যদি জেনে যায়। যদি বুঝে ফেলে। আলমারি খুলে গোপার একটা শাড়ি বের করে আনলুম। অনেক শাড়ি পাটপাট করে রেখেছি। নেবার সময় গোপার কথা

একবার মনে পড়ল। মনে হল আলমারির একপাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনকে মানুষ প্রয়োজনে অনেক কিছু বোঝাতে পারে। আমিও পারলুম। বোঝালুম, যে গোপা সেই এষা। সেই কালু। সেই সোমা। একই বহু হয়েছে। শাস্ত্রকাররা তো সেই রকমই বলছেন। বেছে বেছে সেই শাড়িটাই বের করলুম, যেটা কেনা হয়েছিল। কিন্তু পরার সুযোগ হয়নি গোপার।

এষার হাতে শাড়িটা সবে দিয়েছি, শোবার ঘর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে এল। কারুর যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। ছুটে গেলুম। বিছানার মাঝখানে কমল বসে আছে, দু'হাতে বুক চেপে। আবার বমি। চাদরের দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভমিটিং ব্লাড।

এষা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও আমি এক নজরে দেখে নিলুম। কেমন দেখাচ্ছে। গায়ে জামা নেই, যেন সাঁওতাল রমণী।

আমার আগে এষাই এগিয়ে গেল। এও লক্ষ্য করলুম শাড়ির তলায় শায়া নেই। আবার এও ভাবলুম এই সাজে এষাকে দেখে কমল কি ভাববে!

একবারই বমি করেছে কমল। বেশ খানিকটা রক্ত। এষা কমলের মাথাটা নিজের নরম বুকে চেপে ধরেছে। কেমন স্পর্শ একটু আগে আমার জানা হয়েছে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'দেখেছেন রক্ত।'

'নার্ভাস হবেন না। ঠাণ্ডা আধ গেলাস জল আনুন।'

কমল জল খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে আবার এষার বুকে মাথা রাখল। খুব নরম গলায় বললে, 'তুমি?'

'তোমার শরীর খারাপ, তাই আমি এলুম। কি কষ্ট হচ্ছে বলো।'

'ব্যথা করছে বুকে।'

এষা আমার দিকে তাকাল, 'আমি গাড়ি বের করছি। হাসপাতালে নিয়ে যাই। সকালের অপেক্ষায় না থাকাই ভাল।'

ঘড়ি দেখলুম। আর তো বেশি দেরি নেই। একটু আলো ফুটুক না। আকাশ একটু লাল হোক না।

বললুম, 'আর তো সামান্য বাকি।'

এষা উঠে পড়েছে। কমলকে ধীরে শুইয়ে দিয়েছে বালিশে।

'যেতে যেতেই ভোর হয়ে যাবে।'

এ এক অন্য এষা। বেশ কঠিন। ঋজু।

লাল মারুতি বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। এই পোশাকে এষাকে আগে দেখিনি। একেবারে বিলিতি মেয়ে। পেছনের আসনে আমার কোলে মাথা রেখে

শুয়ে আছে কমল। কেমন যেন হাসফাস করছে। আমারও কি যেন হয়েছে। আমি আর ভালমন্দ কিছুই ভাবতে পারছি না। এইটুকু ছেলের হার্টের অসুখ হতে পারে না। আলসার ? এই বয়েসে আলসার !

একেবারে ফাঁকা রাস্তা। মনে হয় আশিটাশিতে গাড়ি ছুটছে। এষা এত ভাল চালায় ! ড্যাশবোর্ডের লাল আলোয় সামনের অন্ধকার ঝিমঝিম করছে। ঠিক হয়েছে মেডিকেলেই নেওয়া হবে। সেখানে আমার বন্ধু সনৎ আছে। পরিচিত আরও একজন আছেন, আদিত্য। প্রয়োজন হলে ধরাকরা করা যাবে।

প্রথমে ভয় পেয়েছিলুম। রাতের রাস্তা। এই দিনকাল। কিছু হয়ে গেলে কি হবে ! আমার ভয়টা একটু বেশি। অথচ প্রেমিক। আমার জ্যোতিষদা যেমন বলেন, 'জাতে মাতাল তালে ঠিক।' রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। চোর-ডাকাত নেই। পুলিশও নেই। রাস্তা আর রাত আর দুপাশের নিঝুম বাড়িঘর। কেবল একটি মাত্র বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে জল ঢালা আর ঝাঁটার শব্দ। কেউ খুনটুন হল না তো ! রক্ত ধোয়া হচ্ছে। প্রমাণ লোপাটের জন্যে। যা দিনকাল পড়েছে। আজকাল সবই হয়। কমলের দিদা তো সারাদিন এই একই কথা বলে চলেছেন তোতা পাখির মতো, আজকাল সবই হয়। এগারো বছরের মেয়ে মা হয়। মুয়ে আগুন। হুগলী জেলার চাটুজ্যে পরিবারের মেয়ে। পূর্বপুরুষরা এককালে ডাকাতি করতো। সেই পয়সায় জমিদার। তেজ খুব। রক্তে তেজের কণা ঘুরছে।

মেডিকেলের গেটের মাথায় মেডিকেল শব্দটাও রাতজাগা ক্যানসার রুগীর মতো জেগে আছে আলোর অক্ষরে। গাড়ি ঢুকে গেল অনায়াসে। এষা পাকা ড্রাইভার। মানুষের মনের মুখে মেয়েদের কথায় মারি ঝাড়ু। আমি এই অবস্থায় একি ভাবছি ! ভাবছি এষার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, তাহলে আমাকেও গাড়ি চালানো শিখতে হবে।

সত্যিই কি আমি একটা নির্ভেজাল জানোয়ার।

দূরে এমার্জেনসির সামনে ছায়া ছায়া কিছু মূর্তি। আসলে বিপদের কবজিতে কোনও ঘড়ি নেই। যখন খুশি আসতে পারে। ছুটির দিনের বন্ধুর মতো। এলেই হল সদলে হই হই করে। এমার্জেন্সিতে ঢোকার মুখে উড়ো উড়ো অনেক কথাই কানে এল। টুটুমকে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছে বুবুন। পুলিশের গুলি খেয়েছে পটকা। নগা একদিন অ্যায়সা ঝাড় খাবে গুরু।

আমার কোলে কমল। সামনে গটগট করে চলেছে এষা। জিনস্ আর কামিজে পাকা ইওরোপিয়ান। পেছনে পেছনে যাচ্ছি আর গর্বে ভেতরটা ডগমগ করছে। সামান্য সামান্য ব্যাপার হঠাৎ হঠাৎ মানুষের অহঙ্কার কিরকম

ফুলিয়ে দেয়।

ভেতরে তিন পাশে তিনজন আহত যুবক কাতরাচ্ছে। আজকের এই রাতটাকে, আমার এই ফুলশয্যার রাতকে যতটা ঘটনাশূন্য, নিরীহ, নির্দোষ ফুল ফোটার রাত ভেবেছিলুম, ততটা নির্দোষ তো নয়। শয়তানের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। তার অসুখের নাম বিগ আই। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এই অসুখ আর ভালো করা গেল না। মন্দিরে মন্দিরে এত বাদ্য বাজনা, আরতি ! মসজিদে মসজিদে এত আজান, গির্জায় গির্জায় এত সমবেত প্রার্থনা ! সব ব্যর্থ।

হাসপাতালের দেয়ালে দেয়ালেও পোস্টার যুদ্ধ চলেছে। যুবকরা তো মরবেই। প্রবীণ পলিটিসিয়ানরা তাহলে বাঁচবেন কি ভাবে। দেখো না, ওদের সন্তানেরা যেন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বেশ চিকেন বিরিয়ানিতে থাকে মা।

কি ভাগ্য। আজ রাত জাগছে সনৎ। আমার চেয়ে বয়সে ছোট। লেখার বাতিক। সেই ভাবেই আলাপ। বন্ধুত্ব। সবে বিয়ে করেছে বেচারা। স্ত্রী স্কুলটিচার। কদিনই বা শুতে পায় বউয়ের পাশে। বিয়ের পর সাতদিনের জন্যে গোপালপুর গিয়েছিল। যে প্রফেসানে ঢুকেছে, ওই সাতদিনের স্মৃতি মনে থাকলে হয়। আজকাল আবার ডাক্তারদের কথায় কথায় যে-রকম পেটানো হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বাপের নামই না ভুলে যায়।

সনৎ এগিয়ে এল। প্রশ্নে প্রকৃত উদ্বেগ, 'কি হল দাদা ?'

'ছেলে।'

'কি হয়েছে !'

'ব্লাড ভমিট করছে।'

'সে কি ? কি খেয়েছে ? পেটে ব্যথা !'

এষা বললে, 'আপনি দেখুন। দুপুর থেকেই বারকয়েক ভমিট করেছে। বেশ পিসফুলি ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ একটু আগে ব্লাড। এখন কমপ্লেন করছে বুকে পেন।'

কথা বলতে বলতে এষা কমলকে বুকে নিয়েছে। কমলের মুখ দেখে মনে হল ওই কোলটাই তার বেশি পছন্দের। সনৎ অবাক হয়ে একবার আমার মুখের দিকে একবার এষার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সনৎ জানে গোপা আর নেই। তবে এ কে ? অনেক প্রশ্ন। সব প্রশ্ন চাপা থাক আপাতত। সনৎ বললে, 'চলুন।'

আমরা চলতে শুরু করলুম। একটা আধময়লা বেডে শুইয়ে কমলের পরীক্ষা শুরু হল। মাথার দিকে এষা। পায়ের দিকে আমি। কমল যেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছে, নিশ্চেষ্ট। কমলের কি হয়েছে আজকাল।

তেমন হাসে না, তেমন কাঁদে না। কি রকম যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। জল খেতে গিয়ে ছলকে জল পড়ে গেলে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, আর করব না, আর করব না। কেউ কি ওকে ভয় দেখায়! আমি তো দেখাই না। কে দেখায়? ওর দিদা! স্কুলের দিদিমণি!

নানাভাবে পরীক্ষা করল সনৎ ডাক্তার। ধরতে পারল না। বেশ বিব্রত। শুধু বললে, 'গলায় টনসিল রয়েছে দাদা।'

এষা বললে, 'একটা থরো চেকআপ চাই।'

'তা তো অবশ্যই চাই। যে কোনও ব্লিডিংএর প্রপার ইনভেসটিগেশান প্রয়োজন। নেগলেক্ট করা উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'এখন কি করবে? আমরাই বা কি করব?'

'এ্যাডমিশন করাতে চান?'

এষাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি করা উচিত?'

'এখানে ফেলে রেখে কি হবে?' মনে হচ্ছে স্পেস্যালিস্ট দেখাতে হবে। কাল আমরা কোনও এম ডি-র কাছে নিয়ে যাই। কি বলেন আপনি?' সনৎকে জিজ্ঞেস করল।

সনৎ বললে, 'গুড সাজেশান।'

আমি বললুম, 'আপাতত কোনও ওষুধ! ফিরে গিয়ে আবার যদি হয়।'

'দাদা প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল বরফজল।'

'বরফজল! এই বলছ টনসিল!'

'টনসিলে কোনও ইরিটেশান দেখলুম না তো। আছে তবে এখনও সেপটিক হয় নি।'

ফিরতি পথে কমল আমার পাশে বসে বসেই এল। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে বুক চেপে আছে।

'কি রে বুড়ো ব্যথা করছে?'

'না বাবা।'

'তাহলে চেপে ধরে আছিস?'

'এমনি। বাবা, তোমার ঘুম হল না।'

সেই অপরাধ বোধ জাগছে। বললুম, 'তাতে কি হয়েছে!'

এষা গ্যারেজে গাড়ি রেখেই চলে এল। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দু-একটা পাখি ডাকছে। উত্তর খুঁজছে। ভাবছে বিছানা ছাড়বে কি না! বিছানার চাদর আবার পাল্টে কমলকে বললুম, 'তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। একদম নড়াচড়া করবে না।'

'আমার কি হয়েছে বাবা?'

'সামান্য একটু শরীর খারাপ।'

'তুমি বাথরুমের সামনে একটা কিছু পেতে দাও বাবা।'

'কেন রে?'

'দুটো চাদর নষ্ট করেছি।'

'তোকে আর পাকামো করতে হবে না। শো।'

কমল খাটে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসল। এষা এসে পাশে বসেছে। রান্নাঘরের সামনে এষার নাইটি ছড়িয়ে পড়ে আছে। সর্বনাশ! কৃতকর্মের জলন্ত সাক্ষ্য। তাড়াতাড়ি তুলে নিলুম। নরম, মোলায়েম। মুঠোয় পুরে ফেলা যায়। এষার শরীরের মিষ্টি সোনালী গন্ধ ভুরভুর করছে। জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললুম। মেঝেটা ভাল করে দেখলুম। কিছু পড়ে আছে কি না! ও-ঘর থেকে এষা আর কমলের গলা ভেসে আসছে।

কমল বলছে, 'আমার অসুখ করেছে শুনে তুমি সেই রাত্তির থেকেই আছো মাসি?'

এষা হাসছে। কি সুন্দর মিছরির দানার মতো হাসি। আমি এষার প্রেমে পড়ে গেছি। ও যদি এখন আমাকে ছেড়ে চলে যায়, হয় আমি আত্মহত্যা করব, না হয় আমি পাগল হয়ে যাবো।

বেশ বড় দুকাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলুম। ভোরের পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোয় ঘর ভাসছে। আমার মনে হচ্ছে, খুব ভোরে আমাদের তিনজনের ঘুম ভেঙ্গেছে দূরপাল্লার কোনও ট্রেন ধরার জন্যে। এক মাসের ছুটিতে আমরা বেড়াতে চলেছি বাইরে।

কফিতে চুমুক দিয়ে এষা বললে, 'কমলকে খুব ঠাণ্ডা এক গেলাস হরলিক্স করে দি। আছে তো?

'আছে। আমি করে দিচ্ছি।'

'আপনি পারবেন না। করার একটা কায়দা আছে।'

কমলের পাশে খাটে হেলান দিয়ে এষা আরাম করে বসেছে। পা দুটো সামনে ছড়ানো। পরিষ্কার পাতলা পাতলা দুটো পায়ের পাতা। একটার ওপর আর একটা।

কমলের কথা ভাবব কি? এষার কথা ভাবতে ভাবতেই কাবু হয়ে গেলুম।

'আপনি কি আজ বেরোবেন?'

'আজ আর বেরেবো কি করে, কমলকে তো স্পেসালিস্টের কাছে নিয়ে যেতে

হবে ! আপনি যাবেন তো ?'

'নিশ্চয়।'

'আপনার মামা যদি এসে পড়েন।'

'তাতে কি হয়েছে !'

কমলকে হরলিক্স খাইয়ে এযা চলে গেল। এযার চেয়ে জুলি নামটা অনেক ভাল। যে নামে মামা ডাকেন। দুটো বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করিয়ে কমলকে শুইয়ে রেখে গেছে জুলি। আমি এক গাদা গল্পের বই এনে মাথার পাশে রাখলুম।

'বুড়ো তুই শুয়ে শুয়ে পড়। এখন তো আর তেমন কোনও কষ্ট নেই ?'

'না বাবা।'

'আমি তাহলে কাজ সারি। কেমন ?'

রাতের চাদর দু'খানা কেচে শুকোতে দিচ্ছি। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রথমে নামলো সোমা। হাত ধরে সাবধানে নীলুদাকে নামাল। নেমে এল কালু। হাতে নানা মাপের বাজারের ব্যাগ। সরষের তেলের পাত্র। বাবুরা সদলে বাজারে বেরিয়েছেন। যাবার পথে একবার খবর নিতে এসেছেন। কাল থেকে এদের প্রতি মনটা আমার বেঁকেই ছিল। আরও বেঁকে গেল।

ওপর থেকেই শুনছি, সোমা কালুকে বলছে, 'আরে বোকা মেয়ে ওসব ভেতরেই রাখো না। আমরা তো এখুনি চলে যাব।' ওরা ওপর দিকে তাকায়নি। তাকালেই দেখতে পেত আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।

কলিং বেল বাজল।

আমার তেমন কোনও তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

নীলুদা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'কি ব্যাপার, তোমার এই বেশ ?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললুম, 'ভেতরে আসবেন তো !'

সোমা নীলুদার পেছনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে চিনতে পারছেন ?'

উত্তরে, আমি কেবল হাসলুম।

কালুই কেবল জিজ্ঞেস করলে, 'মেজদা, বুড়ো কেমন আছে ?'

কালুর সেই অদ্ভুত সুন্দর মুখ। ভুরুর কাছটা কুঁচকে আছে, যেন কম আলোয় সূক্ষ্ম একটা কিছু খুঁজছে। এই একটা ভণ্ড আর একটা অহঙ্কারী চালিয়াতের সামনে আমি কমলের কথা বলতে চাই না। আরও অবাক হলুম, কালুর প্রশ্ন শুনে এরা কেউ একবারও বলল না, হ্যাঁ হ্যাঁ কমল কেমন আছে। বরং নীলুদা তাড়াহুড়ো করে বললেন, 'কমলকে আমরা নিয়ে যাবো, না একটু বেলায় তুমি যাবার পথে দিয়ে যাবে ?'

'কেন ?'

'কেন মানে ? তুমি তো অফিসে যাবে ?'

'নাও যেতে পারি।'

'বাঃ, তাহলে তো ওয়েল অ্যাণ্ড গুড। দুপুরে তুমিও আমাদের ওখানে খাবে। আজ একটু স্পেস্যাল আয়োজন হচ্ছে। সোমা এসেছে তো।'

সোমা এমন একটা ভাব করে দাঁড়িয়ে আছে, আর এত মনোযোগ দিয়ে চারপাশ দেখছে, যেন এই বাড়িটা একটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। কালু কিন্তু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সেই থেকে।

আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, বলা হল না। আমার এষা, আমার জুলি এসে দাঁড়িয়েছে সবার পেছনে। সেই পোশাক। এখনও পাল্টাবার সুযোগ পায়নি। তাকাতেই বললে, 'ডান।'

এরা ফিরে তাকাল।

আমি হাত নাড়লুম।

জুলি বললে, 'শার্প অ্যাট থ্রি ফিফটিন। সব ঠিক আছে তো !'

'ইয়েস। এভরি থিং অলরাইট।'

জুলি হাত নেড়ে চলে গেল। সোমা অবাক হয়ে গেছে। একেবারে অবাক। এমন একটা স্মার্ট মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ থাকতে পারে, ভাবতেও পারেনি।

নীলুদা ফিসফিস করে বললেন, 'কে শ্রীকান্ত ?'

'সামনের বাড়ি।'

'বাঙালী !'

'বাঙলা জানে। বাঙালী নয়।'

'তাই মনে হল। অ্যাংলো ?'

খুব ঘৃণার ভাবে 'অ্যাংলো' বললেন।

'না অ্যাংলো নয়, স্প্যানিশ।'

আমিই বা ছাড়ি কেন ? বাড়িয়েই বললুম।

'স্প্যানিশ !'

নীলুদা রাস্তার দিকে ফিরে তাকালেন।

'থ্রি ফিফটিন। তিনটে পনের ? তোমরা যাবে কোথাও ?'

'হ্যাঁ।'

'সিনেমায় ?'

কথা না বলে আমি হাসলুম। যার অনেক মানে হয়।

'তুমি তাহলে আসতে পারছ না দুপুরে ?'

'না মনে হয়।'

'কমল!'

'আজ থাক নীলুদা। পরে আর একদিন হবে।'

সোমা চাপা গলায় বললে, 'চলো দাদা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার তো আবার চোখের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দু'জনে গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। কালু আমার পাশে সরে এসে খুব চাপা গলায় বললে, 'ডাক্তারবাবু কি বললেন, আমাকে জানাবেন তো!'

কালু চলে যাচ্ছে। বাড়িতে-কাচা পরিষ্কার শস্তা দামের শাড়ি পরে আছে। আমি হতবাক্। সম্পূর্ণ হতবাক্। মেয়েটার এত বুদ্ধি! অনুমান করে নেবার এত ক্ষমতা! অসাধারণ আইকিউ। মনে মনে আমি নমস্কার করলুম। সাধারণেই যত অসাধারণ। ছাইগাদায় হীরে।

ওপরে উঠে বুঝলুম, কমল কেন নেমে আসেনি। ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম। মুখে একটা নীলচে আভা। ভেতরে বেশ বড় রকমের কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে! আমার রকমসকম দেখে গোপা টেনে নিতে চাইছে ন্যা তো! এসব হিন্দু সংস্কার। মা-মরা ছেলেদের বেশ কিছুকাল সামলে সামলে রাখতে হয়। মাদুলি-টাদুলি পরাতে হয়। মা তখন ছেলের সবচেয়ে বড় শত্রু। ভাবলেই খারাপ লাগে। আমি আবার এসব মানি না।

আমি কি কিছু পাপ করে ফেললুম। শুনেছি, ছেলে যতদিন না সাবালক হচ্ছে ততদিন পিতার পাপ পুত্রকে স্পর্শ করে। কি করব। আমিও তো মানুষ! আমি কোন্ দিক সামলাব! নিজেকে মেরে ফেলা কি অত সোজা। একদিকে কাল রাতের অভিজ্ঞতা, আর একদিকে ঈশ্বর, কেউ যদি বলেন, তুমি কোনটা চাও? আমি পাগলের মতো প্রথমটাকে জড়িয়ে ধরব। ওই আমার ঈশ্বর!

॥ সাত ॥

'কি হল, আপনার মামা আজও এলেন না?'

জুলি গিয়ার চেঞ্জ করতে করতে বললে, 'মামা এক আমেরিকান পাগলির পাল্লায় পড়েছে। মহিলা এসেছেন এ-দেশের প্রাচীন কাঁথা কিনতে। এখন সারা পশ্চিমবাংলা চষে বেড়াতে হবে। কদিন লাগবে কে জানে?'

আমি জুলির পাশে। কমল পেছনে। একা একা অভ্যাস হোক। কি হবে বলা তো যায় না। আমার মনে হচ্ছে একটা কিছু হবে। ওই অহঙ্কারী সোমা আর ততোধিক অহঙ্কারী সোমার মাকে আমি দেখাতে চাই পুরুষের জীবন সহজে ফুরোয় না। জুলি কি আমাকে ফেলে দেবে। মানুষ কি সাংঘাতিক প্রাণী! আমি

এখন মনেপ্রাণে চাইছি জুলি প্রেগন্যান্ট হোক। কেন হবে না! আমার তো সেই ভীষণ ক্ষমতা আছে। গোপা তো প্রথম মিলন-রজনীতেই মা হয়েছিল।

ছেলেকে স্পেস্যালিস্টের কাছে নিয়ে চলেছি। আমার তো এই সব এখন ভাবা উচিত নয়। আমার এখন সৎ, সাত্ত্বিক চিন্তা করা উচিত। জুলি এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে। সুন্দর একটা শাড়ি পড়েছে। স্লিভলেস ব্লাউজ। সমস্ত চুল একসঙ্গে করে গোড়ার দিকে ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে রেখেছে। চোখে বিলিতি গগল্স্। নাকের ডগা অল্প অল্প ঘেমেছে। কপালে নেমে এসেছে কয়েক গুছি চুল। এত সুন্দর দেখাচ্ছে। সে ভাগ্যবান যে জুলিকে জীবনে পাবে। প্রকৃত ভাগ্যবান। আমি এই একটা কারণে ভগবৎ বিশ্বাসী হতে পারি। সারা দিনরাত শয়তানের পা টিপতে রাজি আছি। মাঝরাতে যেতে পারি কোনও ডাইনীর কাছে।

কমল আপন মনে এতক্ষণ গান গাইছিল। হঠাৎ গান থামিয়ে উত্তেজিত গলায় বললে, 'বাবা, দ্যাখো দ্যাখো।'

উল্টো দিক থেকে সুন্দর একটি শবমিছিল আসছে। কোনও বড় মানুষ মারা গেছেন। কাঁচের শবাধারে শুধু ফুল আর ফুল। সামনে পেছনে মৌন মিছিল। কমল আসনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মিছিল দেখছে। আমি কমলের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। মৃত্যুর সে কি বোঝে! মৃত্যু বোঝার বয়েস তো তার হয়নি। নিচের ঠোঁট ঝুলে গেছে। চোখ দুটো চকচক করছে উত্তেজনায়। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। বিড়বিড় করে কি বলছে। মিছিল চলে গেল। নীরবে। গম্ভীর একটা বাতাসের মতো। কমলের এই ভাবটা আমার তেমন পছন্দ হল না। মন বড় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। ঘটনার আগে মন ছুটছে। পায়ের আগে দেহ ছোটার মতো।

আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখার এই সুবিধে। খুব একটা অপেক্ষা করতে হল না। ডক্টর মুখার্জিকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে। গম্ভীর মানুষ। প্রয়োজনের বেশি একটিও কথা বলেন না। কমলকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মুখ দেখে মনে হল কমলের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন। প্রয়োজনে একটা দুটো প্রশ্ন করছেন। কমল শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছে।

বহুক্ষণ দেখার পর বিশাল বড় একটা প্রেসক্রিপসন লিখলেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আমাদের দিকে। আমি আর জুলি বসে আছি পাশাপাশি। প্রেসক্রিপশানটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে একটা শব্দ করলেন, হুঁ।

এষা বললেন, 'এনিথিং সিরিয়াস?'

'মে বি।'

আমি বললুম, 'তার মানে ?'

'যা যা টেস্ট করাতে হবে' সব লিখে দিয়েছি। সেগুলো আগে করিয়ে আসুন, তারপর বলবো কি হয়েছে। ইন দি মিন টাইম দু-একটা প্যালিয়েটিভ ওষুধ চলুক। ব্লান্ড ডায়াট। অ্যান্ড কমপ্লিট রেস্ট।'

এষা বললে, 'কি সন্দেহ করছেন ?'

ডাক্তারবাবু হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'নাথিং। কিচ্ছু না। এইটুকু ছেলের আবার কি হবে।' কমলের মাথায় হাত রাখলেন। চুলগুলো খামচাতে খামচাতে বললেন, 'তোমার নাম বুড়ো। আমার নামও বুড়ো। অথচ আমরা কেউই বুড়ো নই। বাবাদের কান্ড দেখেছ ? নাম রাখার সময় বয়েস মনে থাকে না। তুমি কি ভালবাস, বুড়ো ?'

'ছবি আঁকতে।'

'বাঃ ভেরি গুড। এরপর যেদিন আসবে, আমার জন্যে তিনটে ভালো ছবি এঁকে আনবে। এই নাও তোমাকে একটা সুন্দর বাঘের ছবি দিলুম।'

টেবিল থেকে ওষুধ কোম্পানির একটা সুন্দর কার্ড তুলে কমলের হাতে দিলেন। পিঠ চাপড়ালেন। গাল ধরে আদর করলেন। আমরা উঠে পড়লুম। ডাক্তারবাবু এষাকে বললেন, 'রাতের দিকে একবার ফোন করবেন।'

ফেরার পথে কমলের অসুখের প্রসঙ্গ আমরা আর তুললাম না। পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় দোকান থেকে আমরা প্যাস্ট্রি কিনলুম। কমলের জন্যে কয়েকটা জেমস কেনা হল। প্রথম রাতেই আমরা ফিরে এলুম। এষাদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বারান্দায় এক বিদেশিনী বসে আছেন আপনমনে।

হঠাৎ বলে ফেললুম, 'অ্যায় রে !'

এষা বলল, 'কি হয়েছে !'

'মামা এসে গেছেন।'

'সো হোয়াট ! আমি একটা নোট রেখে এসেছি। হি ইজ এ নাইস ম্যান।'

নিজের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এষা বললে, 'আমি ঠিক সময়ে ফোন করব। আপনাকে জানিয়ে যাব।' সুর করে ডাকল, 'বুড়ো।'

বুড়ো হাত নাড়ল। বুড়োকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই একদিনেই ওর শরীরটা কি রকম ভেঙে গেল।

ওপরে এসে বুড়ো আর আমি দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইলুম পাশাপাশি। বুড়োর বুকের বাঁ পাশে আমার হাতটা পড়ে আছে আলগা। ছোট্ট এতটুক বুক। বড় বেশি ধুকধুক করছে। সন্দেহ হচ্ছে হার্টের অসুখ হল না তো ! এইসব হচ্ছে আজকাল, বয়েসটয়েস মানছে না।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা, মানুষ মরে কোথায় যায়, বাবা ?'

'খুব শক্ত প্রশ্ন বাবা। এর উত্তর মানুষ জানে না।'

'ভূত হয় কি ?'

'যাঃ ভূত আবার কি ? ভূত বলে কিছু নেই, সব মনের ভুল।'

'জানো বাবা কাল না মা আমার পাশে, অনেকক্ষণ আমার পাশে এসে বসেছিল।'

'যাঃ, সে মা হবে কেন ? ও বাড়ির মাসি এসে তোর পাশে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছিল।'

'না গো, তোমরা তো তখন ও ঘরে কি করছিলে দুজনে। ভয়ে না আমার গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছিল না। আমি কেবল ডাকছি, বাবা বাবা, আর মা না একটা আঙুল তুলে নিজের ঠোঁটে রেখে বলছে চুপ চুপ। মাকে এত ভয় করল কেন বাবা ?'

কমলের কথা শুনে ভেতরটা আমার হিম হয়ে গেল। ভূত আমি আর বিশ্বাস করি না এখন। আগে করতুম। গোপা হাসত। মাঝে মাঝে ভয় দেখাত নানা রকম। এখন অনেক অনেক সাহসী। কমল কি বলছে ? সর্বনাশ ! ও তাহলে জেগে ছিল। না আধজাগরণ। কি বোঝাব ওকে ? কি উত্তর দোব !

'তুমি বিশ্বাস করছ না বাবা ?'

'হ্যাঁ বাবা, তোমার কথা অবিশ্বাস করি কি করে ? তুমি যখন দেখেছ, তখন নিশ্চয় তিনি এসেছিলেন।'

'কেন এসেছিলেন বাবা ?'

'মায়েরা যে ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।'

প্রসঙ্গটা যেভাবেই হোক পাল্টাতে হবে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোলেই বিপদ।

'এখন তুমি কেমন আছো বুড়ো ? শরীর ঠিক আছে তো।'

'হ্যা বাবা। বাবা !'

'বলো ?'

'আমরা আর কোনও দিন মামার বাড়ি যাবো না ?'

'মাঝে মাঝে যাবো। ধরো রবিবার রবিবার।'

'আমি তাহলে কার কাছে থাকবো ? রোজ তুমি আমাকে তোমার অফিসে নিয়ে যাবে ?'

'না, না তা কেন ? সে একটা ব্যবস্থা হবে।'

'তুমি কালু পিসিকে বলো না। এখানে এসে বেশ থাকবে। বলো না বাবা।'

'তোমার দিদা কেন ছাড়বে বলো ?'

'দিদা তো কালু পিসিকে সব সময় ভীষণ বকে। সেদিন কালু পিসি একা একা ভীষণ কাঁদছিল।'

'তোর দিদা কেন এমন হয়ে গেল রে, বুড়ো ?'

'দিদা তো রাতে ঘুমোতে পারে না। ওই যে পুজোর আসন আছে না। ওই আসনে বসে সারারাত দোলে। জানো বাবা, দিদাও কাঁদে। সবাই কাঁদে, আমি কেবল কাঁদি না।'

সিঁড়ির কাছে কলিংবেল সুর করে বেজে উঠল। কে আসতে পারে ? আমার তো তেমন কোনও বন্ধু নেই। আমি এত কুঁচো লেখক, বড় লেখকরা আমাকে পাত্তাই দেন না। তাছাড়া লেখকদের একটা নাইট লাইফ থাকে। সুন্দরী ভক্ত পাঠিকার দল। ফ্যান আর কি ! সিনেমার প্রডিউসার, ডিরেক্টর, সভা সমিতি। গল্প-কবিতা পাঠ। শ্রুতিনাটক। জমজমাট সন্ধ্যা। রোম্যান্টিক রাত। আসলে জীবনধর্মী লেখার জন্যে এসবের ভীষণ প্রয়োজন। দুহাতে লিখতে পারলে ভালই রোজগার। সকলেই গাড়ি করেছেন।

আবার বেল।

নিচে নেমে দরজা খুলেই চমকে গেলুম। পর পর তিনজন। কমলের দিদা, সোমা, কালু।

স্বতঃস্ফূর্ত একটা, আসুন আসুন মুখে খেলে গেল। তিনজনে ভেতরে এলেন। দরজায় ছিটকানি লাগালুম।

কমলের দিদা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বললেন, 'তুমি তো আর আসতে বললে না। আমি নিজেই চলে এলুম। কি হবে এত বড় বাড়ি ? নিচেটায় কি হচ্ছে ?'

'বন্ধ পড়ে আছে। অনেক কাজ বাকি আছে। ওপরটা আগে শেষ করে চলে এসেছি।'

'নিচেটা কবে ধরবে ?'

'আবার টাকাপয়সা জোগাড় করি।'

ওপরে এসে কমলের দিদা হাঁপাতে লাগলেন। হাল্কা একটা চেয়ার এগিয়ে দিলুম।

'আগে একটু বসে নিন।'

প্রবীণা বসলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন চারপাশ।

'বেশ ভালই করেছ বাড়িটা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব স্বাভাবিক, মেয়ের কথা মনে পড়ছে। কালু

আর সোমা ঘরে গেছে। কমলের সঙ্গে কথা হচ্ছে। শুনছি, সোমা জিজ্ঞেস করছে, 'কি সিনেমা দেখলে ?'

কমলও সোমাকে তেমন পছন্দ করে না।

কমল বলছে, 'বাবা জানে।'

'কি বই দেখলে যে বলতেই পারছ না !'

'সিনেমায় তো যাইনি।'

'তোমাকে নিয়ে যায়নি বুঝি ?'

'হ্যাঁ আমাকেই তো নিয়ে গেল। হলুদ মাসির গাড়িতে চেপে গেলুম।'

'হলুদ মাসি !'

কমলের দিদা ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়লেন। বয়সে চেহারা বেশ থলথলে হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে বায়স্কোপ ?'

'না তো।'

'তবে সোমা যে বললে।'

মহিলা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কি রে তুই যে বললি, শ্রীকান্ত সিনেমা যাবে বলে দুপুরে আসতে পারবে না। না-জেনেশুনে কি যা তা বলিস ! এটা আবার সাতসন্ধেতেই বিছানা নিয়েছে কেন ? পড়াশোনা নেই।'

ধমক-ধামক দিতে দিতে সোফায় বসলেন।

'অত আদর ভালো নয়। জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

সোমা একটা মৃদু ধমক দিল, 'মা চুপ করো। বুড়োর খুব অসুখ করেছে। এইমাত্র বড় ডাক্তার দেখিয়ে এসেছে। দুতিন বার রক্ত বমি করেছে কাল।'

'অ্যাঁ, তাই না কি। তা তোরা তো সকালে সেসব কথা কিছু বললি না। আশ্চর্য !'

'সকালে সুকুদা আমাদের কিছুই বলেননি।'

'তোরা জিজ্ঞেস করেছিলিস ?'

'না।'

'তবে ওকি তোমাদের গলা জড়িয়ে ধরে সেধে সেধে বলবে। তোমরা কাল দেখলে ছেলেটা শরীর খারাপ নিয়ে বাড়ি গেল। প্রথমেই তোমাদের উচিত ছিল জিজ্ঞেস করা। মা এই হোল সেকাল আর তোমাদের কালে তফাৎ। তোমাদের কেবল স্বার্থ, তোমাদের কেবল অভিমান, কথায় কথায় ফোঁস, আর সারাদিন রাত এক বুলি ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না।

'প্রভু, দয়াময়! অনেক হল। এবার তুলে নাও প্রভু। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরি।'

ঘরে একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কিছুক্ষণ।

সোমা বলল, 'কাকে দেখালেন?'

'বড় একজন স্পেসালিস্ট, এম ডি।'

'কি বললেন?'

'প্রচুর টেস্ট করাতে বললেন। যতরকম আছে।'

'কবে করাবেন! সব করাতে তো বেশ সময় নেবে।'

'তা নেবে।'

'আমি একটু চা চাপাই। বিকেলবেলা চা খাওয়া হয়নি। মাথা ধরে গেছে।'

'আমাকে সব দেখিয়ে দিন, করে আনছি।' কালু উঠে এল।

রান্নাঘরে আমার সব গোছানোই আছে। কালু আজ একটা ডুরে শাড়ি পরেছে। মনে হয় সোমা দিয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে।

রান্নাঘর দেখে, কালু বললে, 'বাবা, মেয়েছেলেকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন মেজদা।'

'ব্যাটাছেলেরা একটু গোছানেই হয়। বউমরা স্বামীরা ওরই মধ্যে একটু বেশি হয়।'

এই সব আবোলতাবোল বকতে বকতে আমি চায়ের কৌটো, চিনির কৌটো দুধের টিন বের করছি। কালু হঠাৎ দরজার পাশ থেকে নিচু হয়ে কি একটা তুলে নিল।

'মেজদা এটা কি গো?'

হালকা গোলাপী রঙের পাতলা ফিনফিনে জাঙ্গিয়ার মতো কি একটা জিনিস।

'কই দেখি?'

সর্বনাশ! এ তো প্যান্টি। আধুনিকাদের একান্ত অন্তর্বাস। কাল কত স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে গেছে জুলি! ধরা দেওয়াটাকে এইভাবেই ধরাপড়িয়ে দিতে হয়।

'দাও। এটা মনে হয় কমলের পরার কিছু।'

'মেজদা!'

কালুর মুখে সেই দুষ্টু হাসি। চোখ দুটো জ্বলছে। আমি হেসে ফেলেছি।

'ভাগ্যিস দেখে ফেললুম। এখুনি তো ওরা এই ঘর দেখতে আসবে।'

'কালু।'

দুহাত দিয়ে কালুকে জড়িয়ে ধরে, আমি তার কাঁধে মাথা রাখলুম।

'কালু, আমি ফেঁসে গেছি।'

'একি হচ্ছে মেজদা। কেউ দেখে ফেললে, আমরা দুজনেই মরবো।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি কালু। ভীষণ, ভীষণ।'

'মেজদা ছাড়ুন।'

কনুইয়ের ঝটকা মেরে আমাকে সরিয়ে দিল। মাথার চুল ঘেঁটে গেছে। ভীষণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে শরীরে। যে ব্যাগে নাইটিটা ভরে রেখেছিলুম সেই ব্যাগেই প্যান্টিটা চালান করে দিলুম। খোপে ঢোকাতে ঢোকাতে মনে পড়ে গেল সেই গল্প 'স্কেলিটান ইন এ কাবার্ড'।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুনতে পেলুম, সোমার গলা, 'কই দেখি রান্নাঘরটা কেমন হল?'

পায়ের শব্দ। সোমা আসছে এদিকে।

ওদিকে সোমার মা উঁচু গলায় বলছেন, 'বাঃ, বেশ মজা, একে একে সবাই পালাল। কি রে বাবা! চা করতে কজন লাগে?'

সোমা বললে, 'মা কি বলতে এসেছেন, শুনুন গিয়ে, আমরা চা নিয়ে আসছি।'

আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলুম দুজনে। গোপন কথা আছে অনেক। সামনের বাড়িতে আলোর ফোয়ারা ছুটছে। উৎসব-রজনী যেন।

সোমার মা ফিস ফিস করে বললেন, 'তুমি কিছু শুনেছ?'

'কি বলুন তো! কি শোনার কথা বলছেন?'

'নীলুর কাণ্ড।'

'নীলুর কি কাণ্ড?'

'আরে নীলু তো এই বুড়ো বয়সে এক কেলেঙ্কারি করে বসে আছে।'

'কি রকম?'

'চোখে ভালো দেখে না। ব্লাড প্রেসার। হাই সুগার।'

'যারা লেখাপড়া নিয়ে থাকে তাদের অমন হয়। একটু সাবধানে থাকতে হবে। এই আর কি।'

'সে আমি জানি। ও কথা আমি বলছি না।'

'তা হলে?'

'মা হয়ে আমি কি করে বলি।'

'তা হলে। তা হলে কি হবে?'

'বলেই ফেলি। নীলু তো আর একজনকে মা করে বসে আছে।'

'তা করুক না। তাতে আসল মা কি আর ভেসে যাবে। অমন পাতানো মা একজন কেন একশোজন থাকুক না।'

'তোমার মাথায় কি আছে বাবা ! গোপার কথাই ঠিক । গোপা বলতো না, তোমার জামাইয়ের বয়েসটাই বেড়েছে । মনটা একেবারে শিশুর মতো । জগতের ব্যাপার কিছুই বোঝে না । নীলু বাবা হচ্ছে ।'

'অ্যাঁ, সে আবার কি ! নীলুদার তো বিয়েই হয়নি ।'

'আরে বলছি কি তোমাকে । কে এক নুলো না ফুলো, কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করে, তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল । সেই ভাব গড়াতে গড়াতে এমন বোকা ছেলে, এখন ফাঁদে পড়ে গেছে ।'

'ও ভালবাসা । আহা ওর চেয়ে পবিত্র পৃথিবীতে আর কি আছে । ভালবাসা ঈশ্বরের দান ।'

'তোমার মাথা ।'

'তা নীলুদা এবার বিয়ে করে ফেলুন ।'

'বাঃ ! আগে ছেলে তারপর বিয়ে । এ তোমার কোন দেশি নিয়ম । আমরা তো শুনে এসেছি আগে বিয়ে পরে ছেলে ।'

'যে কালের যা নিয়ম । ওতে কিছু যায় আসে না ।'

'অ্যা বলো কি ! এক পেট ছেলে নিয়ে মেয়ে বসবে বিয়ের পিঁড়িতে । ধর্মটর্ম সব লোপাট হয়ে গেল দেশ থেকে ?'

'বিলেতে বিয়ে উঠে গেছে মা । একসঙ্গে থাকে । ছেলেপুলে হয় । ছাড়াছাড়ি হয় । আবার কারুর সঙ্গে থাকে । আবার ছেলেপুলে হয় । আবার ছাড়াছাড়ি । আবার থাকাথাকি ।'

'থামো ।'

বৃদ্ধা এক ধমক লাগালেন ।

'এটা বিলেত নয় । মেয়েটা ব্রাহ্মণ নয় ।'

'কিন্তু শিক্ষিতা । বড় চাকরে ।'

'তাইতেই সাতখুন মাপ !'

'এখন এটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কি সমাধান আছে ?'

বৃদ্ধা থামলেন । মুখে বয়সের বলিরেখা । দুঃখী দুঃখী চোখ । পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবেই । বাবা, নীলুদার তো বেশ ক্ষমতা আছে । বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখালেন ।

সোমা আর কালু চা নিয়ে এলো । সাবুর পাঁপড় ভেজেছে । ভালই করেছে । পেট একদম খালি ।

বৃদ্ধা বললেন, 'চা ছাড়া আমি কিছু খাবো না । তোমরা দুজনে ওদিকে যাও । আমরা কথা বলছি ।'

সোমা একটু ঝাঁঝের গলায় বললে, 'তোমরা যত খুশি কথা বলো না । কে তোমাদের কথা শুনছে ! আমরা এখন ছাদে যাচ্ছি ।'

'যা তাই যা । আমাদের একটু একা থাকতে দে ।'

'তাই থাকো ।'

সোমা আর কালু চলে গেল । আমি বললুম, 'কেন বিচলিত হচ্ছেন । নিন পাঁপড় খান ।'

বৃদ্ধা একটা পাঁপড় তুলে মুখে দিলেন । চিবোতে চিবোতে বললেন, 'তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা ।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ তুমি ।'

'বলুন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে ?'

'এক নম্বর কাজ হল, একজন ভালো খদ্দের দেখে, তুমি আমাদের ওই বাড়িটা বেচে দাও ।'

'বাড়ি বেচে দেবেন ? অমন সুন্দর বাড়িটা ? থাকবেন কোথায় ?'

'সে ভাবনা তোমার নয় । তোমাকে যা বলছি তা পারবে কি না ? হ্যাঁ কি না ? ও বাড়িতে আমি পাপ ঢুকতে দেব না । কোনও দিন না । আমি মরে যাবার পরেও না । বাড়ি আমার নামে । কারুর কিছু বলার এক্তিয়ার নেই ।'

'বেশ । এবার দ্বিতীয় কাজ ?'

'দ্বিতীয় কাজ, তোমার হাতে আমি সোমাকে দিয়ে যেতে চাই ।'

'আমার হাতে !'

'হ্যাঁ তোমার হাতে । তোমার তো আবার মাথা মোটা । ভেঙে না বললে বুঝতে পারো না । তোমার হাতে নাড়ুর মতো তুলে দেওয়া নয় । তুমি সোমাকে বিয়ে করবে হিন্দুমতে এই অঘ্রাণে ।'

'সত্যিই আপনার মাথাটা কেমন হয়ে গেছে ।'

'মাথাটা কেমন হয়ে গেছে, তাই না ? না তোমার মাথাটা খেয়ে বসে আছে ?'

'আমার মাথা আবার কে খাবে ?'

'আমি সব খবর পাই শ্রীকান্ত । তোমাকে এক আধুনিকা পেতনীতে ধরেছে ।'

'ভুল শুনেছেন ।'

'সোমারা সকালে দেখে গেছে ।'

'যাকে দেখেছে, তার আমি নখের যুগ্যি নই । এমন কি সোমারও নই । তা ছাড়া সোমা বিয়ে করবে না । আর এখন যদি মত হয়েও থাকে দোজপক্ষে করবে কেন ? দেশে ভাল ছেলের অভাব আছে ?'

'দ্যাখো চালাকি কোরো না। আমার বয়েস হয়েছে। নীলুর জন্যে আমি যখন পাত্রী দেখেছিলুম, তখন আমাকে বলেছিল, মা, আমি সন্ন্যাসীর আদর্শে জীবন কাটাব। হিমালয় আমার শেষ আশ্রয়। সেই নীলু এখন কোন হিমালয়ের কোলে বাবা! ওসব ভণ্ডামি আমি অনেক দেখেছি।'

'আমি আর বিয়ে করব না। আমি গোপার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকব। জোর করে তো কিছু হয় না।'

'দ্যাখো কাল আমি এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি ফাঁকা একটা মাঠ দিয়ে কমল হেঁটে যাচ্ছে। সারা গায়ে ধুলো। ছেঁড়া প্যান্ট ঝুলঝুল ঝুলছে। মাঠের পাশে দোতলা একটা বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। পাশে এলো চুল একটা মেয়ে। তুমি বলছ, খেটে খা, খেটে খা, ভিক্ষেটিক্ষে হবে না। আর মেয়েটা তোমার গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে খিলখিল হাসছে।'

'কমলকে আপনি ভালবাসেন?'

'কেন? এ প্রশ্ন কেন? তোমার কি মনে হয় কমলকে আমি ভালবাসি না?'

'ভালই যদি বাসেন, তাহলে কমল কাল যখন অসুস্থ হল, তখন একজন ডাক্তার ডাকলেন না কেন? দুপা দূরেই তো চেম্বার এবং বাড়ি।'

'কে জানবে বাবা, যে তোমার ছেলে রাতে রক্তবমি করবে। আমরা ভাবলুম, বাচ্চা ছেলে সারাদিন টুকটাক খাচ্ছে, বদহজম হয়েছে। তা হ্যাঁ গো, ডাক্তার কি বললে বলো তো।'

'এখনও কিছুই বলেননি। এক গাদা পরীক্ষা হবে, তারপর বোঝা যাবে কি হয়েছে।'

'বুঝলে শ্রীকান্ত, ওই গোপার স্মৃতি নিয়ে কবিতা লিখলে ছেলেটা মার খাবে। ওর মুখ চেয়ে তোমার বিয়ে করা উচিত। তোমার হয়তো আর বউ দরকার নেই, কিন্তু ওর জন্যে একজন মা চাই।'

'আপনার কি মনে হয় সোমা কমলকে দেখবে?'

'কেন দেখবে না বাবা! ওর শরীরেও তো গোপারই রক্ত।'

'ওর মেজাজ দেখেছেন? গোপার ঠিক বিপরীত।'

'গোপা তো ওর মতো শিক্ষিতা ছিল না।'

'শিক্ষিতা হলেই অহঙ্কারী, দুর্বিনীত হতে হবে! সোমা কোনও দিনই ভালো মা হতে পারবে না।'

'তুমি নারী চরিত্রের কিছুই বোঝো না বাবা। ঠিক বয়সে বিয়ে না হলে মেয়েরা একটু তিরিক্ষি মত হয়ে যায়। কি ছেলে কি মেয়ে, শরীরের একটা ধর্ম আছে তো বাবা?'

আমার মাথায় মাঝে মাঝে ভূত চাপে। কি বলতে কি বলে ফেলি। দুম করে বলে বসলুম, 'কমলের মা হতে পারে এমন একজনই আছে।'

'কে। কে সে? সকালে ওরা যাকে দেখে গেছে?'

'না। সে হল কালু।'

বৃদ্ধার চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ভুরু কোঁচকালো। হাতের মুঠো দৃঢ় হল। ঠোঁট বেঁকে গেল।

'ছি ছি ছি, তোমার এই রুচি? তুমি শিক্ষিত ছেলে। লেখটেখ। তুমি ওই অজ্ঞাতকুলশীলাকে নিয়ে ঘর করবে! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। ওর কে বাপ, কে মা, ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কিছুই জানা নেই, মেলা থেকে কুড়িয়ে আনা, তাকে তুমি বিয়ে করবে?'

'আপত্তি কিসের? ও তো মানুষ।'

'আমি বেঁচে থাকতে হবে না।'

'ওর ওপর আপনার এত অধিকার! আপনি আটকাতে পারবেন?'

'আটকাতে না পারি, মরতে তো পারি।'

'নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ!'

'ধরো তাই। আমি তোমাকে বিপথে যেতে দোব না।'

'এটা বিপথ? আর পথ হল আপনার মেয়েকে বিয়ে করা?'

বৃদ্ধা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তুমি সোমাকে বিয়ে কোরো না। তোমাকে করতে হবে না। তাই বলে কালুর সঙ্গে নয়।'

'আপনার এতে কি স্বার্থ?'

'স্বার্থ? তুমি এত বড় কথা আমাকে বলতে পারলে শ্রীকান্ত। আমিও তো তোমার মা।'

'যদ্দিন গোপা ছিল। এখন আর সে সম্পর্ক নেই। আপনাদের মন এত নোঙরা, ওই সোমা আপনাকে সকালে গিয়ে লাগিয়েছে, আর আপনি সন্ধ্যেবেলাই ছুটে এসেছেন দেখতে, আমাকে কোন পেত্নী ধরেছে। এর আগে আমার ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে, আপনি অথবা নীলুদা একদিনও আসেননি। এমন কি গোপার যখন সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি তখন আপনি সোমাকে নিয়ে মীরার বঁধুয়া দেখতে গেছেন। তবু মেয়ের মাথার কাছে বসে আপনারা কেউ রাত জাগেননি। আপনি ধার্মিক, কেমন? অথচ মানুষকে মানুষ ভাবতে শেখেননি। কে ব্রাহ্মণ, কে কায়স্থ, কে শূদ্র, কে অজ্ঞাতকুলশীল, এই সব বিচার।'

রণরঙ্গিনী মূর্তিতে সোমা এল।

'মা উঠে এসো। তখনই তোমাকে বারণ করেছিলুম, এসো না। শোননি, যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা। উঠে এসো।'

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সোমার মা কাঁদছেন। ঠিক হয়েছে। প্রয়োজন ছিল। ঠাকুরঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালা জপ করলেই উদার হওয়া যায় না। যে সাধনায় মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা ঘোচে না, সে সাধনা এক ধরনের বিলাসিতা, কর্তব্যবিমুখতা।

সোমা হঠাৎ বললে, 'আপনি ছোটলোক, চরিত্রহীন।'

আমার রাগ হল না। বরং মজা লাগল। এইভাবে গালে টুসকি মেরে দেখতে হয়, রক্ত আছে না অ্যানিমিক। এই ভাবে খোঁচা মেরে চিনতে হয় মানুষের স্বরূপ।

শান্ত গলায় বললুম, 'সোমা, সবাই তো আর ভদ্রলোক হয় না, কিন্তু চরিত্রহীন বুঝলে কি ভাবে?'

'সেইদিন থেকে আপনি আমাকে দেখতে পারেন না।'

'কোনদিন সোমা?'

'দিদির বিয়ের পর, আমরা তিনজন নেপাল গিয়েছিলুম, সেখানে আপনি আমাকে বলেছিলেন, যদ্দিন না বিয়ে হয় তদ্দিন শালীরা জামাইবাবুর সম্পত্তি। আপনি আমার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন। আপনার সেই গায়েপড়া ছোটলোকমির কথা মনে পড়লে আমার সারা শরীর রিরি করে।'

'তোমার মা যে আমাকে বলছেন, এই অঘ্রাণেই তোমাকে বিয়ে করতে।'

'মায়ের ভীমরতি হয়েছে। আপনাকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। দেশে ভাল ছেলের অভাব আছে? মা চলো। এই শেষ। আপনি ও বাড়িতে না গেলেই সুখী হব। কালু চলো।'

'দাঁড়াও।'

বেশ লাগছে আমার। জীবনে নাটক না থাকলে ভাল লাগে?

'দাঁড়াও। তোমরা যাবে যাও। কালু যাবে না।'

সোমা বললে, 'কেন?'

'কেন? কালুকে তোমরা কালই দূর করে দেবে। তোমাদের আমি চিনি। নীলুদা ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ মহিলার সঙ্গে জীবন জড়িয়েছেন, তোমার মায়ের সহ্য হল না। তিনি ছুটে এসেছেন ছেলেকে জব্দ করার পথ খুঁজতে। তোমরা সব পার।'

'আপনি পাগল হতে পারেন। কালু পাগলি নয়।'

আমার মাথায় ভূত চেপেছে। সোমার ওই শরীরী শরীর, বেনারসের

আবহাওয়ায় পুষ্ট কামুক মুখ, অসহ্য লাগছে। মেয়েদের আমি যতটুকু নাড়াচাড়া করেছি, সেই সামান্য জ্ঞান থেকে বলতে পারি, সোমা চরিত্র হারিয়েছে। পুরুষ-সঙ্গ একাধিক বার হয়েছে। এবং জন্মনিরোধক পিল নিয়মিত ব্যবহার করে। তা না হলে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে এত মেদ জমতে পারে না। ওর শরীর থেকে যে তরঙ্গ বেরোচ্ছে তাতে যে কোনও মানুষেরই মনে জৈব ইচ্ছা জাগবে।

আমি কালুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি, তুমি সব জেনেশুনেও যাবে?'

কালুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। শুধু ভুরুর কাছে কপাল কুঁচকে আছে। ত্রিবলির মতো। এই একটা লক্ষণেই বোঝা যায় কালু কত সরল, কত নিষ্পাপ, কত অসহায়!

কালু বললে, 'মেজদা, কি হচ্ছে এসব!'

'মেজদা-টেজদা নয়। আমি যা ঠিক করি তা করি। তুমি থাকবে না তুমি যাবে?'

কালু হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি বড় অসহায় মেজদা। আমার কেউ কোথাও নেই। কেন আমাকে নিয়ে এইসব করছেন?'

'থামো। তুমি সুস্থ, সুন্দর একটা সংসার চাও, না সারা জীবন ঝিগিরি করতে চাও?'

হুহু কান্নায় অবরুদ্ধ গলা। কালু বললে, 'মেজদা, আমি জানি না। সত্যি আমি জানি না। আপনারা যা বলবেন।'

'আপনারা নয়। আমি যা বলব। আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম।'

সোমা তার মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললে, 'উন্মাদ।'

কমল ডাকলে, 'দিদা?'

বৃদ্ধা বললেন, 'বাবা।'

সোমা জোর গলায় বললে, 'আবার দাঁড়াচ্ছ? চলে এসো।'

কমলের কথা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম। আপাদমস্তক চাদর চাপা দিয়ে সে বিছানায় পড়েছিল। ওর সামনেই সব ঘটে গেল। কুৎসিত সব ব্যাপার। ঘটুক। বালককে তো এতদিন যুবক হতেই হবে। সংসারের নরম আঁচে ধিকিধিকি ঝলসাবে জীবন। এখন থেকেই অল্প অল্প করে পুড়ুক। কি করব আমি? কেমন করে একা আমার চেষ্টায় শিশুর আদর্শ একটা জগৎ তৈরি করব। আজ পর্যন্ত কেউ কি পেরেছে।

সোমা আবার ফিরে এসেছে। ঘরে আর ঢুকলো না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

বললে, 'কালু তুমি যাবে ? এখনও ভেবে দেখ ভাল করে। এরপর গেলে কিন্তু আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। তোমাকে মা এনেছিলেন। ছোট থেকে বড় করেছিলেন। আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে। তোমারও ভাবার আছে। কি যাবে ?'

কালু আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে চোরের মতো। সোমা জোড়ালো গলায় বললে, 'কি যাবে তুমি !'

সোমার মা সিঁড়ির বাঁক থেকে বললেন, 'ছেড়ে দে সোমা। ও আসবে না। পেটের ছেলেই অকৃতজ্ঞ, ওতো পরের মেয়ে। এত বড় লোভ সহজে ছাড়তে পারে ! মেথরানী থেকে রাজরানী।'

সোমা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'মা তুমি চুপ করো। সারা সন্ধ্যে অনেক বকেছো।'

কালুকে আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কি যাবে ? এখনও ভেবে দ্যাখো।'

কালু কলের পুতুলের মতো ধরা-ধরা গলায় বললে, 'হ্যাঁ, দিদি যাবো।'

এক পা, এক পা করে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললে, 'মেজদা, আমি যাই।'

বলছে আর কাঁদছে। দরজার কাছে গিয়ে আমার দিকে তাকাল। দুগাল বেয়ে জল পড়ছে, 'মেজদা আমি যাই।' নাটকের সব চরিত্র বেরিয়ে গেল। মঞ্চ শূন্য। দাঁড়িয়ে আছি আমি একা। অনেক অনেক আগে যৌবনে শোনা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গানের কলি, বর্ষার সন্ধ্যায়, মধুপুরের বাগান বাড়িতে গ্রামোফোন বাজছিল, আবছা ভেসে এল মনে, সবাই চলে গেছে, শুধু একটি মাধবী তুমি এখনও তো ঠিকই ফুটে আছ। ঘরের মাঝখানে আমি ঠিকই ফুটে আছি।

জীবনে এত জোরে, যাত্রার দলের নায়কের মতো কখনও হাসিনি। হা হ হাসি। হাহাকারের মতো। এই নাও আমাকে নাও। বিলিয়ে দিচ্ছি আমাকে নিঃশেষে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। কেউ নেবে না। নেবার মানুষ নেই। এই কৃপণের পৃথিবীতে দাতার সংখ্যা কম নয়, কিন্তু গ্রহীতা কোথায় ?

আমার হাহা হাসি শুনে বুড়ো উঠে বসেছে।

'বাবা, তুমি অমন করে হাসছ কেন বাবা, ডাকাতের মতো ?'

'কি সব হয়ে গেল দেখলি না ? কত মজা ?'

'তোমরা ঝগড়া করলে বাবা ?'

'হ্যাঁ রে, হয়ে গেল এক হাত। বুড়ো, এবার কি হবে ?'

'কি হবে বাবা, তোমার ভয় করছে কি ?'

'না রে ভয় নয়, আর যে মামার বাড়ি যেতে পারবি না।'

'কেন ঝগড়া করলে বাবা ? কাল সকালে ভাব করে নিও।'

'আর কোনও—কোনও দিনও ভাব হবে না।'

'জানো বাবা, স্কুলে আমরা ঝগড়া করি তো, আবার ভাব হয়ে যায়।'

'সে ছোটদের হয় বাবা। বড়দের হয় না। বড়রা খুব বাজে হয়। একেবারে যাচ্ছেতাই, থার্ডক্লাস।'

'তাহলে তুমি আমাকে বড় করছ কেন ?'

'সকলকেই যে বড় হতে হবে বাবা। বড় না হয়ে যে উপায় নেই।'

'তুমি আরও বড় হবে বাবা ?'

'আমি এবার বুড়ো হব।'

'তুমি এখন রাঁধবে ?'

'খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না রে বুড়ো !'

'একটু একটু।'

'আজ রাতে কি খাবি বল ?'

'তুমি যা করবে।'

'তোর পেট কেমন ?'

'ভালো গো।'

'শরীর ?'

'ভালো। কেবল মাথাটা টিপ টিপ করছে।'

'দাঁড়া, পাখাটা আর এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দি। তুই আরাম করে শুয়ে থাক। আমি সাংঘাতিক একটা কিছু রাঁধি। বুড়োরে, রোজ রোজ আর রাঁধতে পারি না। কি কষ্ট যে ওই রান্নার কাজ !'

ওরা চলে যাবার পর উত্তেজনায় নিচের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম। এযা উঠে এসেছে। বেশ ঘরোয়া সাজ।

'কি ব্যাপার, নিচের দরজা হাট-খোলা। আপনি কি রাজা চন্দ্রগুপ্তের আমলে বাস করছেন ? এত বিশ্বাস ?'

'ওই যে কমলের মামার বাড়ির সব এসেছিল। গেছে আর খেয়াল নেই।'

'শুনুন, ডাক্তারবাবুকে এই মাত্র ফোন করেছিলুম।'

'কি বললেন ?'

'বললেন দুটো সন্দেহ। এক, দেখতে হবে, ব্লাড ক্যানসার কিনা ?'

'ব্লাড ক্যানসার ?'

'আঃ, আস্তে। কমল যেন শুনতে না পায়।'

'ও ঘরে শুয়ে আছে। মনে হয় ঘুমিয়েও পড়েছে।'
'দ্বিতীয় সন্দেহ, মাথায় কোনও সময় আঘাত লেগেছিল কি না?'
'মাথায় চোট? কি জানি?'
'মাথাটা নাকি ওর ভার হয়ে থাকে। টিপ টিপ করে। গা গুলোয়।'
'কে বলেছে?'
'কমল না কি ডাক্তারবাবুকে বলেছে।'
'তাহলে?'
'বলছেন একটা অ্যানজিওগ্রাম করাতে।'
'সে আবার কি? স্পেসালিস্টরা তিলকে তাল করেন।'
'ডাক্তারবাবু ভেবেছেন আমি কমলের মা।'
'তারপর?'
'সর্বক্ষণ, আপনার ছেলে, আপনার ছেলে করে কথা বললেন।'
'তারপর?'
'তারপর, তারপর? খুব মজা না?'
'কমলের মা হবেন?'
কমলের মা? হলে হয়। নট এ ব্যাড প্রোপোজাল।'
'তারপর?'
'আবার তারপর? কি রান্না হবে?'
'ভাবছি। কমলের খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'
'হাল্কা কিছু করে দিন। রাঁধতে জানেন?'
'মোটামুটি।'
'আজ আর আমি সাহায্য করতে পারছি না। বাড়িতে মহামান্য বিদেশি অতিথি। খুব খাতির করতে হবে। মামার ব্যবসার ভাগ্য খুলে যাবে, দেবী যদি প্রসন্না হন। কাল তাড়াতাড়িতে আমি আমার পোশাক ফেলে গেছি। দিন, নিয়ে যাই।'
'থাক না, আমার কাছে থাক মেমেন্টো হয়ে।'
'পোশাক আর নারী দুটোই যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন শুধু পোশাকের সঙ্গে প্রেম কেন? আচ্ছা এখন থাক। আপনি রাঁধুন।'
'আমি কিন্তু আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।'
'অনেক আগেই।'
'কি রকম?'
'আপনি আমার চেয়ে ভালই জানেন। আপনার চোখ সুযোগ পেলেই

আমাকে অনুসরণ করত। ছাদে, বারান্দায়।'
'আপনি আমাকে ভালবাসেন?'
'বড় প্রাচীন প্রশ্ন। আপনার কি মনে হয় না, আমরা এক রাতেই অনেকটা এগিয়ে গেছি? না এসব কথা এখন থাক। আমরা একটু বেশি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। আগে কমল। কমলের শরীর। তারপর প্রেম, দেহ, সুখ এইসব। আমি কিন্তু আপনার চেয়ে কমলকে বেশি ভালবাসি।'
'কেন?'
'এর কোনও উত্তর হয় না।'
'থাক, উত্তর চাই না আমি।'
এষা চলে গেল।

ফটিকচন্দ্র দাশ,এইবার মনে হয় সেই বেস্টসেলার উপন্যাসটা শুরু করে দিতে পারি। ধর্ম নেই। সেক্সের ছড়াছড়ি। পারভারসান। রেপ নেই। রাজনীতির মশলা দিলেই হল। মনোবিশ্লেষণ তো ছত্রে ছত্রে। এসে গেছে হাতের মুঠোয়। এইবার ফেঁদে ফেললেই হয়। তিন তিনজন মহিলা আর যৌবন যায়– যায় এইরকম একজন পুরুষ। একজনকে সে ঘৃণা করে। অথচ ইচ্ছে করলে এখুনি তাকে জীবনসঙ্গিনী করা যায়। ঘৃণার দৈহিকমিলন তো রেপ। ফটিকচন্দ্র রেপও তাহলে আছে। আর একজনকে সে তো এই মুহূর্তেই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। করুণামিশ্রিত ভালবাসা। দেখলেই মায়া হয়। মন হুহু করে ওঠে। যার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা যায়। ক্রীতদাসী করে রাখা যায়। একেবারে হাতের মুঠোয় ধরা স্পঞ্জের মতো। চাপ দিলেই ছোট। চাপের ওপর নির্ভর করবে যার বড় হওয়া ছোট হওয়া। দাসী মনে করলে দাসী, স্ত্রী মনে করলে স্ত্রী। কোনওদিন নিজের অধিকার খাটাবার সাহস পাবে না। ছোবল মারতে আসবে না। আর একজন আধুনিকা, অতি আধুনিকা, সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। যে কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। যে খেলতে জানে, খেলাতে জানে। জীবনে যাকে ধরে রাখতে হলে সার্কাসের বাঘের খেলোয়াড়ের কায়দা জানতে হবে। খুব জমেছে ফটিকদা। এখন ঠিকমতো নামাতে পারলে হয়।
কিন্তু জীবন যে জীবন! জীবন তো উপন্যাস নয়। কল্পকাহিনী নয়।

কমলের একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে চাকরিটাই না ছাড়তে হয়।
সকালে চা খেতে খেতে এই কথাই মনে হল। আজ যদি অফিস বেরোতে হয় কমলকে কারুর ঘাড়ে চাপাতে হবেই। ওর মামার বাড়ির দিকে আমি মরে

গেলেও যাচ্ছি না। পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। মেঘ করেছে ও-আকাশে। আর কে আছে, যার কাছে কমলকে রাখতে পারি ?

মন, ভোলা মন, সত্যি কথা বলবো তোমাকে, কালকের ওই বড়িয়া নাটকের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কালুকে কায়দা করে আটকে ফেলা। বিয়েটিয়ে পরের ব্যাপার। উত্তেজনা রাত ভোরেই থিতিয়ে যেত। তখন কেবল দিন পার করার খেলা। আজ নয় কাল। কাল নয় পরশু। কালুর হাতে কমলকে ফেলে দিয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াও। কতকাল ভালোভাবে জমিয়ে আড্ডা মারা হয়নি। কত জায়গায় যাবার আছে ! এখানে ওখানে। দিনতিনেক কমলকে কালুর হেপাজতে রেখে এযাকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো। একবারই তো জন্মেছি। জীবনটাকে ভোগ করতে হবে না ! এই ওরা সব বলে মাল না খেলে তেমন জোরালো লেখা বেরোতে চায় না। কালু থাকলে সন্ধেবেলা মাঝে-মধ্যে সেসানে বসা যেত। মাঝ রাতে তেমন উতলা হলে কাছে টেনে নাও। কালুর মতো বিশ্বাসী, স্নেহপরায়ণা মহিলা মাসে হাজার টাকা দিলেও মিলবে না। ত্রিভুবনে কেউ নেই। দুটো মিষ্টি কথা, একটু স্নেহ, সব কাজ উদ্ধার।

মন, আমি শয়তান। সত্যি কথা বলব ? নেপালে সোমাকে আমি কুপ্রস্তাবই দিয়েছিলুম। এমন ভাবে দিয়েছিলুম, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। সহজ একটা জাগতিক খেলা, সবাই করে। সোমার বয়েস তখন কম। ছিপছিপে শরীর। হাতের মুঠোয় ধরা যায় এইরকম কোমর। গোপাকে আমি সাংঘাতিক ভালোবাসতুম। তবু সোমাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখব। কুশিক্ষা, কুসঙ্গের ফল। আধুনিক জীবন মানুষকে যেমন শেখায় আর কি ? ভোগের বাড়াবাড়ি করে দুর্ভোগকে টেনে আনো, এই তো আমাদের সভ্যতা।

এযার ওপর আমি বিশেষ ভরসা রাখি না। বড়লোক। দিশিবিদেশি রক্ত শরীরে। শিক্ষায়, সামাজিক মর্যাদায় আমার চেয়ে বহু ধাপ উঁচুতে। মনে হয় দেহবাদী। সহজ নৈতিকতায় বিশ্বাসী। এমন মেয়ে আমাদের মতো ডাঁটা-পোস্ত-কালচারের মিনমিনে মানুষের বউ হলে, কে চোখে চোখে আগলে রাখবে ? সাহসী ভ্রমরের অভাব আছে ? শেষে এই হয়তো দেখতে হবে, আমারই বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া।

আজ আমার প্রথম কাজ তাহলে কি ?

ভুলেই গিয়েছিলাম, অনেক কাজ, কমলের রক্ত, বিভিন্ন দেহ-নির্যাস একে একে পরীক্ষা করাতে হবে। একস রে। একদিনে হবে না। ডাক্তারবাবু যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে দিয়েছেন, সেইখান থেকেই করাতে হবে ! তার মানে সারা শহরের এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে ছোটাছুটি।

এই ছোটাছুটি আমাকে খুব কাবু করে ফেলে। আমি হাসতে পারি, হাসাতে পারি, ফুর্তি করতে পারি, মানুষের সুখের দিনের সঙ্গী হতে পারি, সেবাদৈবা আমার তেমন ধাতে আসে না। মৃতদেহের অনুগামী হয়ে শ্মশানে যাওয়া, কি হাসপাতালে অসুস্থ কারুর পাশে গিয়ে বসা, কারুর জন্যে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ধরে আনা, আমি পারি না। বিরক্তি লাগে। মনে হয়, পরিচিতজনেরা কেন মরে, কেন মানুষ অসুস্থ হয়, কেন বিপদে পড়ে !

আমি জানি, কমলের কিছু হয়নি। তবু সব পরীক্ষা করাতে হবে। এইটুকু ছেলের ক্যানসার হয় ? মাথায় আঘাত লাগলে আমি জানতে পারব না ? দু-এক দিন দেখি, তারপর সব টেস্ট করানো যাবে। আজ বরং একটা ক্রেশের সন্ধানে বেরোই, কিম্বা বিশ্বাসী একজন কাজের লোক। ক্রেশ হয়তো পাওয়া যাবে। কাজের লোক অসম্ভব।

ভাবছি, এযাকে বলব, কমলকে কিছুক্ষণ দেখবেন, আমি দুএকটা জরুরী কাজ সেরে আসবো। এমন সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামল। উঁকি মেরে দেখলুম, সোমা নামছে।

দরজা খুলতেই প্রায় ধমকের সুরে বললে, 'ভেতরে চলুন। কথা আছে।'

একেবারে এলোমেলো চেহারা, বিভ্রান্ত চেহারা। চুল উড়ছে। চোখ বসে গেছে।

সিঁড়ির প্রথমধাপে পা রেখে সোমা ঘুরে দাঁড়াল, 'জানেন আপনি কি করেছেন ? আপনি খুন করেছেন।'

'আমি ? তোমার মায়ের মতো স্বপ্ন দেখলে না কি, কাল রাতে ?'

'জানেন আপনি, কালু পুড়ে মরেছে। আত্মহত্যা করেছে কাল রাতে। আপনি ব্রুট, আপনি জানোয়ার, চরিত্রহীন, লম্পট।'

সোমা এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। আমি সব ধোঁয়া দেখছি। সব ঘুরছে। টলছে। ভাঙছে, চুরছে।

সোমা হঠাৎ সিঁড়ির প্রথমধাপ থেকে টলে আমার বুকে পড়ল। বুকে মুখ গুঁজে, দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে, আর বলছে, 'এ আপনি কি করলেন ? সুকুদা, এ আপনি কি করলেন !'

সত্যি এ আমি কি করলুম ! গোপার আর একবার মৃত্যু হল। এবার আরও বিভৎস। আরও করুণ।

সোমা মুখ তুলল। এই প্রথম। সোমার মুখ আমার মুখের এত কাছে ! এই প্রথম লক্ষ্য করলুম সোমার জোড়া ভুরু। এই প্রথম লক্ষ্য করলুম, সোমার চুল ঘন কালো। ছোট্ট কপাল। টিকলো নাক। চোখ দুটো গভীর সুন্দর।

'কে দায়ী সুকুদা ? আপনি না আমি ?'

ঠিক এই সময় আমার কি করা উচিত ছিল, আর আমি কি করলুম। দু' হাত দিয়ে খোঁপা সমেত সোমার মাথার পেছন দিকটা ধরলুম, আর খুব গভীর ভাবে সোমার ঠোঁটে চুমু খেলুম। আমি জানি না, আমার কি হবে। কি হতে চলেছে। এ ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু এল না। একটু আগে মনে হচ্ছিল, পৃথিবী জনশূন্য হয়ে গেছে। আমি একা, সম্পূর্ণ একা কোথাও যেন দাঁড়িয়ে আছি। শব্দ নেই, দৃশ্য নেই, প্রাণী নেই, ঈশ্বর নেই। সব ঝাপসা।

সোমার শরীর শিথিল হয়ে আসছে। সারা শরীরের ভার আমার দেহে। সোমার মুখ আরও উঁচু হয়েছে। মনে হয় এই মুহূর্তে সে ভুলে গেছে, কাল রাতে অসাধারণ ভালো, পবিত্র একটা মেয়ে বিশুদ্ধ আগুনে পুড়ে মরেছে।

আমার ভিজে ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে তুলে নিলুম। চোখে চোখ রেখে বললুম, 'আমরা দু'জনেই সমান দায়ী।'

সোমার মুখ টকটকে লাল। চোখের জল উত্তাপে বাষ্প হয়ে গেছে। সোমা সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে পড়ল। আমিও বসলুম পাশে।

কমল ওপর থেকে ডাকছে, 'বাবা ! কে এসেছে বাবা ?'

'তোমার মাসি।'

'তোমরা আসবে না ওপরে ?'

'যাচ্ছি রে।'

'যাচ্ছি রে,' বলার সময় আমার গলা আবার ধরে এল। মনে হল, উত্তরটা আমি কমলকে দিলুম না, দিলুম তাঁদের, যাঁরা আমাকে ছেড়ে একে একে সব বিদায় নিয়ে চলেছেন।

'তোমরা যাও। আমিও আসছি পিছু পিছু। আমার খেলা শেষ হতে আর সামান্য কিছু সময় বাকি আছে।'

সোমার দুটো হাত আমার কাঁধে। সেই হাতের ওপর তার কপাল রেখে মাথা হেঁট করে রেখেছে। নিঃশ্বাসের মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছে নাকে। কোনও কোনও মেয়ের নিঃশ্বাসে মধুর মতো একটা গন্ধ থাকে। সোমার তাই আছে। এলো খোঁপা ঘাড়ের কাছে দুলছে। ফিনফিনে চুলের কুঁচি ঘামের মত কাঁপছে বাতাসে। পেছন থেকে আলো পড়ে চিকচিক করছে। সোমার এখন মধ্য যৌবন। ফল পাকলে যেমন ত্বকে একটা পূর্ণতার আভা ফুটে ওঠে, যেন মনে হয় শিশির মাখা ভেলভেট, সোমারও ঠিক তাই হয়েছে। পাকা ধানের রূপ ফুটেছে। টান টান মুখের চামড়া। ভরাট গালে একটি মাত্র সর্বনাশা ব্রণ। অনুচ্চারে অনেক কথাই বলতে চায়। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে সোমা। হালকা হলুদ

শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। আমার বুকের কাছে ঝুলছে সাদা ধবধবে একটা হাত। সরু অনামিকায় নীল পাথরের আংটি। আমার বুকের একটা চুল দু আঙুলে ধরে টানতে টানতে বললে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কি করেছ তুমি ?'

'আপনি আমাকে উপেক্ষা করলে আমার ভীষণ রাগ হয়।'

আমার ডান হাত দিয়ে সোমাকে জড়িয়ে ধরলুম। মনে হল পূর্ণতার আয়তন মাপতে চাইছি। আর সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, কালুকে আমি ভালবাসতুম না। ওকে দেখলে মনটা আমার কেমন করে উঠত। ভালবাসায় নয়, করুণায়। অথবা এমনও হতে পারে আমি কাউকেই ভালবাসি না। যে সাইকেল চালাতে জানে, সে সাইকেল পেলেই উঠে বসবে আর প্যাডল করবে। আমারও তাই। মহিলা দেখলেই বা কাছে এলেই আমি ঘনিষ্ঠ হতে চাই। শুধুই ঘনিষ্ঠ। এ ছাড়া আর যেন কিছুই করার নেই। অচেতন অভ্যাস।

সোমা নিচু গলায় বললে, 'পুলিশ দাদাকে নিয়ে ভীষণ টানাহ্যাঁচড়া করছে। যা হয় একটা কিছু করুন প্লিজ।'

'চলো। দেখি কি করা যায়। তোমাদের বাড়িতে যেতে আমার ভয় করছে ভীষণ। তোমার মা আমাকে দেখলেই জ্বলে উঠবেন।'

'ভয় নেই, আমি আপনাকে বাঁচিয়ে দোব।'

কমল ওপর থেকে চিৎকার করে বললে, 'বাবা, তোমরা আসবে না ?'

উঠে পড়লুম। যে পাশে সোমা বসেছিল, শরীরের সেই পাশটা ভিজেভিজে।

॥ আট ॥

মরার জন্যেই পৃথিবীতে আসা। তা ছাড়া আবার কি। কাল সন্ধেবেলা কালু গা ধোবার পর যে শাড়িটা তারে মেলে দিয়েছিল, সেই শাড়িটা এখনও ঝুলছে। সেই নীল ডুরে শাড়ি। কালুর সেই সরল, সাধিকার মতো মুখ, সেই ভুরু কোঁচকানো অনাবিল হাসি, সেই 'মেজদা' বলে ডেকেই থমকে যাওয়া। একে একে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কেন খেলতে গিয়েছিলুম ! একটা পালক যুক্ত হল আমার টুপিতে ! নাগা হেডহান্টারদের কথা মনে পড়ছে। এক একটা মুণ্ড মানে বীরত্বের ধাপ বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠা।

সারা বাড়ি অশুভ শোকের ছায়ায় থমথম করছে। কেমন যেন একটা মৃত্যু মৃত্যু গন্ধ বেরোচ্ছে।

ফিসফিস করে সোমাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কালু কোথায় গিয়ে লাগিয়েছিল ?'

'বাথরুমে। সবচেয়ে ভাল জায়গা।'

'কখন ?'

'মনে হয় মাঝরাতে। আর কি আশ্চর্য, ওই সময় গোটা তিনেক কুকুর রাস্তায় এক সঙ্গে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। আমি দোতলার শেষ ঘরে শুয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। একটা পোড়া পোড়া বিদঘুটে গন্ধ নাকে এসে লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। দরজা খুলে বারান্দায় এলুম। নিশুতি রাত। চারপাশ থমথম করছে। মনে হল কোথাও একটা কিছু হচ্ছে। অশুভ কিছু। পাশেই দাদার ঘর। দাদার দরজায় ধাক্কা মারলুম। ভীষণ ঘুম। সাড়াশব্দ নেই। মা আছেন নিচে। সাহস করে নেমে গেলুম। নেমে, মায়ের ঘরের দিকে এগোচ্ছি আর ঠিক সেই সময়, কালু জ্বলতে জ্বলতে ছিটকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে উঠনে পড়ল। সুকুদা সে দৃশ্য আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছি। প্রথমে আমি ভাবতেই পারিনি উঠনে যে নেচে বেড়াচ্ছে, সে কালু। পড় পড় শব্দে চুল পুড়ছে, চামড়া থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। সুকুদা ভাবতে পারেন, আমার কি ভীষণ প্রাণের মায়া, পাছে কালু আমাকে জড়িয়ে ধরে, এই ভয়ে ছুটে আবার ওপরে পালালুম। এদিকে চিৎকার শুনে মা বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। শুনছি মা কেবল বলছেন, কে তুমি ? কে তুমি ? সোমা ? কালু ? মোটা একটা সতরঞ্চি চাপা দিয়ে মা মনে হয় আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন। সুকুদা কাল রাতে আমি বুঝেছি, ভীষণ স্বার্থপর আমি। বাইরে বাইরে থেকে থেকে আমি নিজেরটি ছাড়া আর কিছুই বুঝি না।'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। আমরা সবাই কোনও না কোনও নিচতার শিকার। এখন আর আত্মসমালোচনার কোনও মানে হয় না। এও আমাদের এক ধরনের ভণ্ডবিলাসিতা। সোমা, মা কোথায় ?'

'শুয়ে আছেন।'

বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। ভেবেছিলুম খুবই হয়তো ভেঙে পড়েছেন। দেখে সেরকম কিছু মনে হল না। আমাদের দু'জনের দিকে একবার তাকালেন। মুখ দেখে ভয় হল। মনে হল, আগুন এখনও জ্বলছে।

'এই যে শ্রীকান্ত ! বেড়াতে এসেছ ?'

'আজ্ঞে না।'

'বিয়ে করতে এসেছ ?'

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম অবাক হয়ে। কি বলছেন কি ? উত্তর দেবার আগেই বৃদ্ধা বললেন, 'এ বাড়িতে আর পাপ ঢুকিও না। এক

সময় ধর্মের বাড়ি ছিল এটা। কত্তা ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করতেন না। সেই বাড়িতে ওপরের মহাপুরুষটি এমন একজনকে আনতে চাইছেন, যিনি বিয়ের আগেই মা হয়ে বসে আছেন, আর তুমি অনেক দিন ধরেই ঘুরঘুর করছিলে সরল একটা নিষ্পাপ মেয়েকে নষ্ট করার তালে। ছেলেটাকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিলে শিখণ্ডী করে। আর না, আর না। খুব হয়েছে। তোমরা যে যার পথ দ্যাখো। পাপ সব বিদেয় হও। নামযজ্ঞ করে বসতে দাও আমাকে।'

বৃদ্ধা হঠাৎ দু'হাতে বারান্দার থাম জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'কালু, এ তুই কি করলি। কল্যাণী এ তুই কি করলি ? তোকে যে আমি নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করলুম রে।'

সোমা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। ফুলে ফুলে কাঁদছেন।

পাশেই সেই ঘর, যে ঘরে কালু থাকত। চোদ্দ বছর কাটিয়ে গেল এই ঘরে। এসেছিল বারো বছর বয়সে। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের বসবাসের স্মৃতি কি সহজে মোছা যাবে ! এক দেয়ালে শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি। দু হাত তুলে নেচে নেচে চলেছেন পুরীর মন্দিরের দিকে। ও-দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আর এক দেয়ালে মা দুর্গা। ঘরের কোণে কুঁজো। মুখে ঝকঝকে গেলাস চাপা। ঘরের তাকে বেশ বড় মাপের পাথরের একটা নুড়ি। তলায় ভাঁজ করা লাল কাপড়। ফুল দিয়ে পুজো করেছিল। শুকিয়ে গেছে। তোরঙ্গের ওপর পাট করা খান দুই শাড়ি। নতুন একটা ব্লাউজ। হাতা মুড়ছিল। শেষ হয়নি কাজ। ছুঁচ সুতো দিয়ে জড়ানো রয়েছে। খানচারেক বই। গোটা দুই খাতা। একটা খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে, কমলবাবু আর দুষ্টুমি করে না।

আবার লিখেছে, তুমি আমাকে মারছ মারো, বিকেলে কে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। হঠাৎ যদি মারা যাই।

আবার লিখেছে, সেজদা, তুমি কাল এলে না কেন ? কত কষ্ট করে তোমার জন্যে মোচার চপ বানালুম।

আবার লিখেছে, আমার মা ছিল, হারিয়ে গেছে। আমার বাবাকে আমি চিনি না। সবাই বলে আমি হারিয়ে গেছি। আমি হারাবো কেন ? আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

এলোমেলো কত কি লিখেছে, সারা খাতা জুড়ে। এক জায়গায় অনেকটা লিখেছে—

আবার যদি কোনও দিন আমার গ্রামে ফিরে যাই, তাহলে প্রথমেই যাবো বকুলতলার সেই বৈষ্ণবীর কাছে। যার কাছে আসার সময় আমার পুসিকে রেখে

এসেছিলুম। ওর তখন বাচ্চা হবার কথা ছিল। কটা বাচ্চা হয়েছিল কে জানে? তারপর যাবো চাঁপাতলার শ্যামলের কাছে। শ্যামলকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

নিজের চেষ্টায় কালু কেমন বাঙলা শিখেছিল! নীলুদা অবশ্য সময় পেলেই পড়াতেন। একপাশে একটা লুডো খেলার ছক। ঘুটির কৌটো। ছকের মলাটে কমলের হাতের লেখা, 'কমল ও কালু পিসি। লুডো খেলি দিবানিশি।'

তিনচার জনের গলা শোনা গেল উঠনে। একটা গলা নীলুদার।

নীলুদা বসে পড়েছেন রকে। মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। কে যেন এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে মুখে। এলোমেলো চুল। পুরু লেনসের আড়ালে বড় বড় ঘোলাটে দুটো চোখ। নীলুদার দু'পাশে ছাড়া ছাড়া বসে আছে এ-পাড়ারই দুই যুবক। সব পাড়াতেই পরোপকারী কিছু তরুণ থাকে, যারা আমাদের মতো আধবুড়োদের অপকর্ম সামাল দেয়।

নীলুদা বললেন, 'সুকু,তুমি এসে গেছ! কি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল বলো তো! ভাবা যায় না।'

সোমা আর সোমার মা ঘরে ঢুকে গেছে। এই মৃত্যুতে দুঃখের চেয়ে লজ্জা বেশি। প্রতিবেশীদের নানা প্রশ্ন। নানা গুজব ছড়াবে। একটি যুবতী পুড়ে মরেছে, এর চেয়ে মুখরোচক আলোচনা আর কি থাকতে পারে! আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রটে যাবে মেয়েটির গর্ভে অবাঞ্ছিত সন্তান এসেছিল, অথবা প্রতি রাত্রে ধর্ষিতা হত। গুজবের লম্বা জিভ।

নীলুদার উল্টো দিকের রকে আমি বসে পড়েছি।

প্রশ্ন করলুম 'কি অবস্থা!'

'পোস্টমর্টেম না করে ছাড়বে না, সুকু। আর কিই বা ছাড়বে! পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। বুঝলে সুকু, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বড় ভালো মেয়ে ছিল। বড় ভালো মেয়ে। দেবীর মতো। কি যে হল? ইস্ কি যে হল! আর তো ফিরিয়ে আনা যাবে না। লস্ট ফর এভার। কালু চলে গেল! এই ভাবে চলে গেল!'

নীলুদা আবেগ চাপবার জন্যে মাথা নিচু করলেন।

একটি ছেলে বললে, 'আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, আমরা সব ব্যবস্থা করে দোব। আপনাদের আর যেতেও হবে না।'

অপর ছেলেটি বললে, 'বউফট হলে ঝামেলা ছিল। বাপের বাড়ির কেউ এসে উলটো-পালটা কথা বলে কেস জণ্ডিস করে দিত। এর তো কেউ ছিল না। বড় জোর দু'পাঁচশো টাকা লাগবে।'

নীলুদা বললেন, 'আরে ওটা কোনও প্রবলেমই নয়। যখনই চাইবে তখনই দিয়ে দোব।'

ওদের কথাবার্তা শুনছি, আর ভাবছি, আমি এক খুনী। কি করতে গিয়ে কি হয়ে গেল। শিক্ষিতা আধুনিকারা জীবনকে তেমন জড়িয়ে ধরে না। একেবারে পাঁকাল মাছ। চারপাশে নমুনা দেখছি তো। কেউ আর বিয়ের কথা তেমন করে ভাবে না। রাত, রেস্তোরাঁ, কোনও খালি ফ্ল্যাট, দু-চার পেগ তরল, দু'চার টুকরো চিকেন, একটু নেশা, একটু দেহ, ভোর, ভুলে যাওয়া, জীবিকা, আবার রাত, আবার অন্য কেউ, আবার কোনও খালি ঘর, একটা বোতল, গোটা দুই গেলাস, কাবাবের টুকরো, বিছানা, ভোর। এই ভাবেই, যদ্দিন যৌবন আছে। কেউ আর শাঁখা, সিঁদুর, টোপর, সানাইয়ের কথা তেমন করে ভাবে না। হলেও ভেঙে যায়। জীবনে আজীবন একই পুরুষ, একই নারী, বড় সেকেলে ব্যাপার। সেকেলে কালুর একেলে প্রস্তাব সহ্য হল না। লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছে শুনলে অনেকে হার্টফেল করে।

নীলুদা বললেন,'আমি তাহলে চানটান করে একটু শুয়ে পড়ি ভাই। শরীর আর বইছে না। আজ মনে হয় খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নেই।'

নীলুদা ওপরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। ছেলে দুটি উঠে পড়ল। একটাই ভালো, রকবাজ নয়। স্যার স্যার করছে। তার মানে ছাত্র।

আমিও উঠে পড়লুম। কমলটাকে একা ফেলে এসেছি।

সোমা বললে, 'আমি আসবো আপনার সঙ্গে?'

'তুমি বরং যা পারো রান্নাবান্না করো। ঠাকুরকেও তো ভোগ দিতে হবে!'

সোমা ফিস ফিস করে বললে,'আমার পিরিয়ড চলেছে, ঠাকুরের কাজ হবে না। যাই দুটো ভাতে ভাত বসাই মা আর দাদার জন্যে।'

'আর তোমার কি হবে! উপোস!'

'দেখি কি হয়!'

দোতলার বারান্দা থেকে নীলুদা বললেন, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে সুকু।'

'পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন। সব মিটে যাক।'

'আরে এ তো উটকো ঝামেলা। বুঝলে সুকু,সংসারটাকে বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করো। সব মায়া। বিলকুল মায়া।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে হল, বিলকুল মায়া, একমাত্র রমণীর রমণীয় শরীর ছাড়া। ওটা উটকো ঝামেলা নয়, বেদান্ত নয়, মায়া নয়। দুধাপ সিঁড়ি ভেঙে যিনি হাপরের মতো হাঁপান। দৃষ্টি এত কম হাতড়ে হাতড়ে পথ চলেন, অথচ নারী-

শরীরের উচ্চতা, নিম্নতা দেখতে পান, দেখতে পান গভীরতা। সেই গভীরতার তল খোঁজারও সাহস রাখেন। হায় রে! বৈদান্তিক। সমস্ত মানুষ যৌনতার আগুনে কালুর মতো ধুধু পুড়ছে না ঠিকই। জ্বলছে ধিকি ধিকি। এতদিনে ব্যাখ্যা খুঁজে পেলুম, কেন নীলাদ্রিশেখরের বই আর কাগজপত্রের গাদার তলা থেকে পেন্ট হাউস আর প্লেবয় খুঁজে পেয়েছিলুম! কেন নীলাদ্রীশেখর দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে নিচে নেমে যেতেন, আর যত প্রয়োজন পড়ে যেত কলতলায়। কালু হয়তো কাপড়চোপড় নিয়ে বসেছে, কি চায়ের কাপডিশ ডিটার্জেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করছে। সেই সময় নীলাদ্রীশেখরের প্রয়োজন পড়ে গেল কলম পরিষ্কার করার, আঙুটি সাবান জলে চোবাবার, ছোবড়া দিয়ে চটি ঘষার। কালু সেই সময় স্নানের পোশাকে। শরীরে গামছা জড়ানো। চুল চুড়ো করে বাঁধা। নীলাদ্রীশেখরের মুখোশ হল জ্ঞান। অনর্গল বেদবেদান্তের উপদেশ,পুরাণের গল্প বলে যাচ্ছেন। এমন একটা ভাব, যেন নারী-পুরুষের পার্থক্য বোঝেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্পের সেই সন্ন্যাসী। গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। যুবতী ভিক্ষে দিচ্ছে। পাশে বৃদ্ধা মা। সন্ন্যাসী অবাক হয়ে বললে, মা, মেয়ের বুকে অত বড় দুটো ফোড়া! বৃদ্ধা অজ্ঞতায় হাসলেন। বললেন, ফোড়া নয় ঠাকুর, ও দুটো স্তন। ওর সন্তান এসে দুধ খাবে, ঈশ্বর সেই ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন। সন্ন্যাসী এই শুনে ভিক্ষা ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। জীবের জন্যে সব ব্যবস্থাই তিনি যখন করে রেখেছেন, তখন আর কেন বৃথা ভিখমাগা।

নীলাদ্রীশেখর হলে কি করতেন, বলতেন, দেখি মা একটু ভালো করে দেখাও তো, তোমার সন্তানের জন্যে ঈশ্বর কেমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন! দুধ কি-ভাবে বেরোবে! টিপলে না চুষলে! সন্ন্যাসী আর জ্ঞানীতে এই তফাৎ! সাপোর্ট কথামৃতেই আছে—সব কিছু বাজিয়ে নিবি।

কালুকে মায়ামুক্ত করার এই সময়টাই নীলাদ্রীশেখরের বড় উপযুক্ত মনে হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত বেশবাস। সামান্য একটি বস্ত্রখণ্ড। গায়ে খাটো গামছা। মাথায় তেল। চুল চুড়ো। আর বৈদান্তিক নীলাদ্রী ঠিক পেছনে। যেন তীর্থদর্শন হচ্ছে। চোখ যা যা দেখতে চায়, সামনে দুলছে, প্রকাশিত অপ্রকাশিত হচ্ছে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকছে। আঙুটির খাঁজে খাঁজে সাবান মাখানো টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে নীলাদ্রী শোনাচ্ছেন অনিত্য এই সংসারের কথা। কালু হাসছে। কালু কাজ করছে। কালু উঠছে বসছে। পেছনের কাপড় কলতলার জলে ভিজে গিয়ে শরীরের বিশেষ স্থানে জুড়ে গিয়ে গোলাপী। নীলাদ্রীর হাতে সোনার আংটি বুরুশের ঘষায় তিল তিল ক্ষইছে। কালু খুব একটা বিব্রত নয়। জানে বড়দার দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ।

আমার এখন সন্দেহ, নীলাদ্রীশেখর অতি শয়তান। সারা বাড়িতে বই ছড়িয়ে রেখেছেন, এমন কি কালুর ঘরেও। দিবা দ্বিপ্রহরে মা যখন বিশ্রামে, নিস্তব্ধ বাড়ি, মাদুর বিছিয়ে কালুও শুয়ে পড়েছে, সেই সময় নীলাদ্রীশেখরের সেই বইটিরই প্রয়োজন পড়ত, যেটি আছে কালুর ঘরে। আর এমন ঘাপটি মেরে আছে যা সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'তুমি শোও, তুমি শোও, তুমি শুয়ে থাক', বলতে বলতে নীলাদ্রীশেখর সারা ঘরে ঘুরবেন, একবার এ-বই টানবেন, একবার ও-বই টানবেন। কৌশলটা ভালই বের করেছিলেন। কালুকে এঁরা যতটা সহজ, সরল, বোকাবোকা, গ্রাম্য ভাবতেন, ঠিক ততটা বোকা ছিল না কালু। অসম্ভব আত্মসম্মান ছিল! প্রখর বুদ্ধি ধরত। কালুর মুখেই এইসব শোনা। কিছু নিজের চোখে দেখা। কালুর একবার জ্বর হয়েছিল। নীলাদ্রীশেখর জ্বর না দেখে ছাড়বেন না। কালুর বগলে থার্মোমিটার গুঁজবেন। কি আব্দার। কালু বলত আর হাসত। সে কি কাণ্ড মেজদা। একে জ্বর। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। গা পুড়ে যাচ্ছে। আর বড়দার সেবার ধুম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর দেখার বায়না। মনে হচ্ছে টাইফায়েড। জ্বর লিখে না রাখলে চিকিৎসা হবে কি করে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে গলায়। গলা থেকে বুক। এত জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে কেন? শেষে কোমর আর পা টিপতে বসে গেলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কোমর আর পা ছিঁড়ে যায় কালু। কেউ টিপে দিলে বড় আরাম। না না লজ্জা কিসের? অসুখে আবার লজ্জা কি! রাতে দরজা বন্ধ কোরো না। কখন কি দরকার হয়।'

আজ ভদ্রলোককে দেখে ঘৃণায় আমার গা রিরি করে উঠল। বহু আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল। দশ-বিশটা বাচ্চা হয়ে গেলে তাপ কিছুটা জুড়তো।

সদরে বিশাল তালা ঝুলছে। সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে এষা আর কমলের হাসি ভেসে এল। দুজনে পাশাপাশি বেশ আয়েস করে দাঁড়িয়ে আছে।

এষা বললে, 'ঝট করে চান সেরে চলে আসুন। আজ এখানে পিকনিক।'

'আপনার অতিথিরা?'

'তাঁরা আবার অন্যের অতিথি হতে গেছেন।'

ওপরের বারান্দায় এসে এক ঝলক দাঁড়ালুম। কমলকে নিয়ে যাবার সময় এষা ঘরদোর মোটামুটি গোছগাছ করে রেখে গেছে। ফুলদানিতে ফুলও রেখেছে। টানটান বিছানার চাদর। নিখুঁত দুটি বালিশ পাশাপাশি। এমন করে রেখে গেছে, যেন মায়ফেল শুরু হয়ে যাবে এখুনি।

ও-বাড়ির বারান্দায় মুখোমুখি দুটো ক্যাম্প চেয়ার। রং বেরং-এর ছোটদের বই, কাগজ, কাঁচি, পেনসিল, আঠা, ক্রেয়ন, সব চারপাশে ছড়িয়ে কমল মহানন্দে রাজপুত্রের মতো বসে আছে। এষা হাতেনাতে কিছু একটা করতে শেখাচ্ছে।

কাটা হচ্ছে, জোড়া হচ্ছে, রং ঘষা হচ্ছে, বকর বকর হচ্ছে, খিলখিল হাসি হচ্ছে। এ কমল, সে কমল নয়। এষা সেই চাপা বিষণ্ণতা আর ভয়ের সুড়ঙ্গ থেকে শিশু কমলকে বের করে এনেছে।

কমল আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাবা।'

'বেশ মজায় আছো অ্যাঁ!'

'এই দ্যাখো।'

চৌকো একটা বোর্ডে লাল, নীল, সবুজ কাগজের টুকরো জুড়ে জুড়ে বড় সুন্দর একটা ছবি তৈরি হয়েছে। সূর্য উঠছে গাছের পাশ দিয়ে। মজার মজার গোটা দুই বাড়ি।

'বাঃ বেশ হচ্ছে। আঁকো। আমি কাজ সেরে যাচ্ছি।'

করিডর সোজা চলে গেছে বাথরুমে, ডানপাশে রান্নাঘর, স্টোর, ডাইনিং স্পেস। একটা কাবার্ডের তলায় একটুকরো সাদা মত কি একটা পড়ে আছে। বাঁ পাশের স্যাশ দিয়ে সূর্যের আলো এসে দেয়ালে পড়েছে। জায়গাটা যেন আলোয় আলোকময় হয়ে আছে।

টুকরোটা একটা শাঁকের আংটির ভাঙা অংশ। একটু নিচু হতেই বাকি আধখানা পেয়ে গেলুম। এই আংটিটা ছিল কালুর আঙুলে। কি ভাবে ভেঙে দুটুকরো হয়ে পড়ে আছে। সেদিন ঝটাপটির সময় ভেঙেছে। মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়লুম। সাঁ সাঁ নির্জন বাড়ি। নতুন দেয়ালে সকালের টাটকা রোদ। দু টুকরো হয়ে যাওয়া শাঁকের আঙটি। বন্ধ জানালার কাঁচে ফৌ ফৌ করছে বড় একটা মাছি। এই কাবার্ডের ভেতর প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা আছে একটা নাইটি আর প্যান্টি।

চুপ করে বসে আছি। মনটা একেবারে শ্যাওলা-ধরা দেয়ালের মতো হয়ে আছে। জিভে কোনও স্বাদ নেই। মনে হচ্ছে একগাদা চুন দেওয়া একটা পান খেয়ে ফেলেছি। যা হয়ে যায় তা হয়ে যায়। শ্রীকান্ত আর এষা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে, সোমবার রাত একটা।

মঙ্গলবার রাত নটা, কালুর পিঠে মুখ ঘষছে শ্রীকান্ত।

বুধবার বেলা এগারটা, সিঁড়ির প্রথমধাপে শ্রীকান্ত সোমাকে চুমু খাচ্ছে।

বেলা একটা, শ্রীকান্ত হাতপা ছড়িয়ে বসে আছে, হাতে দুখণ্ড শাঁকের আঙটি।

এর নাম জীবন। এর নাম কর্মযোগ! মধ্যবয়সী একটা সক্ষম মানুষের কদর্য ন্যাকামি আর আঁতলামি আর নাটুকেপনা। প্রেম হচ্ছে প্রেম। ফটিকচন্দ্র দাশের ফরমায়েশে বেস্টসেলার উপন্যাসের মশলা জোগাড় হচ্ছে।

কি খেয়াল হল, কাবার্ডের পাল্লা খুললুম। বড় সাধ এই নির্জনে, লোকচক্ষুর আড়ালে একবার দেখব, দুধ-সাদা, নরম, সংক্ষিপ্ত পরিধেয়, যা প্রাচুর্যের লাবণ্যমাখা শরীর ছুঁয়ে থাকে।

সর্বনাশ, জিনিস দুটো বাইরে রেখে কে ব্যাগটা নিয়ে গেছে। কার কাজ! নিশ্চয় কমল। ও বাড়িতে বই, খাতাপত্তর, আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে যাবার জন্যে খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে, খুলেছে, পেয়েছে, নিয়ে গেছে। ইস কি লজ্জা!

নাঃ, কিসের লজ্জা! এসব বোঝার বয়েস হয়েছে কি? অ্যাডোলেসেন্স্ আসুক। তখন শাড়ির আঁচলের অন্য মানে। কমলের এই চোখই তখন অন্যচোখ। এই হাতই তখন অন্য হাত। এই মনই তখন অন্য মন। মানুষ কি রকম ধীরে ধীরে মরে। হোল ওয়ার্লড তখন রিভল্ভ্ করছে একটি মাত্র অ্যাকসিসে-ওম্যান। ইটারন্যাল হাঙ্গার। নো স্যাটাইটি।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে নিজের জীবনের একটা ঘটনাপঞ্জী তৈরি করে সামনে ঝুলিয়ে রাখি।

জন্ম, ১৯৫০, ডিসেম্বর মাস।

১৯৬০, কমলের বয়েস। বেশি খেলা, একটু একটু পড়া। এই কিল চড় কানমলা। এই আদর।

১৯৬৫, অ্যাডোলেসেন্স্। গলার স্বর পালটে গেল। গালে ব্রণ। ভীষণ ক্ষিধে। হরেক দুষ্টুমি। এই চোখে অন্য চোখ। বোনেদের ফ্রকপরা বুকের দিকে তাকাতে পারি না। ভয় করে। মা কিন্তু মা। মাসিকে ভয় পাই। মায়ের চেয়ে সব কিছু অন্যরকম। মাথার ওপর দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করা। কলঘর থেকে শুধুমাত্র ভিজে কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে আসা। দেখব না, তবু দেখার ইচ্ছা। স্কুলের বন্ধু রণেনের কাছে যন্ত্রণা-মুক্তির দীক্ষা। বাড়িতে যে কাজ করে তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগা।

১৯৭০, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। চাকরি। বিবাহ।

তারপর ?-দশটা, পাঁচটা, দশটা পাঁচটা, বিছানা, বাজার, আদর অভিমান।

১৯৭৫, কমল। ট্যা-ভ্যাঁ। একবার একে আদর, একবার ওকে আদর।

১৯৮০, শূন্য।

মহাপুরুষের এই জীবনপঞ্জী। এসেছে, খেয়েছে, বেড়েছে, ভেগেছে। স্কাম অফ দি আর্থ।

আয়নার সামনে খোলামেলা অবস্থায় নিজেকে একবার ফেললুম। চুল, কুচকুচে কালো। টাক পড়েনি। চামড়া টানটান। গাল ভরাট। গলা ছিনে নয়। কণ্ঠা বেরোয়নি। বুক চওড়া। কোমর সামান্য আয়েসী মেদ। উরু দুর্বল

নয়, ক্ষমতা রাখে। তবে ? পাশ। একশোতে একশো।

ঝটাপট চান সেরে স্মার্ট প্যান্ট, আর টি সার্ট পরে এযার বাড়িতে। আমার শ্বশুর বাড়িও হতে পারে। ভাগ্যের কথা কি বলা যায়। এখন আর কালুর কথা মনে পড়ছে না। কালু বেশ মজা করছে। কখনো আসছে, কখনো যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ একটা কথা ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ঝক ঝকে স্টেপস্। নামছি, নামছি। স্যাশ দিয়ে চাপা আলো আসছে। কুচকুচে কালো হাতল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বয়স যখন পনের,বাড়িতে কাজ করতে এল শ্যামা। শ্যামার সঙ্গে কালুর মিল আছে কোথাও। এতদিন পরে মনে পড়ে গেল। এক বৃষ্টির দুপুরে শ্যামার শাড়ির আঁচল মাথায় দিয়ে, দুজনে কোমর ধরাধরি করে বাড়ি ফিরেছিলুম। সে রাতে খুব কষ্ট হয়েছিল। পরের দিন শ্যামা আসেনি। জ্বর হয়েছিল। আমার অভিমান। বিকেলের দিকে ছুতো করে ওদের বস্তিবাড়ির পাশ দিয়ে সমনস্ক অথচ অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে গিয়েছিলুম। শ্যামার স্বাস্থ্যবতী মা পুকুরঘাটে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে কাপড় কাচছিল। শ্যামার দেখা পাইনি। পরের দিন এসে আমাকে বলেছিল, 'তোমার জ্বর হয়নি ? কাল বৃষ্টিতে ভিজে আমার জ্বর এসে গেল কোঁ কোঁ করে।' আমি বললুম, 'কই দেখি'। কপালে হাত দিয়ে বললুম, 'যাঃ ঠাণ্ডা।' ও বুকের কাপড় সরিয়ে বলছিল, 'জ্বর ওখানে কি ? জ্বর তো এখানে।' আমার হাত কেঁপেছিল। সেই আমার প্রথম দেখা। ভয়ঙ্কর আনন্দের দৃশ্য। হয়তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। শ্যামা খুব কাছে সরে এসেছিল। বলেছিল, সারা শরীর নাকি খুব টাটিয়েছে। কোমরে ভীষণ যন্ত্রণা। আমাদের শ্রেণীর মানুষের ওপর শ্যামার খুব রাগ ছিল। আমরা নাকি ভীষণ ছোটলোক। তাই শ্যামা আমাকে খারাপ করার খুব চেষ্টা করেছিল। না কি ভালবাসা ! বয়েস পেরিয়ে এসেছি। আর কে অত গবেষণা করে ! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমি শ্যামাকেই খুঁজছি। সে কালুতে ছিল। সে শ্যামাতে আছে। এষাতে আছে অন্যভাবে। এযা শ্যামার মতই সহজে ধরা দিতে জানে।

কমল যেন আমাদের বাড়িতে একেবারে রাজ্যপাট সাজিয়ে বসেছে। বই, খাতা, কলম, রঙের বাক্স, পুতুল। শিশুরা একটু ভালবাসা চায়। যা এষা দিতে জানে। আমার আবার শিশু-প্রেমের চেয়ে নারীপ্রেম বেশি। অথচ নারীপ্রেম থেকেই শিশুর আগমন। শিশু যেন আমার সিসটেমে বাই-প্রোডাক্ট।

দুপুরের সাজে এষাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কমল না থাকলে একটা কিছু ঘটে যেতোই। সোনপাপড়ির মতো রোদ। সূর্যমুখীর মতো দিন। বিলিতি সাবানের গন্ধ। এষার ভুট্টা রঙের শরীরে অফ হোয়াইট শাড়ির প্যাঁচ। কমল আমার জীবনে একটা বড় বাধা। আমার কত ভোগ বাকি ! এমন লাগাম পরানো

জীবন ভালো লাগে !

এষা জানালার ধারে খাবার টেবিল সাজাচ্ছে।

'সাহায্য করব আপনাকে ?'

'সাহায্য করার কিছু নেই। ইট ইজ সো সিম্পল।'

কমল বললে, 'বাবা, তুমি ছবি আঁকতে পারো ?'

'আধুনিক ছবি পারি।'

'মাসি পারে জানো ? এই দেখ আমি বসে আছি কেমন ?'

এষা স্কেচ করেছে কমলকে। ভারি সুন্দর হয়েছে।'

স্যালাড সাজাচ্ছিল এষা। সোফায় বসে আছি আয়েস করে।

বললুম, 'স্কেচটা ভারি সুন্দর হয়েছে। পাকা হাত।'

'আপনার ছেলেটি যেন দেবশিশু !'

'তাহলে আমাকে তো আবার দেবতা হতে হয়।'

'আপনি তো দেবতাই। আপনার মুখ আর চোখ দুটো ভারি সুন্দর। সমুদ্রে গেছেন ?'

'না।'

'গেলে হয়। রোদ, গোল্ডেন স্যান্ড, নীল আকাশ আর শ্যাম্পেনের মতো জল। শ্যাম্পেন খাবেন ?'

'আছে নাকি !'

'থাকবে না ? এটা তো ইন্টারন্যাশনাল বাড়ি।'

'শ্যাম্পেন কখনও খাইনি।'

'তাহলে একটা খুলি। শ্যাম্পেনের চেয়ে, শ্যাম্পেনের বোতল বেশি রোমান্টিক।'

ফট করে শব্দ হল। ভেতরের তরল পদার্থ ঠেলে বেরিয়ে এল। এষা অদ্ভুত কায়দায় বোতলের তরলকে আবার বোতলেই ফিরিয়ে নিয়ে এল।

খুব একটা সুস্বাদু কিছু মনে হল না। তবে আমি তো আর এ রসের রসিক নই। তবে খাওয়ার পর যত বাতাস লাগছে শরীর চনমন হচ্ছে। মন ক্রমশ হালকা হয়ে তুলোর বিচির মত বাতাসে যেন ভাসছে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। গোপা আর যাই পেরে থাকুক, শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে পারত না। মেয়েরা সত্যিই কত এগিয়ে গেছে ! দশ বছর আগে হলে এষার সঙ্গে আমার এই মেলামেশায় পাড়ায় ছিছি রব উঠে যেত।

প্রচণ্ড খাওয়া হয়ে গেল, বিলিতি ধারায়। স্যুপ, ফ্রাই, স্যালাড। কমলের শরীর এখনও মনে হয় ঠিক হয়নি। ফুরফুরে পাখার বাতাসে এষার বিছানায়

ঘুমিয়ে পড়ল। এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। বাঁশির মত নাক। ফর্সা টুকটুকে। আমার বড় শৌখিন ছেলে। জন্মগত একটা আভিজাত্য নিয়ে এসেছে। এই যে ঘুমোচ্ছে, মুখটা যেন টুলটুল করছে। গোপা গর্ব করার মতো একটা উপহার দিয়ে গেছে।

একটা তাগড়া ছেলে এসে এঁটো বাসনপত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। টেবিল শুধু সাফা নয়, সিলিকোন পালিশ দিয়ে ঝকঝকে করে দিয়ে গেল। দরজার কাছে আমি আর এষা ক্যাম্প চেয়ারে আধশোয়া। সামনে বারান্দা। খোলা নীল আকাশ। চিকচিক পায়রা উড়ছে।

এষা বললে, 'লেখা কেমন এগোচ্ছে ?'

'একটা লাইনও লেখা হয়নি।'

'আপনি কি ভাবে লেখেন ?'

'এর আগে যেভাবে লিখেছি, তাতে একটা থিমকে ধীরে ধীরে ডেভালাপ করেছি। এইবার পড়েছি বিপদে। লিখতে হবে প্রেম, রগরগে প্রেম। আপনি কি ভাবে লেখেন ?'

'আমি প্রথমে চরিত্র তৈরি করে যাই। একের পর এক চরিত্র। তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দি, ব্যাস, আমার ছুটি। তারপর তারা নিজেরাই নিজেরদের ডেসটিনি তৈরি করে। আমি শুধু ফলো করি।'

'কি রকম ?'

'যেমন ধরুন, আপনি, আমি, কমল। আপনি উইডোয়ার, ইন্টেলেকচুয়াল, ভালো চাকরি করেন, ধর্মবিশ্বাসী নন, দেহবাদী, ওভার সেক্সড, এ লিটল পারভার্ট, স্লাইটলি স্বার্থপর, স্টিফ, এ লিটল লেজি।'

'আপনি আমাকে এইসব বলছেন ?'

'ডোন্ট গেট আপসেট। আমার চরিত্রটা এখনও বলিনি। আমি একটা থর্টলেস, ওয়েওয়ার্ড, অ্যাফুয়েন্ট। আমার চোখের সামনে আমার মা সোসাইটির ভালগার পিপলদের সঙ্গে সেক্স করেছেন। শি ওয়াজ থরোলি এ পারভার্ট লেডি। শি হ্যাড এনরমাস অ্যাপেটাইট ফর এভরি থিং। শি ওয়াজ এ নন-বিলিভার, এ বিউটিফুল বিস্ট। আই ড নট নো, হু ওয়াজ মাই ফাদার। আমার মা আমার লিগ্যাল ফাদারকে ক্রীতদাস করে রেখেছিলেন। মার-ধোরও করতেন। আর আমার বাবা ভীষণ রেলিশ করতেন। র‍্যাদার, আমার বাবা খুব আনন্দ পেতেন। যখন দেখতেন অন্য কেউ আমার মাকে ভোগ করছে। আমি এমন একটা মেয়ে,শৈশবে যে কোনও দিন ভালবাসা পায়নি। আমার মা আমাকে মেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, পাশের ঘরে অন্য কারুর সঙ্গে বসেবসে ড্রিঙ্ক

করতেন, আর বিছানায় চলে যেতেন। কেন করতেন ? দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি। ধরা যাক, আমি এমন একটা মেয়ে যার কোনও মরাল নেই ; কিন্তু তার ভালবাসা আছে। শি ইজ অল লাভ, কিন্তু একটু ওভার সেকসড। নিঃসঙ্গ কোনও শিশুকে দেখলে তার নিজের শৈশব মনে পড়ে যায়। তখন তার ভেতর থেকে সত্যিকারের একজন মা বেরিয়ে আসে। আর সেই শিশুটি ? সে কেমন। ভারি বুদ্ধিমান। বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি বোঝে। ভীষণ সেনসিটিভ। সে সঙ্গ চায়, ভালবাসা চায়। সে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। যেমন ভাবেই হোক, তার মনে একটা ধারণা হয়েছে, তার বাবা তাকে তেমন পছন্দ করে না, একটু ওদিক এদিক হলেই বিরক্ত হতে পারে। তার মনে হয়, বাবা তার কাছ থেকে একটা কিছু লুকোতে চাইছে। সে না থাকলেই তার বাবা খুশি হয়। ধরুন এই তিনটি চরিত্রকে নিয়ে আমার উপন্যাস। আমার কিছু করার নেই। চরিত্ররা নিজেরাই এক সময় তাদের পরিণতিতে পৌঁছে যাবে। আমি শুধু বসে বসে সুতো ছেড়ে যাবো।'

'আপনি সত্যিই কি এইরকম একটা উপন্যাস লিখছেন ?'

'লিখিনি। ভাবছি লিখব।'

'খুব চিন্তায় ফেলে দিলেন।'

'চিন্তার কি আছে। আমি ধর্ম না মানলেও ভাগ্য মানি। আমাদের সকলেরই ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। আর ভাগ্য হল, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের স্বভাব। এ নিয়ে চিন্তার তো কিছু নেই।'

নীরবে বেশ কিছুটা সময় বয়ে গেল। বাইরে ঝাঁঝাঁ করছে কলকাতার দুপুর। শ্যাম্পেনের নেশা চড়ছে ধীরে ধীরে। চোখের সামনে যেন বাসন্তী আঁচল উড়ছে। এষা ঠিকই বলেছে মানুষের প্রবৃত্তিই হল মানুষের ভাগ্য। কমল ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এষার খাটো ব্লাউজ দেখছি। কাঁধ, হাত, গলা, কোমরের অনাবৃত অংশ দেখছি। নিটোল উরু, পা, সমস্ত শরীরটা চোখের সামনে দুলছে ফনা তোলা সাপের মতো। এখুনি ছোবল মারবে। মানুষের চিন্তার একটা তরঙ্গ আছে। এষার মনে ধরা পড়েছে। দু'হাত মাথার ওপর ওইভাবে টানটান করে তুলে আড়ামোড়া ভাঙবে কেন ? জানে না আমি সামনে বসে আছি শকুনের মতো। বুকের নরম উচ্চতা অমন স্পষ্ট হয়ে উঠলে কেউ স্থির থাকতে পারে ! চোখ জ্বালা করে। নিঃশ্বাস গরম হয়। শরীর আনচান করে।

আমি ভয়ে ভয়ে জড়ানো গলায় বললুম, 'ও ঘরে যাবেন ?'

এষা হাসল। একটু যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। চোখ দুটো অসম্ভব চকচক করছে। বললো 'এখন দুপুর।'

'ডার্কনেস্ অ্যাট নুন।'

আবার হাসল, 'গেলে হয়। গিয়ে দেখা যেতে পারে কি হয়!'

এষা উঠে পড়ল। আমার নিয়তির মতো চলেছে সামনে। এ এক অসহ্য অনুভূতি। চাপা যায় না। এমন আবেগ। ভারি সুন্দর ঘর। মাঝখানে মোলায়েম চাদর-ঢাকা বিশাল পরিপাটি বিছানা। চারপাশে ঝকঝকে তকতকে বড় বড় জানালা। জানালার গুণে চেনা আকাশ অচেনা। মনে হচ্ছে ভূপ্রান্তের কোনও এক অজানা দেশের রেস্ট হাউসে বিশ্রাম নিতে এসেছি। মৃদু বাতাসে আলোর ফানুস দোল খাচ্ছে। এষা একে একে প্রতিটি জানালার পর্দা টেনে দিল। স্বচ্ছ অন্ধকারে এষার শরীর থেকে যেন ফসফরাসের আলো বেরোচ্ছে। খাটের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল নিজেকে। বড় নেশা!

॥ নয় ॥

উদ্‌ভ্রান্ত নীলুদা ট্যাকসি থেকে নেমে এলেন। ঝড় বইছে। সাতদিনে একটা মানুষ একেবারে যেন বিধ্বস্ত। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলনো। বয়েস চলে গেলে মানুষের আর মহিলা নিয়ে মাতামাতি চলে না।

'ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে পারো সুকু! একটাও খুচরো টাকা নেই।'

আমি প্রস্তুতই ছিলুম। ট্যাকসিতে ওঠার আগেই জানতুম, নামার সময় এই কথাই আমাকে শুনতে হবে। অসম্ভব কৃপণ স্বভাবের মানুষ। ভাড়া নিয়ে ট্যাকসি চলে গেল।

রাস্তার ওপরেই বিশাল বাড়ি। বেশ বয়েস হয়েছে। বার্ধক্যের চিহ্ন সর্বত্র। শুধু মজা এই, জায়গায় জায়গায় মেক আপ পড়েছে। খানিকটা দাঁত বেরনো, খানিকটা রং প্লাস্টার। দরজায় জানলায় পেন্ট। তিন চারটে প্রবেশ দরজা। এক এক দরজায় এক এক নেম প্লেট। সবাই গুপ্ত। অনেক গুপ্ত গুপ্ত হয়ে আছে এই প্রাচীন বাড়িটিতে। যার যেমন অবস্থা, সে সেইভাবে নিজের অংশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে।

'নীলুদা, এ বাড়ির তো অনেক শরিক!'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো হবেই। বিশাল ফ্যামিলি। তবে কি জানো, ভাগাভাগি হয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই। যে যার বেশ পিসফুলি আছে।'

'নিজের বাড়ি ছেড়ে এই বাড়িতে থাকা ঠিক হবে! থাকতে পারবেন?'

'নেলীর জন্যে আমি নরকেও থাকতে পারি।'

আর কিছু বলার নেই। মাথা বিগড়ে গেছে। পা গুনে গুনে নীলুদা পাশের একটা প্যাসেজ ধরে বাড়িটার পেছন দিকে চলেছেন। একেবারে শেষ মাথায়

লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। দোতলাটা বেশ সায়েবী সায়েবী। বড় বড় কাঁচের জানলা। সাদা সাদা পর্দা। হালকা ক্রিম রঙের দরজা-জানলা।

নীলুদা প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে বেশ টকটক করে ওপরে উঠতে লাগলেন। প্রেমে পড়লে মানুষের মনের জোর কি সাংঘাতিক বেড়ে যায়! এখন ঝাপসা চোখেও কেমন স্পষ্ট দেখছেন!

কম বয়সী এক অবাঙালী মহিলা দরজা খুলে দিলে। বেশ পরিপাটি সাজগোজ। সুন্দর করে বাঁধা চুল। কথায় অবাঙালীর টান। আমাদের বসিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। চারপাশ বেশ সাজানো গোছানো। সেন্টার টেবিলে অ্যাশট্রে। অ্যাশট্রে মৃদু মৃদু ধোঁয়া ছাড়ছে। নীলাদ্রীশেখর ঝাপসা দেখছেন এখন। এমন একটা সন্দেহজনক ব্যাপার চোখে পড়ছে না! বিরাট গোয়েন্দা হবার প্রয়োজন আছে কি!

'মিস গুপ্তা কি সিগারেট খান?'

নীলুদা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন বলো তো। আমার সামনে কোনও দিন খায়নি।'

সেই মেয়েটি ভেতরে গেছে ত গেছেই। কোথাও খুব মৃদু সুরে সেতার বাজছে। বেশ লাগছে বাজনাটা। কে বাজাচ্ছেন, রবিশঙ্কর, নিখিল ব্যানার্জি!

ভেতরে যাবার দরজায় পর্দা ঝুলছে। ওপর দিকটা দেখা যাচ্ছে না। তলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দুটো পা এগিয়ে আসছে। পর্দা সরিয়ে সেই মেয়েটি এল। মশলাটশলা একটা কিছু চিবোচ্ছে। ঘরে এসে বললে, 'এখন দেখা হবে না। মেমসায়েব ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছে।'

নাকের ওপর চশমা ঠিক করতে করতে নীলুদা অসহায়ের মতো বললেন, 'আমার যে অনেক জরুরী কথা ছিল মীরা।'

'সে কাল আপনি অফিসে গিয়ে বলে নেবেন।'

'অফিসে কি সব কথা হয় মীরা?'

'সে আমি কি বলব! মেমসায়েবের খুব টেনসান হল। আমাকে বললেন আমি আজ ঘুমবো। ডোন্ট ডিস্টার্ব।' পর্দার পাশে প্যাসেজে বেশ ভালো এক জোড়া মোকাসিন চোখে পড়ছে। ভাগ্য ভাল, নীলুদা চোখে কম দেখেন।

নীলুদা বললে, 'মীরা, আমি কি তাহলে চলে যাব!'

অ্যাশট্রে এবার ভলভল ধোঁয়া ছাড়ছে। প্রায় পুরো একটা সিগারেট ধিকিধিকি পুড়ছিল। কেউ খুব তাড়াতাড়ি দু-এক টান টেনেই গুঁজে দিয়ে উঠে গেছে ভেতরে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, অ্যাশট্রের পাশে একটা গাড়ির চাবি পড়ে

আছে। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে ফাজিল মেয়েটি চ্যাকোর চ্যাকোর মশলা চিবোচ্ছে। কালো, কিন্তু চেহারায় বেশ চটক। দেখলেই মনে হয় রোজ দুপুরে সিনেমা দেখে, আর শস্তায় রেস্তোরাঁয় কাঁচা ছেলের মাথা ভেঙে মোগলাই খায়। ভীষণ রাগ হচ্ছে এই নীলাদ্রীশেখর প্রাণীটির ওপর। মানুষটা এত বোকা ? হ্যালুসিনেশানে ভুগছে ! বেশ কড়া গলায় বললুম, 'নীলুদা আপনি উঠবেন ?'

একেবারে নিশাহারা। আমতা আমতা করে বললেন,'চলে যাবো ! এই দুপুরে, রোদে পুড়ে এতটা পথ এলুম !'

'আপনি তাহলে বসুন। আমার কাজ আছে। আমি যাই।'

'বাঃ, তুমি চলে গেলে একা আমি যাবো কি করে ?'

'অন্যদিন যে ভাবে যান।'

'নাঃ, চলো, চলেই যাই।'

আমরা বেরোতে না বেরোতেই মীরা দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল। যেন তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে একটা ছেলে দু হাতে দুটো দুটো চারটে সোডার বোতল নিয়ে উঠছিল। আমরা নামছি দেখে নেমে একপাশে সরে দাঁড়াল। বাবা, ঘুমের ওষুধের সঙ্গে কি সোডা ওয়াটার সেবন বিধেয় !

নীলাদ্রীশেখর, ইউ আর এ ফুল। আধুনিকাদের চিনলে না। তোমার নেলী গুপ্তা একটি নিমফো। তোমাকে বৃষস্কন্ধ দেখে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে বৃষের মতই ব্যবহার করার ইচ্ছে হয়েছিল। মূর্খ ! এই শহরে বৃষের অভাব আছে ! অনেক পয়সাঅলা বৃষ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নীলুদা হঠাৎ আবার দৃষ্টি হারিয়েছেন। কায়দার সিঁড়িতে এক একটা ধাপ নামছেন আর পরের ধাপটা পাবার জন্যে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াচ্ছেন। আমার কাঁধটা ধরার চেষ্টা করছেন। কৃপণ ভোগী, কামুক তাকে আমি আমার কাঁধ দিয়ে সাহায্য করব !

নীলুদা আর্তস্বরে বললেন, 'সুকু আমাকে একটু ধরো ভাই।'

আর তখনই মনে হল, মানুষটিকে নিয়ে আমিও একটু খেলি। ধরা দিয়েও সরে সরে যাই। চোখে মুখে আতঙ্ক। পড়ে যাবার ভয়। পরেই মনে হল, এ আমি কি করছি ! আমিই বা কি এমন সাধু ! বেড়ালের মত আঁস্তাকুড়ে আঁস্তাকুড়ে এঁটোকাঁটা খেয়ে বেড়াচ্ছি। এখনও সময় আছে। এখনও দৃষ্টি আছে, এখনও এই ঘুরপাক সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে পারছি। নিজের সঙ্গে নিজেই ন্যাজে না খেলে জীবনটাকে কারুর হাতে স্থিত করে দি।

নেমে এসেও নীলুদার মনে হচ্ছে এখনও নামা হয়নি। পা ঘষছেন আর

বলছেন, 'সুকু, আর স্টেপস্ আছে না কি?'

'যতটা নামার নেমে এসেছেন আপনি।'

হাজরা পার্কে ঘাসের ওপর এসে আমরা দুজনে বসলুম। বসার দরকার হয়েছে। আসল ব্যাপারটা কি ! লোকটা পাগল হয়ে গেল না কি ! ইন্দ্রিয়কে চেপে রাখতে রাখতে এক সময় অনেকের এই অবস্থাই হয়।

নীলুদা হাবাগোবার মত বসে আছেন। কিন্তু ভাবছেন বলেও মনে হয় না। সময় চলে যাচ্ছে, নীলুদা বসে আছেন ভ্যাবলা দর্শকের মতো। মানুষটির মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে আমার রাগ ক্রমশ পড়ে আসছে।

একটু কাছে সরে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'নীলুদা স্বপ্ন ? স্বপ্ন দেখেছিলেন তাই না ? ভালবাসার স্বপ্ন !' উত্তরে বোকার মতো হাসলেন।

'হাসলে হবে না। পুরো ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে ! মা বলছিলেন ওই মহিলা নাকি সন্তানসম্ভবা আর আপনি তার পিতা !'

নীলুদা খপ করে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন।

কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সুকু,ভুল ভুল,সব ভুল। আমাদের এই জন্ম, মৃত্যু, জীবন, আনন্দ, উল্লাস, সব ভুল। লাইফ ইজ এ লিভিং হোকস্। ওই মহিলার দর্শন তুমি পেলে না। পেলে বুঝতে পারতে একটি শরীর,একটি কণ্ঠস্বর, দুটো ঠোঁট, তাকাবার ধরন, মানুষকে কি ভাবে পতঙ্গের মত দেহের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায়।'

'আপনি প্রথমে আমাকে অন্য কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, একজন স্নেহশীলা, মাদারলি মহিলা আপনার দায়িত্ব নিতে চান। তিনি মা হতে চান।'

'সুকু,আমার এখন মনে হচ্ছে সবটাই আমার কল্পনা। আসল ব্যাপার অন্য।'

'তার মানে ?'

'আমি আর কিছু বলতে পারব না। আমাকে অনুরোধ কোরো না। তবে জেনে রাখো, মেয়েরা ভীষণা হতে চাইলে কি হতে পারে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। যে হাত দোলনা দোলায় সন্তানের,সেই হাতই তোমার জিভ টেনে বের করে আনতে পারে।'

'আপনার এই সব রহস্যময় কথার অর্থ বোঝা শক্ত। হয় আপনি পাগল, না হয় আপনি অভিনেতা। আর তা না হলে আপনি পাকা শয়তান। কোনটা ? সত্যি কথা বলুন তো, কালু কি আপনার জন্যেই পুড়ে মরল ?'

মোটা লেনসের আড়ালে নীলুদার চোখ দুটো যেন আরও বড় দেখাচ্ছে। তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ,তারপর বললেন, 'সব রহস্য সবাই কি জানতে পারে ? পারে না। কত কি চাপা পড়ে যায়। চাপাই থাকে চিরকাল। কালুর

মৃত্যুর অবশ্যই একটা কারণ আছে। তবে সে কারণ আমি নই। এর বেশি কিছু জানতে চেও না।'

'আমি না জানতে চাই, পুলিশ জানতে চাইবে।'

'আমাদের সৌভাগ্য, পুলিশ এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।'

'যাক, আপনার জীবনের ব্যাপার আপনি বুঝুন। আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।'

নীলুদা আবার আমার হাত চেপে ধরলেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, আমি একটা ক্রিমিন্যাল, পাপী, মার্ডারার, খুনী। ভালো করে চেয়ে দেখ। চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে।'

'না নীলুদা, তা মনে হয় না। মনে হয়নি কোনও দিন। বরং মনে হয়েছে আত্মভোলা, জ্ঞানী, সাধু প্রকৃতির মানুষ।'

'সুকু, সাধু হতে চেয়েছিলুম, কামজয়ী, ভগবৎপ্রেমী মানুষ হিসেবে নয়, সংসার থেকে পালাতে চেয়েছি বলে। তুমি কি জানো যাঁকে আমি মা বলি, তিনি আমার মা নন।'

'তার মানে?'

'ভেরি সিম্পল। আমার পিতৃদেব দুবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের ফসল হলুম আমি। আর দ্বিতীয় পক্ষের গোপা আর সোমা। তুমি জানতে? জানতে কি আমার যখন কমলের মতো বয়স তখন আমার মাতৃবিয়োগ হয়। তুমি কি জানতে আমার সৎমা ছিলেন আমার বাবার এক প্রাণের বন্ধুর স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জানতে না। কেন জানতে না জানো, আমরা প্রবাসী ছিলুম। অতীত মুছে ফেলার শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্থান পালটানো। জানো সুকু, আমার পিতা একটি পিতৃপরিচয় ছাড়া, আমার জন্যে ঐহিক কিছুই রেখে যাননি। আর আজ যাঁকে ঠাকুর ঘরে বসে দিবারাত্র মালা ঘোরাতে দেখ, সেই সুন্দরীর আসল মূর্তি তোমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমরা তখন দেরাদুনে। ঝড়ের রাত। ঘন ঘন বাজ পড়ছে, মুসৌরী হিলসের মাথার ওপর। ভয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটে গেছি বাবা-মা যে ঘরে আছেন সেই ঘরের দিকে। বিশাল বাংলো। এ-মাথায় আমি ও-মাথায় ওঁরা। দরজায় ধাক্কা মারছি। বিদ্যুতে চারপাশ নীল নেগেটিভের মতো হয়ে যাচ্ছে। ডাকছি, মা দরজা খোলো। মা আমার ভীষণ ভয় করছে। ঘরে কত রকমের শব্দ হচ্ছে। ফিস ফাস কথা হচ্ছে। দরজা কিন্তু খুলল না কিছুতেই। শেষে কি হল জান সুকু, চৌকিদারের বউ এসে কোলে তুলে নিলে। নিয়ে গেল তার ঘরে। এক ঘর

ছেলেপুলে, নোঙরা কাঁথা, ঘামের তেলের, মূতের গন্ধ, তার মাঝে সেই দেহাতী মহিলার বুকের কাছে শুয়ে রাত কেটে গেল। বড়লোকের ছেলের এই হল জীবন। সুকু, জীবনের সব কিছু বাজে, ভাঁওতা, ধাপ্পা, খেলা, তামাশা। সুন্দরী রোহিত মৎস্য আমার পিতা নামক কেঁচোটিকে গিলে ফেলেছিল। আর আমি যখন যৌবনে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলুম তখন বলা হল, অসবর্ণ বিবাহ চলবে না, বিয়ে করতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে করো। সুকু, চরিত্রহীনরাই চরিত্র আঁকড়ে ধরে। ধরে চিৎকার করে, গেল, গেল। সুকু, সারা জীবন ভালবাসা খুঁজেই গেলুম কাঙালের মতো। পেলুম না। না মানুষের, না ঈশ্বরের। শেষ মার মেরে গেল এই মহিলা। বাঁদর নাচ নাচালে কয়েক বছর। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুড়ে গেল প্রেমের আগুনে। সুকু, আমি শয়তান নই, পাপী নই, আমি কাঙাল, আমি পথের ভিখিরি।'

আকাশের আলো মুছে আসছে ধীরে ধীরে। নীলুদার থমথমে মুখ। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পারো, তোমার সে ক্ষমতা আছে। আমার জন্যে একটা আশ্রম জোগাড় করে দাও। অধ্যাপক হিসেবে আমার সুনাম আছে। একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালবাসতেই পারে। তাতে এমন কিছু অপরাধ হয় না। ছিছি করার কিছু নেই। বিশাল পৃথিবীকে মায়া দিয়ে মোহ দিয়ে ঘিরে ছোট করে না নিলে, বেঁচে থাকাটা তো একটা আতঙ্ক। বিশ্বাস আছে বলেই তো বিশ্বাসঘাতকতা আছে সুকু। প্রাণ আছে বলেই তো মৃত্যু আছে।'

'আমার কাছে থাকবেন নীলুদা?'

'না। আমি একটা ব্যাডলাক বয়ে বেড়াচ্ছি। তোমরা যাকে বলো অপয়া মানুষ।'

'আমিও তো অপয়া।'

'এই মুহূর্তে সে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আরও কিছুদিন বাঁচো। জীবনটাকে আরও কিছুদিন গড়াতে দাও। তবে একটা কথা তোমাকে আজ বলে রাখি, কমল যেন নীলাদ্রীশেখর না হয়ে যায়। সাবধান। মানুষের ভাগ্যের গোটাকতক বাঁধা পথ আছে, আর জীবনের গোটাকতক নির্দিষ্ট গাড়ি আছে। ট্রেনের মতো ইলেভন আপ ফিফটিন ডাউন। এক একজন এক একটায় উঠে পড়তে বাধ্য হয় আর ভাগ্যের এক একটা স্টেশনে পৌঁছে যায়। কমলকে একটা ভালো গাড়িতে তুলো। ওর মা খুব ভাল ছিল। সোমাও খারাপ নয়।'

'আপনি তাহলে এখন কি করবেন? মা তো বলছেন বাড়ি বেচে দেবেন?'

'আমার অধ্যাপনাটা তো এখনও রয়েছে। হাতড়ে হাতড়ে যাবো। চশমার ওপর লেনস ব্যবহার করে যদ্দিন পারি চালাব। তারপর ইট ইজ সো সিম্পল।

রেচেড, হ্যাগার্ড, বেগার, ডেথ ইন স্লো মোশান। একটু একটু করে একদিন শেষ। মনটাকে প্রস্তুত করে নিতে পারলে ইট ইজ নাথিং। কিচ্ছু না সুকু। তুমি যাবে তো। চলো উঠি। এখন কি আর ট্যাকসি পাওয়া যাবে?'

আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে নীলুদা চলে গেল। সেই দুপুর থেকে আমার মাথাটা একেবারে গুলিয়ে আছে। এতক্ষণ কি যে হয়ে গেল। আমরা তো সব মাপা মাপা জীবন নিয়ে আছি। গণ্ডী টেনে বসবাস, তাই জীবনের নানা কথা,বিচিত্র কাহিনী সব জানতে পারি না। আশ্চর্য যত রকম ভাবা যায় ঠিক তত রকমই আছে। কে যেন বলেছিলেন, তুমি এমন কিছু কল্পনা করতে পারবে না, যা এই পৃথিবীতে নেই। কথাটা তখন বিশ্বাস করিনি। আজ এই মুহূর্তে করছি। এই মুহূর্তে ভীষণ ইচ্ছে করছে, ঈশ্বরের পদে নিজেকে উলঙ্গ করে সঁপে দি। বলি, প্রভু, তোমার খেলা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি এই জগৎমঞ্চে ঠেলে ঢুকিয়েছ, আবার ঠেলে বের করে দেবে। পড়ে থাকবে ঘোড়ার ডিম। শাওলাও তার চিহ্ন রেখে যায়, মানুষ কি রেখে যায় প্রভু। মল, মূত্র, বিষ্ঠা, তিক্ততা, বেঁচে থাকার বিষ-বাষ্প। আর রেখে যায় কামনা, বাসনার ভাইরাসে ভরা রক্তের উত্তরাধিকারী। বাঙলায় এত ভাল কথা নেই, ইংরেজীতে যা আছে 'ব্লাড লাইন।'

কত তাড়াতাড়ি মানুষ সুস্থ হয়ে যায়। হাজরা পার্ক থেকে এই সাত আট কিলোমিটার পথ আসতে আসতেই চিন্তা-ভাবনা, স্বভাব, সব পালটে গেল। জীবনে ওই জন্যেই স্থায়ী কিছু করতে নেই। সংসার বলো, প্রেম বলো, বিবাহ বলো। এক মনে করা। মন হল আকাশ। থেকে থেকে তার চেহারা পালটায়। তখন আর ভাল লাগে না। বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

এষার কাছে কমলকে রেখে এসেছি। ছেলেটাকে গ্রহান্তরে নিয়ে গিয়ে মানুষের সংস্পর্শের বাইরে মানুষ করা যেত। নীলুদা বড় ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন।

এষা আজ খুব সুন্দর সেজেছে। স্প্যানিশ মেয়েদের মতো চুনরি করা ফ্রক পরেছে। অপূর্ব দেখাচ্ছে! পরীর মতো। কমল চাপাচুপি দিয়ে শুয়ে আছে। এই অবেলায় শুয়ে কেন? শীত করে জ্বর এসেছে। তা হবে! একশো এক কি দুই!

এষা বললে থার্মোমিটার দিয়েছিল। একশো দুই। না, আর আমি ফেলে রাখব না। আজই এখুনি সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।

এষা বললে,'দাঁড়ান, এই রাতে এই শহরে ছোটাছুটির চেয়ে যত ফী-ই লাগুক, ফোনে কন্‌ট্যাকট করে ডেকে পাঠাই।'

কমল বললে, 'আমার জ্বর এখুনি কমে যাবে বাবা, তুমি ভেবো না। দ্যাখো না, একটু একটু ঘাম বেরোচ্ছে'। এষা কমলের ছোট্ট কপালে হাত রাখল। আমি

পাশে বসে আছি। ছেলেটা কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। পায়ের পাতা দুটো বরফের মতো শীতল।

এষা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমি তাকিয়ে আছি এষার দিকে। মাঝখানে ভিন ভিন করছে মাছির মতো রাত। অসুখ জীবকে বড় অসহায় করে তোলে। যবে সারবে, তবে সারবে। ওষুধ সান্ত্বনা। ভোগের কাল আছে। সেই কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য।

॥ দশ ॥

সোমা এসেছে।

সোমা ও-বাড়িতে ভীষণ অশান্তিতে আছে। সোমার মা কাজকর্ম প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। নীলুদার মাথাটা মনে হয় সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন। যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছেন। কখনও বকবক করে বকে যাচ্ছেন, কখনও চুপচাপ। আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করছে, সোমার মায়ের প্রথম স্বামী এখন কোথায়। নিজের স্ত্রী অন্য কারুর সঙ্গে ঘর করছে দেখলে কেমন লাগে! নিজের পুরুষত্বের ওপর একটা ঘৃণা এসে যায়। নিজেকে মনে হয়, নিন-কম-পুপ। কি করে যে জড়িয়ে পড়লুম এই পরিবারের সঙ্গে! গোপা চলে গেল। বাঁধন কিন্তু রয়েই গেল। এ-বাঁধন কেটে বেরোবার একমাত্র কাঁচি হল, আর একটা বিয়ে করা।

কমলের যা শরীর হয়েছে, তাতে নিজের কথা ভাবার আর অবসর নেই। নতুন স্পেস্যালিস্ট বেশ ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। বলছেন, নেফ্রাইটিস। কিডনি কাজ করছে না। মন-মেজাজ এত খারাপ হয়ে আছে! তার ওপর এই সোমা-সমস্যা।

সোমা এসেই শুয়ে পড়েছে ডিভানে। রাতে একা ঘরে ঘুমোতে পারছে না। যেই ঘুম আসছে, দেখছে সারা গায়ে লকলকে আগুনের শিখা নিয়ে কালু নেচে বেড়াচ্ছে ছিন্নমস্তার মতো। নীল ধোঁয়া হিলহিল করছে। সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করা। নিঃশ্বাসে মধ্যবয়সের ভারি বুক ওঠা-নামা করছে ধীরে ধীরে। মুখে ভেসে উঠেছে নিশ্চিন্ত প্রশান্তি। যত ভাবি দুর্বল হব না, একটু শক্ত হব, পারি না কিছুতেই। মাথার তলায় বালিশ নেই। উঠে গিয়ে আস্তে একটা বালিশ ঠেলে দিয়ে এলুম। ক্ষণেকের জন্যে চোখ খুলে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কমল ঘুমিয়ে পড়েছে ও-ঘরে। ওকে কিছু খাওয়ানোই এক মহা সমস্যা। ক্ষিদেটা একেবারেই চলে গেছে। জোর করে খাওয়ালে সব তুলে দেয়। ক্রমশই বেশ জড়িয়ে

পড়ছি। গোপা ছিল, সংসার নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন হত না। সেই জীবন এখন এই জীবনের ওপর শোধ নিচ্ছে। মুক্তির একটা রাস্তা খুঁজতেই হচ্ছে। না কি এই বন্ধনটাকেই মেনে নিয়ে প্রমাণ করতে হবে, আমি দায়িত্বশীল, আদর্শ এক পিতা। কি যে কি, এখনও সঠিক বোঝা হল না। মনের এই ভাঙ্গাগড়ার কূলকিনারা পাই না।

কোলে কাগজ ফেলে চুপচাপ বসে আছি। দুপুর ক্রমশই এগিয়ে চলেছে বিকেলের দিকে। একটা লাইনও পড়তে পারছি না। গভীর জলের তলায় রোবট হন্যে হয়ে খুঁজছে ভেঙ্গে পড়া বিমানের ব্ল্যাক বকস। পাঞ্জাবে এত সমস্যা! পশ্চিমবাংলায় শরিকী লড়াই। আসাম। শ্রীলঙ্কা। গুজরাট। কোনও কিছুতেই মন বসছে না। কি নিশ্চিন্ত আরামে, কত নির্ভরতায় গোপার বোন, আমার শ্যালিকা সোমা শুয়ে আছে। এ যেন বাঘের ঘরে হরিণীর নিদ্রা। জানে না আমি তাকিয়ে আছি অপলকে। সুন্দর, ঢালু, চুলের পাড় বসানো কপাল। মাঝখানে খয়েরী টিপ। ভরাট গাল। টিকলো নাক। দীর্ঘ আঁখি-পল্লব। একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে তোলা, আর একটা পা সটান। বড় মায়াবী ধরন। যখনই মনে হচ্ছে এযার মায়ের কথা, সোমার আকর্ষণ তত তীব্র হচ্ছে। সেই একই রক্ত বইছে শরীরে, যে রক্ত সোমার মাকে ঘর ছাড়া করেছিল। কত রাত মহিলা তঞ্চকতা করেছেন প্রথম স্বামীর সঙ্গে। এইরকম কত নির্জন, শান্ত দুপুরে আমার মহামান্য শ্বশুরমশাই ছুটে যেতেন একডালিয়া প্লেসে বন্ধুর বাড়িতে। সেদিন এষা যেমন জানালায় জানালায় পর্দা টেনে দুপুরের ঘরে আঁধার এনেছিল, সেইভাবে সুন্দরী পর্দাটানা ঘরে স্বামীর বন্ধুর সেবা নিতেন আদুরে বেড়ালের মতো। এই সেই মেয়ে। যার যৌবন চির বিদায়ের আগে হাহাকার করছে। সোমা তার মায়ের মতো নয়, তবু তো গর্ভজাত। ভেতরে উদ্দামতার বীজ আছে। খরায় ফেটে আছে মাটি। নীরব চাওয়া, জল দাও, জল দাও। যাদের ঘিরে প্রশ্ন আছে সেখানেই ইচ্ছে করে উত্তর খুঁজতে। যে অঙ্ক মেলেনি, সেই অঙ্ক নিয়েই তো যত কসরত।

সোমার ঘুমন্ত মুখের প্রশান্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভেতরটা বড় নরম হয়ে এল। এই পৃথিবীতে অর্থ আর বাহুবল থাকলে সবই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না, স্নেহ আর ভালবাসা। আমিও শিঁসঙ্গ, সোমাও তাই, কমলের অবস্থা তো আরও খারাপ। শিশুর কল্পনা ছাড়া, সঙ্গী তার কেউ নেই।

সোমার মাথার কাছে বসে কপালে হাত রাখলুম। একটু গরম লাগল। সামান্য জ্বর হয়েছে হয়তো। সোমার ঘুম খুব পাতলা। বাঁহাত দিয়ে মাথার তলা থেকে বালিশটা টান মেরে ফেলে দিয়ে, মাথাটা আমার কোলে তুলে দিল।

এই দুপুর! সেই দুপুর! পনের বছর আগে, আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম বালিভাসা ফরেস্টে। তখন প্রেম ছিল, পাপ ছিল না। এখনও পাত্রের তলায় প্রেমের তলানি চিকচিক করছে। তবে সেই সারসের ভোজসভায় শৃগালের অবস্থা আমার। জিভ পৌঁছচ্ছে না।

সোমা দু'হাত আমার কোলের পাশ দিয়ে টানটান করে আড়ামোড়া ভাঙল। বুঝতেই পারছি, বেশ জ্বর আসছে। দু'হাত দিয়ে আমার গলাটা পেঁচিয়ে, মুখটাকে নামিয়ে আনল নিজের মুখের কাছে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। শরীর টানটান। বেশ বুঝতে পারছি, সোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মাথাটা আমার কোল থেকে সামান্য ওপরে তুলে, ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাল। অনেকক্ষণ আমরা সেইভাবে রইলুম। আমার ঘাড় টনটন করছে। তুলতে পারছি না। সোমা এমনভাবে ধরে রেখেছে। গোপার বোন সোমা। মুখের আদলে মিল আছে। মিল নেই স্বভাবে।

একসময় প্রশ্ন করলুম, 'কি চাইছ?'

ফিসফিস করে বললে, 'আমাকে মেরে ফেলুন। ছিঁড়ে খুঁড়ে, কুটিকুটি করে দিন।'

'ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'ফলের।'

'পথ খোলা আছে।'

'তুমি আমাকে ঘৃণা করো।'

'ঘৃণা আর ভালবাসায় কোনও তফাৎ নেই। যাকে চাই, সে কাছে না এলে ঘৃণা হয়। কাছে এসে দূরে না গেলে ঘৃণা হয়। ভীষণ মাপা সব। একচুল এদিক ওদিক হলেই ভালবাসা ঘৃণা, ঘৃণা ভালবাসা।'

আমার দুটো হাত টেনে নিয়ে সোমা তার বুকের ওপর চেপে ধরল।

পাখা ঘোরার শব্দ হচ্ছে। ঘড়ি চলছে টিকটিক করে। যা ভয় করেছিলুম, তাই হতে চলেছে না কি! পাখি কি উড়তে গিয়ে, বারেবারেই এমনিভাবে ডানা মুড়ে পড়ে যাবে! মানুষের মধ্যে এ কোন পশুর বাসা! কিছুতেই স্থির হতে দেয় না। থেকে থেকে বেরিয়ে আসে অদৃশ্য পশু, অদৃশ্য গুহা থেকে। অতৃপ্ত, অশান্ত, অন্ধ।

সোমা ফিসফিস করে আবেগ জড়ানো গলায় বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

কত সহজে আপনি থেকে নেমে এসেছে তুমি-তে। এরপর অবশ্য আপনি বলা যায় না।

'কমলকে একবার দেখে আসি। একা শুয়ে আছে ও-ঘরে।'

বিছানায় কমল নেই। কমল বারান্দায় বসে আছে। দূরে দূরে গাছের মাথায় মাথায় পড়ন্ত বেলার রোদ খেলা করছে। একটা কাক এসে বসেছে বারান্দার রেলিং-এ। কক কক করে ডাকছে মাঝে মাঝে।

কমল কাকের সঙ্গে কথা বলছে, 'চুপ করে বোসো, আমি ঠিক এক পাতা লিখব, তারপর তোমাকে বিস্কুট খেতে দোব। তোমার আর কি বলো! হোমটাস্ক না করলে দিদি তো আর তোমাকে বকবে না, বকবে আমাকে।'

সামনে বই, খাতা, কলম ছড়ানো। কমল বসে আছে থেবড়ে।

'কমল?'

চমকে মুখ তুলে তাকাল।

'তুমি এই রোদের ঝাঁঝে বসে কি করছ! আবার জ্বর বেড়ে যাবে বাবা।'

'বিকেল হয়ে গেছে বাবা! ওই দ্যাখো, হলুদমাসিদের বাড়ির ছাদে শালিক এসে বসেছে।'

'শালিক এসে বসলে বিকেল হয়ে যায় বুঝি?'

'হ্যাঁ গো। ওরা বসে বসে দেখে কখন সূর্য ডুবে যাবে, তারপর সব চলে যাবে বাসায়। তুমি শুনলে না, এইমাত্র কাকটা বলছিল, কমল খেতে দাও, আমি বাড়ি যাবো।'

'তুমি পাখির ভাষা বোঝো?'

'তুমি বুঝতে পারো না?'

'না বাবু।'

'তুমি আর ঘুমোবে না?'

'আমি তো ঘুমোই নি।'

'আমি যে দেখলুম।'

'ও ঘরে তুমি গেলে না কেন?'

'আমি তো কোনও শব্দ করিনি বাবা!'

'শব্দ? শব্দের কথা বলছ কেন?'

'আমি না খুব আস্তে আস্তে দরজায় দু'বার শব্দ করেছি। আর তো করিনি বাবা। তুমি সেই একদিন বলেছিলে, ঘুমোবার সময়, লেখার সময় বিরক্ত করতে নেই।'

সোমা এসে দাঁড়াল পাশে, 'কি বলছে কমল?'

'ও একা একা এখানে বসে লিখছে।'

'কি লিখছ তুমি? বাবার মতো গল্প!'

সোমা কমলের পাশে বসল, গা ঘেঁষে। কেমন মানান? মা আর ছেলে বলে কি মনে হচ্ছে? সোমার মুখ কি মায়ের মুখের মতো দেখাচ্ছে?

সন্ধের কিছু আগেই সোমা চলে গেল। বলে গেল, এখানে এসেই থাকবে ছুটির বাকি কটা দিন। আমার এই ক্ষুদ্র আয়োজন ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। হাবেভাবে মনে হল, সোমাও এখন তীর খুঁজছে। নৌকো আর কতকাল ভেসে বেড়াবে। সব মাঝিরই ক্লান্তি আসে।

কমলকে বললুম, 'বুড়ো, তুমি একটু ছটোপাটি করে বেড়াও না, সব সময় অমন একা একা মন খারাপ করে বসে থাকো কেন? তোমার এত দুঃখ কিসের?'

কমল বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বাচ্চা ছেলে বুড়োটে স্বভাবের হয়ে গেলে ভীষণ রাগ হয়। কমলের এই পাকামো আমার কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। সোমাকে যদি বিয়েই করি কমলকে আমি একটা ভালো আবাসিক স্কুলে দিয়ে দোব। জানি অনেক খরচ। সোমাকে বলব কলকাতার কোন স্কুলে চাকরি নিতে। ধরাকরা করলে হয়ে যাবে। সোমা এযার চেয়ে অনেক ঘরোয়া। এযা কিন্তু কমলকে অনেক বেশি আপন করে নিয়েছে। কমলও এযাকে ভীষণ পছন্দ করে। আশ্চর্য! দু'জনেরই মায়ের অতীত ঘোলাটে। সোমার মা ঢাকতে পেরেছেন। এযার মা ছিটকে বেরিয়ে গেছেন। বেঁচে আছেন কি-না, তাও তো জানি না।

কমলকে বললুম, 'চলো বেড়িয়ে আসি।'

কপালে হাত রেখে মনে হল ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। গোপার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। এমন একটা অপলকা, শৌখিন ছেলে রেখে যাবার কি মানে হয়। সারা বছরই, এটা ওটা সেটা লেগেই আছে। শুধু দেহ নয়, মনটাও ভীষণ নরম। কথার একটু এদিক ওদিক হলেই অভিমানে ঠোঁট ফোলে। বড় চাপা স্বভাবের। কমলকে নিয়ে চলা দেখছি খুব কঠিন হয়ে উঠছে।

কপাল দেখে বললুম, 'থাক। বেরিয়ে কাজ নেই। আয় লুডো খেলি দু'জনে।'

কমলের জন্মদিনে কালু তার সামান্য পয়সা থেকে এই লুডো কিনে উপহার দিয়েছিল। চন্দনের টিপ পরিয়েছিল। গলায় ফুলের মালা পরিয়েছিল। পায়েস করে খাইয়েছিল। এই তো মাত্র মাসকয়েক আগের কথা। এ-পাশে আমি, ও-পাশে কমল। মাঝখানে ছক। কমল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে ছকটার দিকে। টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল ছকের উপর। কমল তাড়াতাড়ি মুছে নিল হাত দিয়ে।

'এ কি তুমি কাঁদছ কেন ?'

কমল মুখ তুলল। দু'চোখে টলটল করছে জল। ঠোঁট দুটো কাঁপল। শব্দ বেরলো না। কালুপিসির কথা মনে পড়েছে। আমি যদি বলতুম, কালু অত বড় ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুরছ, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে যে ! কালু অমনি কমলকে বুকে চেপে ধরে বলত, এই বুড়োটা আমার কোলে চড়ার জন্যেই জন্মেছে মেজদা। সেই কোল আজ কোথায় গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ছক মুড়ে রেখে কমলকে কোলে তুলে নিলুম। বহুকাল পরে কমল আমার বুকে। বড় হালকা হয়ে গেছিস বুড়ো। একেবারে ফং-ফং-এ। কমল আড়ষ্ট হয়ে আছে। ধরা-ধরা গলায় বললে, 'আমাকে নামিয়ে দাও বাবা। তোমার কষ্ট হবে।'

'তোকে কোলে নিলে কষ্ট হবে ! আমার কত ভাল লাগছে জানিস ! তুই যে আমার সব, বুড়ো।' বাকি কথা মনেই রয়ে গেল। তোর চেয়ে আপন আর কে আছে আমার এই পৃথিবীতে। যেদিন চিতায় উঠব সেদিন তুই যে আমার ঠোঁটে আগুন ছোঁয়াবি।

কমলকে কোলে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। সামনে এযাদের বারান্দা। এযা হঠাৎ বেরিয়ে এল। কমলকে আমার কোলে দেখে বললে, 'এ কি কমলবাবু তুমি বাবার কোলে চড়েছ ! কি মজা ! আমাকে কোলে নেবার কেউ নেই।'

কমলের মুখে হাসি ফুটেছে। মুচকি হেসে বললে, 'তুমি তো বড় হয়ে গেছ !'

এযা বললে, 'আমার কাছে তিনখানা টিকিট আছে সিনেমার, যাবেন। কি হবে মনমরা হয়ে বাড়িতে বসে থেকে !'

'কমলের গাটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।'

'করুক। কিছু হবে না। যত ওই ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকবে তত শরীর খারাপ হবে। গেট রেডি।'

গ্লোবের তিনতলায় বসে আছি পাশাপাশি তিনজন। আমাদের দু'জনের মাঝখানে কমল। ভেতরটা ঝলমল করছে। মোলায়েম ঠাণ্ডা। সামনে পর্দা। তেমন ঠাসা ভিড় নেই। জীবজন্তুর ছবি। বিউটিফুল পিপল। এযাকে আজ অসম্ভব স্মার্ট দেখাচ্ছে। এযার মতো মেয়ের সঙ্গে বাইরে বেরতে বেশ লাগে। বোঝার মতো মনে হয় না। বরং নিজেকেই মনে হয় একটা বোঝা।

কমলের কপালে হাত রেখে এযা বললে, 'টেমপারেচার নর্মাল। কমলের শরীর খারাপের কারণ ডিপ্রেসান। বেশ একটু চিয়ারফুল রাখতে পারলে শরীরটা সেরে যায় !'

কমল হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসে আছে। এযাই কমলকে

সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে। একেবারে সায়েববাচ্চার মতো দেখাচ্ছে। কমল আপনমনে একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে চকোলেট খাচ্ছে। একটা একটা করে আসন পূর্ণ হতে হতে সামনের দিকটা প্রায় ভরে গেল। ধীরে ধীরে আলো কমে আসছে। ছবি শুরু হয়ে গেল। কমলের ভীষণ ভালো লাগছে। চোখ দুটো চকচক করছে। মাঝে মাঝে চেয়ার ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফেরার পথে গাড়ির পেছনের আসনে কমল ঘুমিয়ে পড়ল ফুরফুরে বাতাসে। ফাঁকা রাস্তা। এযা টপ স্পিডে চালাচ্ছে। অর্ধেক কলকাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। মানুষের মনে আর তেমন সুখ নেই, তাই শহর আজকাল তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। গাড়ি চালাতে চালাতে এযা বললে, 'অনেক দিন মনে থাকবে এই রাতের স্মৃতি। সময়টা বড় সুন্দর কাটল।'

'কেন, আমরা তো মাঝে মাঝেই রিপিট করতে পারি।'

'দুঃসংবাদই বলুন, আর সু-সংবাদই বলুন, আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছেন ? কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?'

'আমেরিকায় ?'

'আমেরিকায় কেন ?'

'পড়তে।'

'কই, আপনি তো আমাকে বলেননি।'

'আজ ফাইনাল হল।'

'কবে ফিরবেন ?'

'আফটার ফাইভ ইয়ারস। তবে কোথায় ফিরবো জানি না। মামাও বোধহয় দেশ ছাড়ছেন।'

'যাঃ, হয়ে গেল। তাসের ঘর ভেঙে পড়ে গেল।'

'পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'পাঁচটা বছর না হয় কিছু নয়, কিন্তু মামা যদি চলে যান !'

'আপনি তো থাকছেন !'

'কিন্তু ওখানে আমার কথা কি আর মনে থাকবে ! কত কি ঘটে যেতে পারে জীবনে !'

'তা অবশ্য পারে। অস্বীকার করছি না। আবার এমন কথাও বলছি না, যে জীবনটা আপনার কাছেই বাঁধা পড়ে গেছে। এইরকমই হয়। দেখা হয়, পরিচয় হয়, কিছুকাল কাছাকাছি, তারপর ছাড়াছাড়ি।

গোটা জীবনটাই তো তাই। যত দীর্ঘই হোক বিচ্ছেদটাই সত্য। হয় এ যাবে, না হয়, ও যাবে। একসঙ্গে এলুম, একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেলুম তা যে

হবার নয়।'

'আমার দিকটা ভেবে দেখেছেন? একটা মানুষ কতবার হারাতে পারে, কতবার হারতে পারে?'

'তা বললে চলে? যে খেলার যা নিয়ম। তবে একটা কথা বলি, ওই মেয়েটিও ভালো।'

'কে, সোমা?'

'হ্যাঁ, আপনার শ্যালিকা।'

'যা ভাবছি তা হয় না, না?'

'অত বড় স্যাক্রিফাইস কি আমার দ্বারা হবে! আমেরিকার আকর্ষণটাই আমার কাছে প্রবল।'

'একটা ব্যবস্থা করে আমিও যদি যাই!'

'কমল?'

'হ্যাঁ, কমল।'

চুপচাপ দু'জনে। চাকার তলায় মাইল গুটোচ্ছে। শহর পাকিয়ে যাচ্ছে কালো ফিতের মতো।

'আচ্ছা ভালোবাসা বলে কিছু আছে?'

এষা বললে, 'অবশ্যই আছে, তবে একই বস্তু বা মানুষকে বেশি দিন ভালোবাসা যায় না। একঘেয়েমি এসে যায়। বস্তু পালটাতে হয়, মানুষ পালটাতে হয়।'

'এ যে খুব সাংঘাতিক থিওরি! তাহলে, আজ যাকে ভালবেসে বিয়ে করা হল, কিছুদিন পরে তাকে কি করা হবে!'

'ভালবাসা শুকিয়ে যাবে। তখন সহ্য করে নিতে হবে। বয়ে বেড়াতে হবে। অ্যাডজাস্টমেন্ট করে বাঁচতে হবে। সেই কারণে যাকে সত্যিকারের ভালবাসা যায়, তাকে বিয়ে করা উচিত নয়। দৈহিক মিলন হল ঘৃণার অভিব্যক্তি। সাবজুগেসান।'

'কি বলছেন আপনি?'

'থিংক ইট ওভার। আপনি পারবেন আপনার মাকে, কি মেয়েকে নিরাভরণ করতে! পারবেন না। লাস্ট ইজ এ ফর্ম অফ হেট। প্রকৃত ভালোবাসা হল শ্রদ্ধা, স্নেহ আর মমতার মিক্শ্চার।'

'তাহলে?'

'তাহলে, যা ভাবছেন ঠিক তাই। আপনি আমাকে ভালোবাসেন না, ঘৃণা করেন। আমাকে টেনে, ছিঁড়ে ফালাফালা করতে চান, সেইটাই আপনার মজা।

সেই কারণে প্রথম সুযোগেই আপনি আমাকে খুলে ফেলেছেন। আর আপনি কত দুর্বল, কত অন্তঃসারশূন্য, সেইটা বোঝার জন্যে আমিও আপনাকে খেলিয়েছি। ভালবাসা নয়, দিস ইজ এ গেম অফ পাওয়ার। আমি ইচ্ছে করলে, সারা জীবন আপনাকে ক্রীতদাস করে রাখতে পারি, কারণ আপনি কত দুর্বল আমার জানা হয়ে গেছে। আপনি কত ভাগ পশু, কত ভাগ মানুষ, সেই রেশিও আমার কষা হয়ে গেছে। আপনি একজন মিডিওকার মধ্যবিত্ত। একজন মানুষ সেন্টপারসেন্ট স্পিরিচ্যুয়াল না হলে, জীবনের পূর্ণ স্বাদ পেতে পারে না। উইদাউট স্পিরিচ্যুয়াল রিয়েলাইজেশান হি ইজ এ স্যাটেড বুটেড ডগ!'

আমার দু'কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে, দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে যাই।

এষা বাঁদিকে একটা ধারালো বাঁক নিয়ে বললে, 'জানি, আপনি ভীষণ অপমানিত বোধ করছেন। অসন্তুষ্ট হয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক। আপনার কমপিউটারে যা ডাটা ফিড করা আছে, তাতে আপনি সব সময় একই ধরনের মিথ্যা শুনতে চান। সবাই তাই চায়। কিছু কাজের মিথ্যা হলেও অভ্যস্ত কিছু ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়ান। যেমন চুম্বন মানে ভালবাসা, দৈহিক মিলন মানে আরও গভীর ভালবাসা। অল ফলস্। অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে চারপাশে, স্বামী আর স্ত্রী দু'জনে দু'জনকে ভীষণ ঘৃণা করে, অথচ তাদের সন্তান জন্মায়। জুতো পেটার পর মুহূর্তেই তারা উন্মাদের মতো মিলিত হয়। প্রেমিক মানুষ পৃথিবীতে তিন চারজনই এসেছিলেন, জেসাস, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য। প্রেমে মানুষ নিষ্কাম হয়। ডোন্ট মাইন্ড। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি মন ভোলান কথা বলতে পারি না। আই সে হোয়াট আই ফিল।'

এই ধরনের চড় আমি জীবনে খাইনি। সেই রাতে এষাকে আমি যত না নগ্ন করেছি, এষা আমাকে তার চেয়ে শতগুণ বেশি নগ্ন করে রেখে গেছে। অস্থি, মজ্জা সব বের করে এনেছে এই মাংসল মধ্যবয়সী শরীর থেকে। শুয়ে আছি নরম বিছানায়, পাশে বেঁহুস কমল, ছটফট করছি, এপাশ ওপাশ করছি। এষার শেষ কথা কানে ভাসছে, 'আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসতেন, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর হয় আত্মহত্যা করতেন না হয় সংসার ত্যাগ করতেন।'

বড় দ্বিধায় পড়ে গেছি। বড় সংশয়। আমরা তাহলে মূর্খের মতো মিথ্যার বৃত্তে গোল হয়ে ঘুরছি! পৃথিবীতে ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। হয়তো তাই। কেবল সংঘাত। রাজ্য দখল, ভূমি দখলের লড়াই। জরু আর গরু আর এক চিলতে জমি সংসারের সূচনা। আধিপত্য বিস্তার। আমি তোমার ওপর, তুমি আমার

ওপর। শাসক শাসিতের ওপর, বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তির ওপর, স্বামী স্ত্রীর ওপর, পিতা পুত্রের ওপর। হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড ইজ হিস্ট্রি অফ ডমিনেশান।

এষা আমাকে বিছানা ছাড়া করে দিলে। বারান্দায় এসে বসলুম। চাঁদিনী রাত। চারপাশে রাত একেবারে গমগম করছে। নিজের মুখোমুখি হবার এই তো সময়। ফটিক দাশ, তুমিও তো ঘৃণার কারবারী, প্রেম থেকে ব্যভিচার, ব্যভিচার থেকে বলাৎকার, রাজনীতির হিং, ধর্মটর্ম বাদ, ধরো, ফেলো, করো, বেস্টসেলার। শিক্ষিত মানুষকে কতটা ঘৃণা করলে, সাহিত্যের এই ফর্মুলা মগজে আসে। উপন্যাসের নাম রাখতে হবে 'বলদ'। কে এক সঞ্জীব ছাগল লিখে ক্যাণ্টার করেছে, তারই বদলা নিতে হবে বলদে।

'বাবা!'

'কিরে, ঘুমোসনি বুড়ো!'

'বাবা, আমাকে একটু জল দেবে, ঠাণ্ডা জল।'

'জল খাবি? চল।'

নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়ি। যেখানে যেখানে আলো জ্বালছি, সেইখান থেকে অন্ধকার যেন বাদুড়ের মতো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। চারপাশে যেন রাতের সেতার বাজছে ঝিনঝিন করে। ফ্রিজের নরম আলোয় হিম বাষ্প হিল-হিল করছে। বোতলের গায়ে জমা জলের চাদর। একের চার ঠাণ্ডা, তিনের চার সাদা জল মিশিয়ে কমলকে দিলুম। ঢকঢক করে খেয়ে কলের দিকে ছুটছিল গেলাস ধুতে।

'দে আমার হাতে দে, তোকে কে ধুতে বলেছে!'

'আমি ভাঙবো না বাবা।'

'আচ্ছা, কে ভাঙার কথা বলেছে বাবা!'

শোবার ঘরে এসে বললুম, 'কি, এবার শুবি তো?'

'তুমি শোবে না বাবা?'

'আমার ঘুম আসছে না কিছুতে।'

'তুমি শোও। আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দি।'

'দূর পাগলা! চল, শুয়ে শুয়ে তোর সঙ্গে গল্প করি।'

কমলকে পাশে টেনে নিলুম। নরম ছোট্ট শরীর। মুখে একটা ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ।

'বুড়ো, তুই আমার সঙ্গে অমন করিস কেন?'

'বাবা, তুমি আমাকে রান্না করা, চা করা শিখিয়ে দেবে?'

'কেন রে?'

'তাহলে, তোমার অনেক কষ্ট হবে না।'

'আমার আবার কষ্ট কি রে? দেড় জনের রান্না। এই এতটুকু ভাত, এক হাতা ডাল, একটা তরকারি। এক ঘণ্টায় শেষ। শোন, ওসব সংসারের কথা ছাড়। বরং চল, আমরা দু'জনে দিন কতক কোথাও বেড়িয়ে আসি মজা করে।'

'কোথায় যাবে?'

'যেখানে পাহাড় আছে, কুলকুল নদী আছে, বন আছে।'

'হ্যাঁ, চলো যাই। এ জায়গাটা বিচ্ছিরি। বাজে। মাসিকে নিয়ে যাবে?'

'না, শুধু তুই আর আমি। বুড়ো আর শ্রীকান্ত। ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে ঝিকঝিক করে আমরা চলে যাবো।'

'জায়গাটার নাম বলবে বাবা? নীল পাহাড়, ছোট নদী, বন। অনেক পাখি থাকবে?'

'প্রচুর প্রচুর। সারাদিন আমরা পাখির ডাক শুনবো, আর নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াব আপন মনে। কি মজাই যে হবে বুড়ো!'

'মাকে একা রেখে যাবে?'

'মা? মা কোথায়?'

'ওমা, তুমি জানো না, মা তো ছবিতে!'

'ছবিটা আমরা নিয়ে যাবো।'

কমলের হাই উঠল। মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। অগাধ ঘুম। আর আমি শুনছি ঘড়ির শব্দ। কট কট করে সময়, জীবন কাটছে। সেই কাবার্ডের মধ্যে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা আছে মহিলার রাত্রিবাস, অন্তর্বাস। আমি কিন্তু এষাকে ভালবাসি। এই এত কাটাকাটা কথার পরও বাসি। কিন্তু লাভ কি! জানতুম, আমি চাইলেও সে আসবে না।

সকালেই ছুটলুম আমার বন্ধু নয়নের কাছে। রেলে চাকরি করে বড় পোস্টে। দাড়ি কামাচ্ছিল। মা আর ছেলের সংসার। বিয়ে করেনি, করবে না। ভালো লাগে না। মা ছাড়া যে কোনও মহিলাই তার কাছে অসহ্য। চুলের গন্ধ সহ্য হয় না। এমন কি শরীরে চুলের স্পর্শ লাগলে অ্যালার্জি হয়।

'বোস। কি মনে করে এই সকালে?'

'স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া একালের মানুষ এক পাও চলে না।'

'আজ অফিস নেই?'

'ছুটিতে।'

'বলে ফেল কি প্রয়োজন? নিশ্চয় রেলের টিকিট।'

'শুধু টিকিট নয়, যাবার জায়গাও। এমন একটা জায়গা বেছে দাও, পাহাড়

থাকবে, নদী থাকবে, বন থাকবে, নির্জন এবং কাছাকাছি। প্লাস স্বাস্থ্যকর।'

'সায়েবগঞ্জ।'

'কোথায় থাকা?'

'রেলের কোয়ার্টারে। আমি লিখে দোব।'

'খাওয়া?'

'সঙ্গে মহিলা নিয়ে যাও। মনের আনন্দে খাবে-দাবে আর ফুর্তিসে বেড়াবে।'

'মহিলা পাবো কোথায়?'

'জোগাড় করো।'

'হোটেল নেই?'

'পেটে সহ্য হবে না।'

'বেশ, ব্যবস্থা করে দাও।'

'সেভেন ডেজ টাইম। কেটে পড় এখন। আমাকে বেরোতে হবে।'

নয়নের বাড়ি থেকে বেরোতেই রাস্তায় তুষারের সঙ্গে দেখা। সেই বিচিত্র গাড়ি চড়ে ধরধর করে চলেছে। গাড়ি থামিয়ে বললে, 'এখানে কি করছিস? রেল কোয়ার্টারে!'

'নয়ন।'

'ও প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে?'

'তুই চললি কোথায়?'

'ধান্দায়। আয় উঠে আয়। চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোর ছেলেটাকে দেখিনি অনেক দিন।'

'আমার বাড়িটাও তো তুই দেখিসনি।'

'শুনেছি, খুব জবরদস্ত করেছিস। তবে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। অনেক টাকার ব্যাপার। ব্লকড হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে ফেলে রাখলে মোটা ইন্টারেস্ট। অত টাকা ম্যানেজ করলি কি ভাবে?'

'বারাসাতের বাগানবাড়িটা বেচে দিলুম।'

'বাপের এক ছেলে হবার এই সুবিধে। নো ঝামেলা। তবে বাগানবাড়ি জীবনের একটা রিলিফ। খুব ভুল করেছিস।'

'আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে এখন। আর তো কিছু করার নেই।'

'যাক এবারটা কোনও রকমে কাটিয়ে দে। পরের বার চেষ্টা করিস, যতটা কম ভুল করা যায়। আর ক'বছর আছিস?'

'ম্যাকসিমাম তিরিশ।'

'বাবা তিরিশটা বছর কাটাবি কি করে?'

'তোর?'

'আমার একটা গুড নিউজ আছে। কিডনি ঝামেলা করছে। পাঁচ কি ম্যাকসিমাম দশ। গুডবাই।'

'বেশিদিন বাঁচা একটা বোরিং ব্যাপার।'

'যা বলেছিস।'

তুষার আর আমি সমবয়সী। তুষারকে একটু বুড়োটে দেখাচ্ছে। অ্যামবিশান, অ্যামবিশান, ছেলেটাকে মেরে ফেলে দিলে। বড় হব, বড় হব, জগৎজোড়া নাম চাই, আমাকে ওমুকে ছাপিয়ে গেল, মেরে বেরিয়ে গেল, বিশাল এক অতৃপ্তি নিয়ে সারাদিন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'দাঁড়া। হতভাগাটার জন্যে কিছু কিনি।'

তুষার গাড়ি ভেড়াল বিশাল এক দোকানের পাশে। প্রতিবাদে কাজ হল না। আমি গাড়িতেই বসে রইলাম। তুষার ঢুকে গেল ভেতরে। ব্যাটাকে বেশ ইন্টেলেকচুয়ালদের মতো দেখতে হয়েছে। কাঁচা পাকা একমাথা চুল। পেছনে দুটো পকেট লাগান, হাল কেতার প্যান্ট। তার তলায় গুঁজে পরা হাফ হাতা টিশার্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট। হাতে প্লাস্টিকের চশমার খাপ। পায়ে বিলিতি জুতো। সাংঘাতিক স্মার্ট। তুষারের বেশ একটা পুরুষালী ভাব আছে। দেখলেই কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সাধে মেয়েরা ওর জন্যে পাগল হত। একই সঙ্গে এগারটা মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছিল। তুষার সেই জাল কেটে বেরিয়ে এসেছিল বীরের মতো। পৃথিবীতে করার মতো এত কাজ আছে, মেয়েদের সঙ্গে ন্যাকামো করার সময় নেই।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বোঝাই একটা প্ল্যাস্টিকের সুদৃশ্য ব্যাগ হাতে তুষার বেরিয়ে এল। ব্যাগটা পেছনের সিটে চালান করে দিয়ে স্টার্ট দিল গাড়িতে।

'একগাদা টাকা খরচ করে এলি?'

'শিশুর মুখের হাসির দাম জানিস?'

'না।'

'কোহিনুরের দাম জানিস?'

'না।'

'তাহলে চুপ করে বসে থাক। ব্যাটা কৃপণ!'

কমলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা রেখে গিয়েছিলুম। কি করব! কোনও উপায় ছিল না। এর মধ্যে একজন কাজের মহিলা পেয়েছিলুম। হাবভাব দেখে পছন্দ হয়নি। আজকাল অচেনা কারুকে সর্বক্ষণের জন্যে রাখতে সাহস হয় না।

ভেবেছিলুম কমল দরজা খুলবে। দরজা খুলে দিল সোমা।

'কখন এলে তুমি ?'

'আপনি বেরিয়েছেন, আমিও এসেছি।'

'আমার বন্ধু তুষার। তুষার, আমার শ্যালিকা, সোমা। বেনারসে শিক্ষকতা করে। ছুটিতে এসেছে।' তুষার ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল। পর পর সাজানো, সাদা ঝকঝকে দাঁত, তুষারের আর এক ঐশ্বর্য। সোমা হাসল। অভিভূত হয়ে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তুষারের সেই ভয়ঙ্কর চার্ম আজও আছে। কমেনি একটুও। হিংসে হল। আমাকে টানতে হয়, তুষারের কাছে এগিয়ে যায়। এযা থাকলে কি করত ! সারা পৃথিবী তুষারের একবার ঘোরা হয়ে গেছে। ওর প্রথম ছবি 'বৃত্ত' বিদগ্ধমহলে ভীষণ সমাদৃত হয়েছিল। 'বৃত্ত' নিয়ে ও বিশ্ব ঘুরেছিল।

অস্বস্তি কাটিয়ে তুষার টকটক করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বললে, 'এই বাড়ি তোমার বাঁশ হবে।'

'কেন ?'

'মেনটিনেনস। ট্যাক্স। আজকাল কাজের লোক পাবি না। সব করতে হবে নিজেকে।'

ঘরে ঢুকেই তুষার কমলকে কোলে তুলে নিল। কমল অবাক হয়ে গেছে।

'আমাকে চিনতে পারো তুমি ? পারো না। তোমার অন্নপ্রাশনে আমি অনেক রাতে এসেছিলুম। তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে। মুখে চন্দনের ফোঁটা। তোমার মা সুন্দর সাজিয়েছিল সেদিন। খাইয়েও ছিল সাংঘাতিক।'

তুষার আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি এর কাকা না জ্যাঠামশাই ? আমার চুল কাঁচাপাকা, তোর কাঁচা, অতএব আমি জ্যাঠা।'

কমলকে সাবধানে সোফায় বসিয়ে দিয়ে, তুষার বললে, 'আমি বেঁচে থাকলে, কমলকে আমার ছবির হিরো করব।'

সোমা বললে, 'ছবি ?'

আমি বললুম, 'ও তুমি জান না ? তুষার নিউ জেনারেশানের ডিরেক্টর। ওর বিখ্যাত বই, বৃত্ত।'

'বৃত্ত ? ফ্যান্টাসটিক। অসাধারণ বই। দেখার পর আমি তিন দিন স্তম্ভিত হয়েছিলুম।'

তুষার ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে, খ্যাটখ্যাট করে গ্যাসলাইটার জ্বালাল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। ভাল স্টোরি, অসাধারণ ক্যামেরা। উতরে গেছে। তবে বক্স অফিস পায়নি। আর্ট ফিলম হিসেবে সম্মানটাই

পেয়েছে। ওতে বাংলা ছবি বাঁচবে না। মাস আর ক্লাস দুটোকেই ধরতে হবে। খুব কঠিন অঙ্ক ম্যাডাম।'

নিচু হয়ে প্লাস্টিক-ব্যাগটা কমলের হাতে দিল, 'নাও। মনে হয় এতে তোমার মনের মতো জিনিস পাবে।'

কমল নিতে ইতস্তত করছে। আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে।

বললুম, 'নাও। কাকু দিচ্ছেন।'

তুষার বললে, 'কাকু নয়, জেঠু।'

'আমরা দুজনে সহপাঠী।'

'তাতে কি হয়েছে ! তুমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলে, তাই আমাকে ধরে ফেলেছিলে ক্লাসে। আচ্ছা, আজ আমি যাই। রাইটার্সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মন্ত্রীকে ধরতে হবে। বাড়ি চেনা রইল, আর একদিন আসব।'

সোমা বললে, 'তা হয়, এক কাপ চা তো খেয়ে যান।'

'খুব দেরি হবে ?'

'দেরি কেন হবে ?'

'তাহলে ব্ল্যাক টি।'

তুষার বসে পড়ল পাশে। এক হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরেছে পরম বন্ধুর মতো।

তুষার জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কি হতে ইচ্ছে করে ? বড় হয়ে কি হবে ?'

'রাজা হবো।'

'রাজা !' তুষার প্রাণখোলা হাসি হাসল। 'রাজা হবে কেন ?'

'যুদ্ধ করব বলে।'

কমল এভাবে কোনও দিন তার মনের কথা আমাকে খুলে বলেনি।

'কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?'

'শত্রুর সঙ্গে।'

সোমা চা নিয়ে এল। তুষার চুমুক দিয়ে বললে, 'ফার্স্টক্লাস। অপূর্ব হয়েছে। ভেরি ব্যালেন্সড্।'

দ্রুত চা শেষ করে তুষার চলে গেল। সোমা এগোতে গেল নিচে পর্যন্ত। কমল ব্যাগের গায়ে হাত বোলাচ্ছে আপন মনে।

'খুলে দেখ না কি আছে ?'

'মাসি আসুক বাবা।'

শিশুর সংযম দেখে অবাক হলুম। কি আছে দেখার জন্যে আমার নিজের ভেতরটাই ছটফট করছে।

সোমা এসে বললে, 'ভদ্রলোকের গাড়ি আছে !'

'তা তো থাকবেই। চিত্রপরিচালকের গাড়ি তো থাকবেই।'

'আপনি গাড়ি কিনবেন না ?'

'আমি ? আমার মুরোদে কুলবে না।'

'ভাল উপন্যাস লিখুন খান দশেক। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের মতো লিখতে পারেন না ?'

'লেখা কি অত সহজ, সোমা !'

'শনিবার সন্ধেবেলা আসবেন বলে গেলেন।'

'আর এসেছে !'

'আমাকে একদিন আউটডোরে নিয়ে যাবেন। কথা দিয়েছেন।'

'নিয়ে গেলে ঘুরে এস।'

'কথা বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, আপনার যেন মত নেই।'

'এ-ব্যাপারে আমার মত-অমতের কি আছে ? তোমার ভাল লাগলে যাবে। না লাগলে যাবে না। তোমার ব্যাপার। আমার নাক গলাবার কি আছে !'

সোমার মুখ গম্ভীর হল।

হঠাৎ বলে বসল, 'সত্যি আপনি ছোটলোক। নিচ। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শেখেননি। মনের খবর রাখেন না। দেহের খবরই রাখেন !'

'আর তুমি খুব ভদ্র !'

'রান্নাঘরের কাবার্ডে কি ভরে রেখেছেন ? আপনার লজ্জা করে না ?'

কমলের দিকে চোখ পড়ে গেল। কাঁদো কাঁদো মুখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এক পুরুষ আর বেহায়া মহিলাটির দিকে। ছি ছি, এ আমি কি করছি। আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ! না মাথা খারাপ নয়, আমাদের গ্রহ। আমার আর কমলের গ্রহ। আমার স্ত্রীবিয়োগ, কমলের মাতৃবিয়োগ, একই গ্রহের কারসাজি। সব ঝেড়ে ফেলে কমলের মুখ চেয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

শান্ত গলায়, যতটা দৃঢ় হওয়া যায়, ঠিক ততটাই দৃঢ় হয়ে সোমাকে বললুম, 'তুমি এই মুহূর্তে এই বাড়ি থেকে চলে গেলে আমি খুশি হব সোমা। ভীষণ খুশি। তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে। তুমি শিক্ষিকা, তুমি শিক্ষিতা, তোমার সামান্যতম সভ্যতা, ভদ্রতা, কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুমি কমলের সামনে এ-সব কি বলছ ?'

সোমা বিকৃত গলায় বললে, 'তাই না কি ! কমলের সামনে ? আর কমল যখন সব টেনে টেনে বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, মাসি এ-সব কি ! পরীদের পোশাক কে ফেলে গেল মাসি !'

কমল ভয়ে ভয়ে সোফা থেকে নামছে। বিবর্ণ মুখ। কাঁপছে, 'না বাবা না। মাসি এসেই চা চাপিয়েছিল। চিনির কৌটো পাচ্ছিল না। আমাকে বললে খুঁজে দেখ। আমি যেই ওটা খুলেছি, ব্যাগটা পড়ে গেল। মাসি অমনি কি রে ওটা বলে সব টেনে টেনে বের করল।'

কমল প্রায় কেঁদে ফেলেছে। 'আমি করিনি বাবা ! আমি তোমার কোনও জিনিসে হাত দি ? তুমি না বললে আমি কিছু খুলি ?'

দু হাত দূরে কমল। বিবর্ণ মুখ। দু চোখে টলটলে জল। আমারই ছেলে আমার সামনে অপরাধী ভৃত্যের মতো কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন ওর কেউ নেই ! পথ থেকে উঠে এসেছে। আমি পিতা নই, আশ্রয়দাতা প্রভু। গোপার মৃত্যুর পর একবার, একদিন, ভীষণ রেগে গিয়ে, ভীষণ মেরেছিলুম। আমাকে না বলে দুপুরে সামনের পথে বেরিয়ে গিয়ে, 'বেলুনওলা', 'ও বেলুনওলা' বলে চিৎকার করছিল। আমি তখন উদ্‌ভ্রান্তর মতো দিন কাটাচ্ছি। চারপাশ ফাঁকা। থান কাপড়ের মতো সাদা। চতুর্দিকে গোপার স্মৃতি। ডাকামাত্রই কমল চলে এলে মার খেত না। রঙিন বেলুনের নেশায়, গাড়ি ঘোড়ার রাস্তায় একা ছুটছে। প্রথমে চড়। চড় মেরেও রাগ পড়ল না। পায়ে ছিল হাওয়াই চপ্‌পল। সেই চপ্‌পল খুলে কমলের পিঠে ফটাফট্ মারছি আর বাড়ির দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছি।

যখনই মনে পড়ে সেই কথা, শিউরে ওঠে আমার শরীর। অমন একটা জঘন্য কাজ কি করে করতে পেরেছিলুম। কমলের সাদা পিঠে আঘাতের লাল জড়ুল, চাকের মতো হয়ে আছে। একটুও কাঁদেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল। পরে আমি নিজের উরুতে যত জোরে নিজেকে মারা সম্ভব, তত জোরে মেরে দেখেছিলুম। পুরো একটা দিন ব্যথায় পা নাড়াতে পারিনি।

আজ এই মুহূর্তে কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে ভেসে উঠছে সেই স্মৃতি। দাঁতে দাঁত চেপে আছে কমল। পেছনে আমি এক জানোয়ার, প্রাণপণ শক্তিতে মেরে চলেছি অসহায় এক শিশুকে। প্রতিটি আঘাত ফিরে আসছে আমার দেহত্বকে নয়, হৃদয়ে।

রোজই মনে পড়ে একবার করে। মানসিক যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে যায়। গলা বুজে আসে। কেউ বুঝতে পারে না। নিজের কৃতকর্মে নিজেই যন্ত্রণা পাই। চোখে জল এলেও ধরতে পারে না কেউ। আজ কিন্তু আমি দু'জনের সামনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললুম।

সোমা ভাবলে, আমি বোধ হয় তার আক্রমণে মেয়েদের মতো প্যানপ্যান করে কান্না জুড়েছি। আমি কেন কাঁদছি আমিই জানি। কয়েক বছর পেছিয়ে

গেছি আমি বিশেষ একটি সময়ে। প্রতিটি আঘাত প্রবলতর হয়ে ফিরে আসছে।

সোমা কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি অসুস্থ। সাইকোলজিস্ট দেখান। চোখের জল নিয়ে মনের অসুখ ধুয়ে ফেলা যায় না। জানেন আপনি আমার কত ক্ষতি করেছেন! আপনাকে আমি সহজে ছাড়ব ভেবেছেন? এই ছেলেটার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। এই ফাঁকা বাড়িতে আমার দিদির একটা ছবি ঝুলিয়ে, কাঠের কুঁচির মালা পরিয়ে, আর ছেলেটাকে পাশের ঘরে ভয় দেখিয়ে আটকে রেখে বৃন্দাবন লীলা চালাবেন তা হবে না, হতে দেবো না।'

কমল আমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কিছু বলার সাহস হচ্ছে না, কিন্তু অনুভব করছে। উপায় থাকলে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করত। ভাষার ওপর দখল থাকলে আমাকে সান্ত্বনা দিত। সোমাকে দেখে আমার ভয় করছে। এযার মতো ব্যাপারটাকে মজার খেলা, বয়েসের খেলা বলে মেনে নিতে পারেনি। আমারও দুর্বলতা আছে, তা না হলে সোমা তুষারকে যে চোখেই দেখুক না, আমার কি যায় আসে! আমি কেন জেলাস হব। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি। এযা ঠিকই বলেছে, প্রবৃত্তিই মানুষের ভাগ্য। মানুষের প্রবণতাই মানুষের নিয়তি। কলে যেমন ইঁদুর ধরে, সোমা ঠিক সেই ভাবে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। কেন? কোন স্বার্থে! ভালবাসা? দেহবাসনা? কি কারণ?

নিজেকে ভীষণ দুর্বল, অসহায়, বোকার মতো লাগছে। বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। শুনলুম, কমল প্রশ্ন করছে, 'মাসি, বাবা কি করেছে, তুমি অত বকছ কেন?'

সোমা উত্তর দিল না। বারান্দায় বেরিয়ে এসে, হাত দুয়েক দূরে দাঁড়াল। চড়া আলো পড়েছে মুখে। ও মুখ যত কটু কথাই বলুক দেখতে ভারি সুন্দর। কাশীর জলবায়ু আর মধ্য যৌবনের বিদায়ী আভায় বড় আকর্ষণীয়। এরই নাম মায়া? আবার আমার দুর্বলতা আসছে।

সরে চলে গেলুম, ও পাশের ঘরে। সোমার কাছাকাছি থাকলে পাখির মতো জালে পড়ে যাব। কোনও দিনও আর উড়তে পারব না। এই খাঁচাতেই থেকে যেতে হবে সারা জীবন।

কিছু পরে সোমাও চলে এল। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাত দুটো পেছনে। দাঁড়াবার বড় মারাত্মক ভঙ্গি। সব কিছু বড় স্পষ্ট। যে যন্ত্র থেকে এত ধাতব কথা ছিটকে আসছে, সেই দেহযন্ত্র কি কোমল! কত কমনীয়।

সোমা শান্ত গলায়, সংযত ভাবে বললে, 'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। আবার বললে, 'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

দেখতে দেখতে চোখ টলটলে হয়ে এল জলে। ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নামছে দু'গাল বেয়ে। সোমা হঠাৎ ছুটে এল আমার দিকে। দু মুঠোয় আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, 'কেন? কেন? কেন আমাকে তাড়াতে চাও। কেন আমি ছুটে এসেছি!'

সোমা বলছে। সোমা হাঁপাচ্ছে। সোমা ক্রমান্বয়ে আমার মাথাটা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে। আমি কোনও কিছু দেখার সুযোগ পাচ্ছি না। আমার চোখের সামনে সোমার বুক। উঠছে, নামছে, কাঁপছে। সোমা হঠাৎ আমার মুখটা চেপে ধরল বুকের কাছে।

'বলো, তুমি কোনও দিন আর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে?' খেলা করবে আমাকে নিয়ে!'

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। পারছি না। অতি কষ্টে বললুম, 'সোমা, তুমি শান্ত হও। তুমি শান্ত হও।'

সোমা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। আমার কোলে মুখ গুঁজে চাপা গলায় বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি। অসম্ভব ভালবাসি।'

'কি পাগলামি করছ সোমা! এই সব হালকা কথা তো তোমাকে কোনও দিন বলতে শুনিনি। আর কি আমাদের সে বয়েস আছে! এ সব কথা বিশ-পঁচিশের পর আর বলা যায় না। কেউ শুনলে হাসবে!'

সোমার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সমান করে দিলুম।

সোমা মুখ তুলে বললে, 'আমি যাব না। তোমাকে ছেড়ে যাব না।'

'হঠাৎ আমার ওপর তোমার এই দুর্বলতা কেন? আমি তো উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য। আমার একটা ছেলে রয়েছে। ইচ্ছে করলে তুমি অনেক ভালো ছেলে পাবে। অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক রোজগার। গাড়ি, বাড়ি, ভরা যৌবন। আমি যে নিবে আসা আগুন, সোমা। আমাকে উষ্ণবৃত্তি করেই বাঁচতে হবে।'

সোমা আবার আমার দু হাঁটুতে মুখ গুঁজল। সরু সিঁথি হারিয়ে গেছে ঘন চুলে। ঘাড়ের কাছে পরিপাটি খোঁপা। ঘাড়! ব্লাউজের পেছন টান-টান। দ্বিতীয় হুকটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অন্তর্বাসের ফিতে ভয়ঙ্কর প্রলোভন। মন বড় দুর্বল হয়ে যায়। দেহ নয়, মনটাই কেমন যেন নরম আর বিষণ্ণ হতে থাকে। দেয়াল, ছাদ, সব যেন সরে গেছে। বিশাল পৃথিবীর পটভূমিতে, দুটো প্রাণ। সমস্যা আমাদের, সমাধান আমাদের। সুখ আমাদের

দুঃখ আমাদের, দ্বন্দ্ব আমাদের, জয় আমাদের, পরাজয় আমাদের। একজন বসে আছে খাড়া, আর একজন বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। গোটা পৃথিবী এইভাবে ভাগ হয়ে গেছে, দুয়ে, দুয়ে। দুজন, দুজন, দুজনকে ঘিরে ঘিরে অসংখ্য জগৎ তৈরি হচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সোমাকে ধরে ওঠালুম। গোপার স্মৃতি মনে আসছে। কত মান-অভিমানের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যপটে ভেসে গেছে আমাদের দাম্পত্যজীবন। রমণীর অভিমানের কাছে পুরুষের পরাজয়। মনে হচ্ছে সোমাকে নয়, গোপাকে তুলছি। সেই একই রকম এলায়িত শিথিল ভঙ্গি। দেহভার আমার শরীরে। এ-খেলায় মেয়েরা কি যে আনন্দ পায়! কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তাভাবনা সব গুলিয়ে যায়। বিশাল থেকে মন সরে আসে কাছে। একেবারে শামুকের খোলে। আমি তো তাই ভাবি শুক্তির নিভৃত অন্তরে এই ভাবেই মুক্তোর দানা ধরে। সাগরের গভীরে যত সে কাঁদে মুক্তোর দানা ততই বড় হতে থাকে। বুঝি, এই সব ভাবা এক ধরনের ন্যাকামি। তবু ভাবতে ইচ্ছে করে।

পাতাল রেল কলকাতা খুঁড়ছে। গ্রাম বাঙলা বন্ধ। মিছিলে মানুষ চিৎকার করছে। পাঞ্জাবে সন্ত গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন। ট্রাঙ্ক থেকে যুবতীর মৃতদেহ বেরুচ্ছে। সারা দেশ ছেঁড়া খোঁড়া ন্যাকড়ার ফালির মতো ফালফালা হয়ে ঝুলছে। আর আমি একটা সোমত্ত পুরুষ, যায়-যায় যৌবন এক মহিলাকে বুকে ধরে মধ্য দিবসে দোতলার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। আর পাশের ঘরে পড়ে আছে নিঃসঙ্গ, অসুস্থ সন্তান, বুকের কাছে ধরে আছে, কাকার দেওয়া উপহারের ব্যাগ।

শিক্ষিকা সোমার এই আদুরেপনা কখনও অসহ্য লাগছে, কখনও ভাল লাগছে। সারা জীবন চেষ্টা করলেও মেয়েদের বোঝার ক্ষমতা আমার হবে না। অনেক নাড়াচাড়া করে গোপাকে সামান্য বুঝেছিলুম। আমরা যেমন স্ত্রীর মধ্যে মা, বোন, বন্ধুর ত্রিবিধ সমন্বয় খুঁজি, স্ত্রীরাও তেমনি স্বামীর মধ্যে পিতা, মাতা আর ভাইকে খোঁজে।

সোমা আঁচলে চোখ মুছে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বিব্রত, বিড়ম্বিত, আমি হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। সোমা কি চাইছে! কি খুঁজছে! আমি রিচার্ড বার্টন নই, গ্রেগরী পেক নই, যে সোমাকে প্রেমোন্মাদ করে ফেলেছি! তুষারের চার্ম আমার চেয়ে অনেক বেশি। কি জানি কি হতে চলেছে। আমি গাড়ি, আর আমার স্টিয়ারিং অন্য হাতে।

সোমা রান্না চাপিয়ে দিয়েছে গ্যাসে। কোমরে জড়ান আঁচল। অন্য মূর্তি। কমলকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেল, তৈরি হও, তোমাকে চান করাব। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'চা খাবেন আপনি?'

'হ্যাঁ খাবো।'

কেন জানি না, বাড়িটাকে কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে। নতুন বাতাস বইছে। সামান্যেই ছিরিছাঁদ পালটে গেছে যেন। সোমার যেন লক্ষ্মীর হাত। দর্শন শাস্ত্র পড়ায়। সংস্কৃত, ইংরেজি দুটো বিষয়ই ভালো জানে। গণিতেও কাঁচা নয়। তাই যে কোনও কাজই বেশ গোছগাছ ক'রে করে। সব এলোমেলোকে বেশ একটা শৃঙ্খলায় এনে ফেলেছে। এযার সঙ্গে সোমার তফাৎ এই। বহু দিন পরে এক কাপ ভাল চা জুটলো বরাতে। সোমা নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, 'কি, চা ঠিক আছে তো?'

'তোফা! বহুকাল পরে এমন চা খেলুম।'

'হাতের গুণ মশাই। এ হাত শুধু ছাত্র ঠেঙায় না।'

'তুমি এই যে চলে এলে, ও বাড়ির কি হবে!'

'মা একজন কাজের লোক ঠিক করে ফেলেছেন।'

'যাক, বাঁচা গেছে। দাদার খবর?'

'রাখি না। রাখছি না।'

'চোখে কম দেখেন, বয়েস হচ্ছে, খবরাখবর রাখাটা একটা মানবিক কর্তব্য নয় কি?'

'অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু উনি যে পছন্দ করেন না। বিরক্ত হন। বেশির ভাগ সময় দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন।'

'অভিমান।'

'এ যুগে আবার অভিমান!'

'আমি সময় পেলে একদিন ওই ব্যাঙ্কের মহিলার কাছে যাব।'

'কেন, জেলে যাবার জন্যে? বাইরেটা ভাল লাগছে না বুঝি?'

'জেলে যাব কেন?'

'কাগজ পড়েন না? মহিলাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে।'

'কেন?'

'কাগজে পড়ে নেবেন। ফরেন একসচেঞ্জ র‍্যাকেট। ওসব আমি বুঝি না। নিশ্চয় গুরুতর কোনও অপরাধ।'

'ফরেন একসচেঞ্জ! তার মানে উঁচুতলার অপরাধ। মহিলার কদর বেড়ে যাবে।'

সোমা বললে, 'এ কি, কমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটার শরীর কি হল। এই বয়েসের ছেলে, দিন দিন যেন বুড়োটে মেরে যাচ্ছে। একটা কিছু করুন।'

'করব। তুমি করবে।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, তুমি করবে। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমার গৃহিণী ছাড়া আর কেউ নও।'

'সে কি, এই তো একটু আগে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ মত পাল্টাল !'

'সোমা, তোমার সঙ্গে আমার আজকের পরিচয় ! মনে আছে আমরা তিনজনে কত রাত এক বিছানায় শুয়েছি !'

'যদি বলি, এই বয়সে নতুন করে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে মানাতে পারব না বলেই আপনার ওপর জুলুম করছি।'

'তুমি তো বলেছিলে বিয়ে করবে না।'

'কেন জানেন ? এই দেখুন।'

সোমা বুকের কাপড় সরাচ্ছিল।

'প্লিজ সোমা, এখন না, এখন না। এখন আমি দেখতে চাই না। কমল রয়েছে।'

'ঘুমোচ্ছে।'

'রাতে দেখবো, নিরিবিলিতে, কেমন ?'

সোমা ডিভানে কমলের পাশে বসে কপালে হাত রাখল, 'কমল ! কমল !'

কমলকে তুলে বসাল। আজ একবার ডাক্তারখানায় যাবো। একাই যাবো। এষা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। সোমা আছে। কমলকে আগলাতে পারবে। কমলের এই দুর্বলতা। থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়া। মনমরা ভাব। অবিলম্বে মেরামত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সোমা যদি আবার মত না পালটায় তাহলে বাইরে যতদিন না যাচ্ছি, ততদিন অফিসটা অন্তত করা যাবে। ছুটি বাঁচবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সোমা আর কমল শুয়ে পড়ল ওঘরে। নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে। আমারও ঘুম ঘুম পাচ্ছে। না শোব না। দিবানিদ্রা ভাল নয়। আজ একবার কাগজ কলম নিয়ে বসা যাক। শেষ চেষ্টা। হয় হবে, না হয় কলম এবার ফেলে দোব।

এবার কায়দাতেই চেষ্টা করে দেখি। আগে একের পর এক চরিত্র নামিয়ে যাই। যুদ্ধের সময় প্লেন থেকে যেমন প্যারাট্রুপাররা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন এখানে, একজন ওখানে। তারপর ধীরে ধীরে সব এগিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। ধরা যাক সোমা আমার প্রথম চরিত্র। উপন্যাস শুরু হচ্ছে বেনারসে। গোধূলিয়ার মোড়। সময় সন্ধে। সাইকেল রিকশা চেপে সোমা চলেছে বাঙালিটোলার দিকে। সেখানে এক গলিতে থাকেন এক বৃদ্ধ।

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। কে এই বৃদ্ধ ! সোমা কেন যায় ! এই কেন যায়, প্রশ্নের মধ্যে রহস্যের ইঙ্গিত রেখে ছেড়ে দেব। কাহিনীর টান বেড়ে যাবে। গল্প চাই, টান চাই, তা না হলে পাঠককে ধরে রাখব কি করে ! এও এক কায়দা। সোমা এটা-ওটা নিয়ে রোজ সেই বৃদ্ধের কাছে যাবে।

এরপর কলকাতার পটভূমিতে ফেলব নীলুদাকে। নীলুদার মাকে। বড়লোকের বখে যাওয়া আদুরী মেয়েটিকে ফরেন ব্যাঙ্কের অফিসার করে ফেলব ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে। তুষারকে মঞ্চে ঢোকাব, সে যেমন, তেমনিভাবে। কালুকে আনব তবে মরতে দেব না আত্মহত্যা করে। মারব সোমার মাকে। বুড়ির ওপর আমার ভীষণ রাগ। এখন সারাদিন মালা ঘোরালে কি হবে ! শেষের সময় আমার একদা প্রেমিক, পরে ধার্মিক শ্বশুরমশাই স্ত্রীর হাতের যৎসামান্য সেবাও পাননি। পচা একটা নারসিং হোমে শীতের ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বুড়ি তখন লেপের তলায় নাক ডাকাচ্ছেন মহাসুখে। চা খেতে খেতে মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন। গোপার মৃত্যুর সময় বলেছিলেন একটি মাত্র কথা—হা মধুসূদন। দুটো বড় বড় চোখে জল ছিল না। ছিল আগুন। চরিত্রটির অতীত খুব সামান্যই জানি। তারই ওপর ভিত্তি করে মনোবিশ্লেষণ। এক সুবিখ্যাত লেখক, কলমের মুখে চরিত্র যখন জন্মাচ্ছে, সেই মুহূর্তটিকে ধরে কোষ্ঠী তৈরি করতেন। আর সেই কোষ্ঠী বলে দিত ভাগ্য। আমার কলমে বৃদ্ধার নিঃসঙ্গ মৃত্যু হবে। বেশি ভোগাব না, কষ্ট দেব না। একদিন সকালে দরজা খুলে দেখা যাবে বৃদ্ধা চলে গেছেন। জপের মালাটি পড়ে আছে মেঝেতে, ছিঁড়ে, ছত্রাকার হয়ে। মুখ দেখে মনে হবে, মৃত্যুযন্ত্রণা পেয়েছেন, এক ঝিনুক জল চেয়েছিলেন, প্রত্যাশা করেছিলেন, দেবার কেউ ছিল না। সোমাকে এক উত্তর ভারতীয় যুবকের পাল্লায় ফেলব, তার নাম হবে বিষ্ণু ভার্গব। সাসপেনস, সেক্স, সলিলোকি, সিডাকসান, সেনসেসান, সেনিলিটি, সাপ্রেসান, সাসপিসান, সব মিলিয়ে এমন এক সাফোকেটিং উপন্যাস ধরলে ছাড়া যায় না। নীলুদা আর কালুকে একই বাড়িতে রেখে দেব। কালু মায়ের মতো সেবা করে যাবে, নীলুদা ভাববে স্ত্রী। সে খেলা যা জমবে ! প্রবৃত্তির সঙ্গে নীলুদার ফাইট, আর কালুর আত্মরক্ষার চেষ্টা। পুরুষের দেহের আগুনে কালু কয়লার মতো পুড়তে চাইবে না। নীলুদার চোখ যাবে ; কিন্তু শরীরটা দিন দিন মোষের মতো হবে। অসম্ভব ঘাম আর অসম্ভব কাম। অসম্ভব ক্ষিধে, প্রচণ্ড আলস্য। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে হাতড়াতে হাতড়াতে হাজির হবেন কালুর কাজের জায়গায়। পেছন থেকে সব কিছু ঝাপসা দেখছেন। কালু উবু হয়ে বসে বাটনা বাটছে দুলে দুলে, নীলুদা পাকা ছ'ফুট শরীর নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে। মনে মনে একটা ঘামেভেজা শরীর দেখছেন, দুলুনি

দেখছেন, ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছেন, কালু হঠাৎ চমকে উঠবে। কালুকে দিয়ে আমি নীলুদাকে চড়চাপড়ও মারাব। আমার চরিত্রটাকে আনবই না। আমার সব দুর্বলতা, কদিচ্ছা, বিভিন্ন চরিত্রকে ভাগ করে দিয়ে নিজে বসে থাকব—সাচ্চা হীরা।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সোমা চিৎকার করে উঠল, 'শিগগির একটা চামচে আনুন।'

চামচে! চামচে কি হবে! চামচে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, কমলের দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, হাত, পা, শরীর সব টান টান। অস্পষ্ট একটা আঁ আঁ শব্দ। ভয় পেয়েছি, সেই সঙ্গে এই ভর দুপুরে ভাবছি, ভূতে ধরল না কি! পঁচাশি সাল। মানুষ গেছে চাঁদে।

সোমা চামচেটা নিতে নিতে বললে, 'স্মেলিং সল্ট আছে?'

'স্মেলিং সল্ট! পাবো কোথায়!'

'ব্লটিং পেপার?'

'না।'

'এক টুকরো চামড়া?'

'না।'

সোমা ভীষণ ক্ষেপে গেল, 'আপনি আর আপনার উদাসীনতা ছাড়া এ বাড়িতে কিছুই নেই। ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলে মানুষের এই অবস্থাই হয়। অলক্ষ্মী এসে ঢোকে। যান, একটু খবরের কাগজ ছিঁড়ে আনুন। আর একটা দেশলাই।' সোমা প্রথমে চামচের হাতলের দিকটা জোর করে গুঁজে দিল কমলের দাঁত দুপাটি ফাঁক করে। পোড়া কাগজের ধোঁয়া দিতে লাগল নাকের কাছে। ধরে আর টেনে নেয়। ধরে আর টেনে নেয়। ধোঁয়ার ঝাঁজে কমল ছটফট করে উঠছে।

আমি কেমন যেন হয়ে গেছি। ভাবতেও পারছি না, কাঁদতেও পারছি না। মেন্টাল প্যারালিসিস গোছের অবস্থা। ডাক্তারবাবুরা বলছেন কি, করছেন কি।

অনেক কষ্টে বললুম, 'সোমা, মনে হচ্ছে এপিলেপসি!'

'মনে হবার কিছু নেই, এপিলেপসিই। ছেলেটাকে নেগলেক্ট করে করে প্রায় শেষ করে এনেছেন।'

এই ধরনের কথা শুনলে রাগে গা জ্বালা করে ওঠে। একেই বলে, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

'সোমা, কেন বাজে কথা বলছ। জানো তুমি, দুজন বড় ডাক্তার কমলকে দেখছেন।'

'দুজন ডাক্তার, দুশো টাকা ফি, চারশো টাকার ওষুধ, তাহলেই সব হয়ে গেল!'

'তুমি আমাকে বকছ, এর বেশি আমি কি করতে পারি সোমা!'

'ছেলেটার পেছনে একটু খাটতে পারেন। একটু সময় দিতে পারেন।'

কমল চোখ মেলেছে। যেন স্বপ্ন-রাজ্য থেকে ফিরে এল। করুণ কণ্ঠে বললে, 'আমি যে একটু জল খাবো।'

সোমা বললে, 'জল নয়, এখন তুমি একটু গরম দুধ খাবে বাবা।'

সোমা উঠে পড়ল। 'দুধ আছে?'

'গুঁড়ো দুধ।'

'ছেলেটার জন্যে একটু টাটকা দুধ সংগ্রহ করতে পারেন না?'

কথা শেষ করে সোমা একটা হুঁউঃ শব্দ করল। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে ক্রোধে।

'গুঁড়ো দুধ বোতলের দুধের চেয়ে ভালো সোমা।'

'হ্যাঁ, অলস মানুষের ওইটাই সান্ত্বনা। তা না হলে সাতসকালেই তো ছুটতে হবে মিল্কবুথে।'

'তুমি আমার ওপর রাগ করছ, বিশ্বাস করো, এষা আর আমি ওকে দু'দুজন স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে গেছি। এরই মধ্যে প্রায় সাত আটশো খরচ হয়ে গেছে।'

'ভালো পাল্লায় পড়েছেন। বড়লোকি ব্যাপার। টাকা খরচ মানে সেবাযত্ন নয়। টাকা খরচ করলেই কি সব হয়ে গেল! এষার হাতে পড়েছেন, ও হাতে কায়দাই আছে, আর কিছু নেই। বাঙালী মায়ের হাত চাই। সব মেয়েই বিছানায় যেতে পারে, মা হতে পারে ক'জন!'

কমলকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে, সোমা বললে, 'চেনাশোনা প্রবীণ কোনও ডাক্তার আছেন পুরনো আমলে পাশ করা?'

'এপাড়ার খবর রাখি না, তবে আমার পুরনো পাড়ায় একজন আছেন।'

'তাহলে চলুন তাঁর কাছে আজ যাই। বা কল দিন বাড়িতে।'

'এপিলেপসি কেন হল? এপিলেপসি তো মেয়েদের অসুখ।'

'আপনি গবেষণা পরে করবেন। অনেক সময় পাবেন। আগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।'

'একটু সন্ধে হোক। এখন তো তাঁকে চেম্বারে পাবো না।'

'বাড়িতে পাবেন?'

'বাড়ির ঠিকানা জানি না।'

'অসম্ভব গেতো আপনি। ওই পাড়ায় গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে।'

বেরিয়ে এলুম বাড়ি থেকে। এযাদের বাড়ির সামনে দু দুটো গাড়ি লেগে আছে। বিশাল ব্যাপার। এযা আমাকে নিয়ে একস্‌পেরিমেন্ট করছিল। কোনও সন্দেহ নেই। আগামী উপন্যাসের উপাদান খুঁজছিল। কিভাবে একটা মানুষ রিত্যাক্ট করছে। একটা কথা হঠাৎ মনে আসায় আপন মনেই হেসে ফেললুম, এযা মনে হয় দেখছিল—একটা ম্যানইটারের কাছে রক্ত ভালো না আলোচাল ভালো। কার টান বেশি। ছেলের না মেয়েছেলের!

সোমা যতই হইচই করুক, ডাক্তারবাবুকে এখন পাবো না কিছুতেই। তাই একবার দাশ পাবলিশার্সে টুঁ মারলুম। ফটিকদা গোমড়ামুখে বসে আছেন। পাশেই বিশাল বড় ফ্লাস্ক। ইদানীং ঠাণ্ডা চকোলেট-মিল্ক আর কড়াপাক সন্দেশ ছাড়া কিছুই খাচ্ছেন না। পেটে একটু আলসার মতো হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের সেবায় এখনও অনেক দিন বাঁচার ইচ্ছে। সেক্স, পলিটিক্স আর রেপের পুলিপিঠে পরিবেশনের সুমহান দায়িত্ব কাঁধে।

ফটিকদা প্রুফ দেখছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, 'কি মশাই, কপি কি হল?'

চেয়ারে বসতে বসতে বললুম, 'ধরিনি এখনো, ভাঁজছি।'

ফটিকদা এবার মুখ তুললেন, বললেন, 'আহা, সাহিত্য না হয়ে মুগুর হলে, এত দিনে চেহারা ফিরে যেত। আপনি মশাই আমাকে ডুবিয়ে ছেড়ে দিলেন। বইমেলা আর ধরতে পারলুম না। বড় অলস আপনি। লেখা নিয়ে বসতেই চান না। ওভাবে হয়! রেগুলার বসতে হবে। লেখার সঙ্গে সহবাস। এই দেখুন এক মাসে কমপ্লিট ম্যানাসক্রিপ্ট। স্মল পাইকায় ঠাসা পঁচিশ ফর্মা।'

'কার কাজ ফটিকদা! এই অপকর্মটি কার?'

'তাঁর, যিনি এবারে অ্যাকাডেমি পাবেনই! আমাদের স্কুপ নিউজ। বইয়ের নাম শুনেই লোক তেড়ে কিনতে আসবে। তিন দিনে এডিশান। প্রথম দিনেই পুলিসের লাঠিচার্জ।'

'বাবারে! এমনও হয়!'

'কেন হবে না, সেই পয়লা, পরম পুরুষ প্রকাশের দিন মনে নেই!'

'কি নাম বইয়ের?'

'মহাসুখে প্রেমালাপ। এই বিশ গ্যালি পড়েছি। এরই মধ্যে চারটে রেপ হয়ে গেল। তার মধ্যে একটা আবার গ্যাং রেপ। সমুদ্রে লাশ ফ্লোটিং। ভেসে ভেসে তীরে এসেছে। লোকজন জড়ো হয়েছে। গল্পের কি গ্রিপ। গলায় গামছা দিয়ে টানছে।'

'আমি এবার ধরে ফেলছি।'

'আরে মশাই সেই গল্পটা ধরুন না। সেই যে সেই এক নেতা। প্রবীণ নেতা। বিবাহিত। বড় বড় তিন-চারটি ছেলেমেয়ে, হঠাৎ পলিটিক্স ছেড়ে প্রেমের লাইনে চলে গেল। বিশ বাইশ বছরের একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসল। বেশ রসিয়ে বসিয়ে লিখুন না। সেই বউ আর ছেলেমেয়ের হাতে সপাসপ ঝাঁটাপেটা দিয়ে ওপন করুন। পড়ে আছে হাসপাতালে। লিখবেন আপনি, প্লট ধরিয়ে দেব আমি?'

'মদ ছাড়া আর কিছু কি ধরানো যায় ফটিকদা?'

'তাই বা ধরাতে পারলুম কই! একটু জলপথে ঘুরুন, সাহিত্যপথের হদিশ পাবেন। কিক না মারলে মটোরসাইকেল স্টার্ট নেয়! সাহিত্য সাধনা আর তন্ত্রসাধনা এক। পঞ্চ মকার চাই।'

'ছেলেটা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু মেরামত করে লিখতে বসব।'

'মেরামত ত ডাক্তারে করবে। আপনার কি? ওসব বাজে অছিলা। আপনি পনেরো দিনের মধ্যে তিরিশ স্লিপ জমা দেবেন, অতি অবশ্য। এটা একটা কথা হল, ছেলের অসুখ! এক সঙ্গে গোটাপাঁচেক বই না হলে, আমি বিজ্ঞাপন লড়াতে পারছি না। বিজ্ঞাপনের কস্ট জানেন? যান, যান, আর সময় নষ্ট করবেন না।'

ফটিকদা আবার 'মহাসুখে প্রেমালাপে' মগ্ন হয়ে গেলেন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। উঠে চলে এলুম। সোজা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। প্রবীণ মানুষ। চেহারায় বেশ একটা সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক ভাব। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। কাঠের পার্টিশান ঘেরা চেম্বার। একটু অন্ধকার মতো। একটা দুটো ওষুধ কোম্পানির ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। ফসমুখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না।

'আমি যখন এ-পাড়ায় ছিলুম, তখন আপনি আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন। আমরা ওই সতের নম্বর বাড়িতে থাকতুম। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আর ফেথ দুটোই আছে। তাই বেপাড়া থেকে ছুটে এসেছি।'

ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি ফুটেছে।

বললেন, 'আর আমাদের যুগ শেষ হয়ে এল। এখন ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, আর পেটেন্ট মেডিসিনের যুগ। লিটারেচার পড়েই ডাক্তার হওয়া যায়। ডাক্তারকে শিখণ্ডি খাড়া করে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টটিভরাই চিকিৎসা চালাবে।'

'সেই কারণেই আপনার কাছে ছুটে আসা। আমার ছেলেটা ভীষণ ভুগছে

ডাক্তারবাবু। একে মা-মরা ছেলে।'

'আপনার স্ত্রী মারা গেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে কি চিকিৎসা করলুম আমি!'

'আপনার চিকিৎসার দোষে নয়, মারা গেছে আমার ফুলিশনেসে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।'

'ছেলের বয়েস?'

'আট পেরিয়ে নয়ে পড়বে।'

'কি হচ্ছে? ট্রাবলটা কি?'

যা যা হয়েছে সব ধীরে ধীরে, গুছিয়েগাছিয়ে বললুম, আজকের হঠাৎ ফিট হয়ে পড়া পর্যন্ত।

ডাক্তারবাবু হুম করে একটা শব্দ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন আপন মনে। পেপারওয়েট নাড়লেন। পেন ঘোরালেন।

শেষে বললেন, 'সাইকোলজিক্যাল ডিজিজ। এডাল্ট হলে ঘুমের ওষুধ দিতুম। আমি আপনাকে একটা জিনিস সাজেস্ট করছি—দিনকতক বাইরে কোথাও ঘুরিয়ে আনুন, বেশ সুন্দর কোনও পাহাড়ী জায়গা, পরিষ্কার বাতাস, নীল আকাশ, হজমী জল। যত পারে, পেটে যা সহ্য হয় সব খেতে দিন, খেলতে দিন, ছুটতে দিন, হাসতে দিন, রোদে পুড়তে দিন, নো মেডিসিন। আপনার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একেবারে বৃদ্ধা নয়, স্নেহশীলা, স্বাস্থ্যবতী কোনও মহিলা নেই?'

'হ্যাঁ আছে। কেন কি হবে?'

'সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যান। মেক ইট এ গুড প্লেজেন্ট পার্টি। বেশ হাসিখুশি, আমুদে কোনও পুরুষ থাকলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান। লুডো, স্নেকস অ্যাণ্ড ল্যাডার, ছোট বল, ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম, ঘুড়ি-লাটাই, ভালো গল্পের বই, সব নিয়ে যান সঙ্গে। ওনলি ওয়ান প্রিকশান, জল আর আগুন থেকে দূরে রাখবেন। দুধ, ডিম, ভেজিটেবলস খেতে দেবেন। একটা মাস করে দেখুন, হি উইল বি অলরাইট।'

'একবার দেখবেন না?'

'প্রয়োজন হবে না। আমি যা বলছি করে দেখুন। কোনও কোনও ছেলে একটু ব্রুডিং টাইপ হয়। পরিবেশ পালটালেই দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। না হলে আমি আছি।'

নমস্কার করে উঠে চলে এলুম। আমার পথের সঙ্গে মিলে গেছে।

সায়েবগঞ্জ। চলো সায়েবগঞ্জ।

দরজার বেল বাজালুম। ভেতরে বেশ একটা হুড়মদুড়ুম শব্দ হচ্ছে। তরতর করে লাফাতে লাফাতে কে যেন নেমে আসছে। সোমাই হবে। দরজা খুলে দিল। কোমরে শাড়ির আঁচল গোঁজা। কপালে ঘামের ফোঁটা। চুল উড়ু উড়ু। ওপরের কোনও একটা জায়গা থেকে কমলের গলা ভেসে আসছে—'মাসি টুকি, মাসি টুকি।'

দরজা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি করছ তোমরা?'

'ভীষণ ব্যাপার--আমরা চোর চোর খেলছি।'

কমল আমার গলা পেয়েছে। চিৎকার করছে, 'বাবা টুকি। বাবা টুকি।'

'দাঁড়াও যাচ্ছি। ধরছি তোমাকে।'

আমি জানি, কমল কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। তবু সময় নিচ্ছি। যেন খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই। মুখে বলে চলেছি—'কোথায় যে লুকলো ছেলেটা!'

জানি আমার এই কথা শুনে কমলের কি সাংঘাতিক উত্তেজনা হচ্ছে। যেমন হত আমাদের ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায় মানুষের জীবনে যা যা হয়, সব কি রকম মনে একেবারে ছাপমারা হয়ে থাকে! আলমারির পাশে দরজার আড়ালে কমল নিঃশ্বাস বন্ধ করে, সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু জানি মুখে একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। চোখ দুটো জ্বলছে। যেই গিয়ে হঠাৎ যেন দেখে ফেলেছি এইভাবে বলব, 'ওমা এই তো রে ছেলেটা!' কমল অমনি হই হই করে উঠবে। এত ভাল লাগবে কমলের। আমি হারিয়ে গেছি, আমার আপনজন আবার আমাকে খুঁজে পেয়েছে, এর মতো অ্যাডভেঞ্চার আর কি আছে শিশুর জীবনে।

'কোথায় গেল রে বাবা, আমার অমন সোনা ছেলেটা! চাঁদে চলে গেল না কি! সোমা, কোথায় গেল বলো তো।'

'আমি কি জানি? জানলেও বলব না কি?'

'ঠিক আছে। বলবে না তো! তাহলে আবার খুঁজি।'

খোঁজার ছলে সারা বাড়িটা আবার ঘুরে এলুম। তারপরে 'এই তো রে আমার ছেলেটা' বলে খপ করে চুলের মুঠি ধরতেই কমল হাউমাউ করে উঠল। বুকে চেপে ধরে বললুম, 'বাবা, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।'

'তুমি কি ভাবলে বাবা?'

'আমি ভাবলুম, অদৃশ্য কোনও সুড়ঙ্গ দিয়ে তুমি বোধ হয় কোনও রাজার দেশে চলে গেলে!'

'সেরকম কোনও সুড়ঙ্গ আছে বাবা?'

'থাকতেও পারে।'

কমল অবাক চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল। ছোটদের বিশ্বাসের জগতে কি না থাকে! পরী আছে। ভূত আছে। গুপ্তধন আছে। দৈত্য আছে। ভগবান আছেন। আকাশে উড়ে উড়ে যেতে পারে এমন মানুষ আছে।

সেদিন রাতে, খাওয়াদাওয়ার পর আমরা তিনজনে বসে বসে অনেকক্ষণ লুডো খেললুম। সোমা যখন মাথা নিচু করে চাল দিচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল গোপা বসে আছে সামনে। সোমা একসঙ্গে দুটো হাতই খেলছিল। আমি, কমল। সোমা, সোমা। একবার নিজের হাত চেলে, আবার অদৃশ্য জুড়ির চালও চালছিল। কে জানে গোপাও হয়তো এসে বসেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম না।

বেশ তিন-চার দান খেলা হয়ে গেল প্রবল উত্তেজনায়। আমার হাতে ছয় পড়ে না কিছুতেই। কমল কেবলই বলে, 'তোমার হাতটার একটা কিছু করো বাবা। মাসির হাতে একবার ঠেকিয়ে নাও।'

সোমার কেবলই ছয় পড়ে।

এক সময় কমলের হাই উঠল। সোমা ছক মুড়ে রেখে বললে, 'কমল, এবার আমাদের ঘুম। তুমি আমার কাছে শোবে তো?'

কমল আমার দিকে তাকাল।

বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কমল তোমার কাছেই শোবে।'

সোমার ওপর আমার সব রাগ, সব ঘৃণা সরে গেছে। এতকাল আমি সোমাকে ভুল বুঝে এসেছিলুম। আজকে সোমার মায়ের চেহারা দেখে ফেলেছি। মেয়েরা তো মা হতেই আসে। বিকাশের বউ ঊর্মি নিঃসন্তান। সারা সংসার যেন নিভে আছে। কি অশান্তি! বিকাশের ওপর রাগে, ক্ষোভে ঊর্মি নিজের চুলগুলোই ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছে। কেমন একটা অস্থির অস্থির, ছটফটে ভাব। অস্বাভাবিক হাসি। অস্বাভাবিক কথাবার্তা। বিকাশ একদিন বাড়ি ছিল না। হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম। বসতে বললে। চা করে নিয়ে এল। তারপর হঠাৎ বলে বসল, 'শুধু শুধু বসে থেকে কি হবে, চলুন শুয়ে পড়ি।' আমি কায়দা করে উঠে চলে আসছি। ভীষণ ভয়ও পেয়ে গেছি। ঊর্মি হাসতে শুরু করল। খিল খিল হাসি। সে হাসি শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে।

ওরা দুজনে শুতে চলে গেল। নিজের বিছানায় মশারি গুঁজছি। মশারি গোঁজার সময় কেমন যেন মনে হয়। ভীষণ একা লাগে। রাত, আর মশারি, এমন একটা সময়, এমন একটা জায়গা, যেখানে, যে সময়ে দুজন ছাড়া মানায়

না। থাকা হয় তো যায়, সে তো একচিলতে সেলে প্রাণদণ্ডের আসামীকেও থাকতে হয়। সে থাকা, থাকা নয়। স্রেফ বয়ে যাওয়া। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, কি হবে বেঁচে থেকে। বেঁচে থাকা একটা বিশ্রী ব্যাপার। একের পর এক আত্মজীবনী পড়ে পড়ে দেখলুম, সাধু, সন্ত, সাহিত্যিক, অভিনেতা, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, যোদ্ধা, জীবনের শেষের দিকে সকলেরই মধ্যে একটা হতাশার সুর। জীবনের মধ্যভাগ থেকেই মেঘ জমতে শুরু করে, শেষের দিকে ঘন-অন্ধকার। শেষ জীবন পর্যন্ত ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে, ভালো ভালো কথা বলে যেতে হয়, না বললে ভীষণ খারাপ দেখায়। আগের, আগের, তারও আগের, পেছন দিকে যত দূর দৃষ্টি চলে, সব বড় বড় মানুষেরা একই কথা একইভাবে বলে এসেছেন, সেইভাবেই বলতে হবে। সেইটাই তখন ট্রুথ। সত্য। একটা মিথ্যে এইভাবেই সত্য হয়ে গেছে। বেঁচে থাকা একটা টিডিয়াস, থার্ডক্লাস এক্সপিরিয়েন্স। নাথিংনেসে ভরা। দেখতে দেখতে পৃথিবী পুরনো হয়ে আসে। কি নীল আকাশ, কি সবুজ গাছ, কি পাখি, কীটপতঙ্গ, বিশাল জনপদ, গগনচুম্বী ইমারত, মনোরম উদ্যান, দেখতে দেখতে, দেখায় আর কোনও আকর্ষণই থাকে না। শেষে কি দেখছি, কি দেখলুম সেই বোধটাই আর থাকে না। শেষে ব্যাপারটা একটা আদিখ্যেতার পর্যায়ে চলে যায়। চাঁদের আলোয় চা খাওয়া। সিনেমার নায়ক-নায়িকার মতো গান গাইতে গাইতে বর্ষার জলে ভেজা। পাহাড়ে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে বোতল খাওয়া। নিজের গায়ে স্ট্যাম্প মারা, 'আমি রোমান্টিক', 'আমি বোহিমিয়ান', 'আমি ক্যাজুয়াল', 'আমি উদার', 'আমি ভোলেবাবা', 'আমি জীবন মৃত্যুর পরোয়া করি না', 'আমি বৈদান্তিক', 'আমি মায়াবাদী', 'আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই', 'আমি আনন্দ, আনন্দ', 'আলো আলো'। নিজেকে সাধারণের থেকে সরিয়ে নিয়ে, অনন্যসাধারণ করে তোলার জন্যে অনেক কথা বলতে হয়, অনেক জিনিস চাপতে হয়, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। মুখে হাসি, চোখে জল। 'অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই অপারেশন করুন' বলে আমার এক বীর বন্ধু ডাক্তারবাবুর দিকে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে, প্রোফেস্যানাল গলায় বলেছিলেন, 'কি দরকার। সেই এক মহাপুরুষ আলমোড়ায় করিয়েছিলেন, সেইটা পড়েছেন বুঝি। আরে মশাই, সে যুগে অ্যানেসথেসিয়ার এত উন্নতি হয়নি। সামান্য একটু অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্যে এত যন্ত্রণা সহ্য করবেন!' জীবন এক বিচিত্র ঘড়ি। কামের পিভটে দুটো দাঁতকাটা চাকা ঘুরছে, একটা ভোগ আর একটা লালসা। ঈশ্বরের সেবা করতে এসেছি না ইন্দ্রিয়ের সেবা! সব যখন তরতাজা তখন মনে হয়, নাঃ আর কয়েকদিন বাঁচা যাক। মুরগীর ঠ্যাং চিবোবো। কাপ্তেন সাজবো। সেন্ট ওড়াবো।

সিনেমায় গিয়ে লাস্যময়ীর ধিতিং নাচ দেখব। ওকে চটকাবো। এর গায়ে হাত বুলবো। আবার এও ভাবি দাঁতের যন্ত্রণায় যে কাতর, বিশ্বসুন্দরী যদি তার দিকে ওষ্ঠ বাড়িয়ে দেয়, চুম্বন কি সম্ভব হবে ? একটা সত্তর বছরের জীবনে, পাঁচ দশ বছর বেশ হুড়মদ্দুড়ম বাঁচা। বিয়ে করেছি, বিছানায় গেছি, রাত জেগেছি, সুড়সুড়ি দিয়েছি, অধরসুধা পান করেছি, দাড়ি কামিয়েছি, আফটার সেভিং লোশান লাগিয়েছি, আহা চাঁদ, আহা আকাশ, বাহবা সমুদ্র বলেছি, ট্যাঁ করেছে, ভ্যাঁ করেছে, নেচে নেচে নেমন্তন্ন, ঝুলে ঝুলে বাড়ি, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা, প্রোমোশানের তেল, যৌবনের জন্যে হাফবয়েল, পোচ, ক্যাপসুল, সুখের জন্যে গর্ভনিরোধক বটিকা, ভোগের জন্যে ত্যাগ, মা ত্যাগ, বাবা ত্যাগ, ভাই ত্যাগ, বোন ত্যাগ। তারপর আর ভাল্লাগে না। সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। ছেলেটা মাঝরাতে চেল্লালে গলা টিপে দিতে ইচ্ছে করে। বউ বিশ্রী, ছেলে যন্ত্রণা, সংসার কারাগার। একটু মদ খাই, একটু অন্য মেয়েছেলে ধরি, একটু পরচর্চা করি। নাঃ সুখ নেই। নিজের পরিচর্যা করি। হার্টের ধুকপুকনি মাপাই, রক্তের চিনি মাপাই, পেটের অ্যাসিডে ক্ষার ঢালি, সেন্ধ খাই, সেঁকা খাই, আলুনি খাই। শেষে ধর্ম ধরি। ইন্দ্রিয়ের সব কটা দরজার কবজা হলহলে, তবু মনে করি, প্রায় রামকৃষ্ণ, প্রায় বিবেকানন্দ, প্রায় যীশু। গলায় মালা, চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে জ্ঞানের বুলি, তারা তারা। পাশ দিয়ে যুবতী গেলে খেলিয়ে তাকাই, মনে বলি, আহা কার বউরে, মুখে বলি, শক্তি শক্তি, মা জগদম্বে। আমিষ ছেড়ে নিরামিষ, ঘরে ধুপের ককটেল। 'আঃ আমার কাছে বৈষয়িক কথা কিছু বলো না। জ্যোতিদর্শন হচ্ছে। কি যেন বলছিলে, তিন নম্বর বাড়ির মেয়েটা বারে নাচে ?' আহা ! কবে দেখবো রে ? ওই রূপালী বড়ি খেলে পোটেনসি ঠিক থাকে। শেষে আর নড়তে পারি না, শেষে আর চলতে পারি না। দু'ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হাঁপিয়ে মরি। তবু মরতে পারি না। ঝ্যাঁটা মারে, জুতো মারে, রাস্তায় সব গরুর মতো গুঁতিয়ে চলে যায়। একদিন গভীর রাতে ফাঁকা বিছানায় হাঁপের টান টানতে টানতে মন ভেসে যায়।

'কি হচ্ছে ? ঘুমোলে না কি ?'

চোখ বুজিয়েছিলুম। ফিস ফিস বাতাসের স্বরে প্রশ্ন। মশারিতে একটা নাক আর দুটো ঠোঁট লেগে আছে।

বাতাসের স্বরে উত্তর, 'না, ঘুম আসছে না।'

আবার হিস হিস প্রশ্ন, 'আসবো ?'

ফিস ফিস উত্তর, 'এসো।'

কাঠকয়লার আঁচে, বিশাল একটা তাওয়ায়, কাবাব তৈরি হচ্ছে। মশলা আর আতরের গন্ধ। পুটপুট। পিটপিট শব্দ। বেঁচে থাকি আরও কিছুক্ষণ। হাত, পা, বুক, গলা, ঠোঁট, নাক, কপাল, ভুরু, চোখের পাতা। রাত, বাতাস, ছবি, দেয়াল, নির্জন প্যাঁচালো পথ, ছায়া, তারা, ঘড়ি, সময়, কল, এক ফোঁটা জল, বই, গেলাস, দেবতা, তালাআঁটা শূন্য ঘর, মশারি, বালিস, মাথা, চুল, কান, ইয়ারিং, পিঠ, নাভি, পায়ের মসৃণ গোড়ালি। পৃথিবী নেই। মশারি। বিছানা।

তবু শরীরের ওপর শরীর। পায়ের ওপর পা। মানুষের বিভিন্ন অনুভূতির অস্ফুট শব্দ। যেমনই হোক, দুজন থাকলে বাঁচাটা অনেক সহনীয় হয়। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী। চেলা আছে। কেউ নেই, তো একটা কুকুর জুটে গেছে। তাও নেই তো একটা লাঠি আছে।

অনেক অনেক পরে আমার হাতে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে সোমা বললে, 'কি বললেন ডাক্তারবাবু ?'

'বললেন, চেঞ্জ। ছেলেকে বেশ করে বাইরে বেড়িয়ে আনুন। সঙ্গে স্নেহশীলা কোনও মহিলাকে নিয়ে যান। তুমি যাবে সোমা ?'

॥ এগার ॥

মিল্টনগঞ্জ বলে যে একটা জায়গা আছে আমার জানা ছিল না। সোমা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে। কলকাতার বাইরে থাকায় জ্ঞান বেড়ে গেছে। বিশাল একটা নদী আছে। চেনা নাম, ফল্গু। যেদিকেই তাকাও ধুধু করছে সর্পিল বালির বিস্তার। একটা ঝকঝকে নতুন পোল আছে। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি। বিহার সরকার মাঝে মাঝে রঙ লাগান। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, সামনে পেছনে তাকালে গা ছমছম করে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের কুঁজ ধূসর হয়ে আছে। চারপাশে অচেনা সন্দেহজনক জঙ্গলের বিস্তৃতি।

যা যা চেয়েছিলুম সবই আছে। কাছাকাছি ঢেউ খেলানো পাহাড় আছে। ছোটখাটো আরও গোটা দুই নদী আছে। আঁকা-বাঁকা। সিপ সিপ জল, তির তির করছে। চারপাশে ছোট ছোট মরশুমের মত সাদা সাদা মোরামের বিছানা বিছনো।

বাড়তি আরও কিছু আছে। জৈনদের একটি সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দির আছে। আর আছে ভাঙা একটা নীলকুঠী। সেই নীলকর সাহেবের নামেই জায়গার নাম। বিহার সরকার অবশ্য নামটা কাগজেকলমে বদলেছেন। লালসিংনগর। কেউ সে নাম বলে না। মুখে মুখে মিল্টনগঞ্জই ফেরে।

লোকসংখ্যা খুবই কম। ব্যবসা বলতে দুটি কি তিনটিই প্রধান। কাঠ, শালপাতা আর ওই নুড়ি পাথর চালান। আমরা এসে উঠেছি জৈনদের ধর্মশালায়। ছোট্টখাট্ট, ভারি সুন্দর। সোমার সঙ্গে পরিচয় আছে। বেনারসে ভারতীয় দর্শন সম্মেলনে এই আশ্রমের যিনি প্রধান তাঁর সঙ্গে সোমার আলাপ হয়েছিল। সন্ন্যাসী সোমাকে শ্রদ্ধা করেন। আমরা বেশ আদরেই আছি। চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তকতক করছে। গোলাপবাগান আমাদের ঘিরে রেখেছে। ছোট ছোট গাছে বিশাল বিশাল পেঁপে ঝুলছে। সারি সারি, দীর্ঘ দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছ হিস হিস করছে বাতাসে। মোরাম ঢালা পথ যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, সেইখানেই বাহু বিস্তার করেছে। এপাশে ওপাশে, নিভৃতে বসার জন্যে তৈরি পাথরের বেদী।

আমাদের গেস্টহাউসের পেছন দিকে একটা পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। রাতে সেই ঢালু বেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ে শব্দ করে। শুয়ে শুয়ে শুনতে বেশ লাগে। জন্তুর পায়ের শব্দ। সোমা বলে বুনো কুকুর। আমি ভেবেনি বাঘ। বেশ লাগে। ভাবলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। এখানে এসে মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকাটা নেহাত মন্দ নয়। শীত আসি আসি। পরিষ্কার নীল আকাশ। ঝিরিঝিরি পাতা কাঁপা সকাল। রোদ সেঁকা দুপুর। বাতাস জুড়নো রাত। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সোমা ফর্সা হয়ে গেছে। মুখ উজ্জ্বল। টান টান হয়ে উঠেছে মসৃণ দেহত্বক। হাঁটায়, চলায়, বলায় আলাদা একটা ঠমক এসে গেছে। বউ ছাড়া সোমাকে আর অন্য কিছু ভাবতে পারছি না! ভাবা যায়ও না। সব রক্ষণশীলতা ভেঙে গেছে। আমরা আমাদের নিয়তিকে মেনেই নিয়েছি শেষ পর্যন্ত। প্যাঁ পোঁ বিয়ে আর সম্ভব নয়। ব্যাপারটাকে সময় মতো আইনসিদ্ধ করে নিতে হবে। তৃতীয় কেউ না কেউ উত্তরপুরুষ হয়ে আসবেই। আমরা আর তেমন কই সাবধান হতে পারছি! একটা বেপরোয়া ভাব এসে গেছে। অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়, সোমার কাছে ভীষণ কিছু। বিস্ফোরণের মতো।

আশেপাশে কোথাও কোনও দোকানপাট, হাটবাজার নেই। শেষ শীতে মেলা হয়। তখন অনেক দোকানপাট বসে। নীলপাহাড়ের গ্রাম থেকে মানুষজন ছুটে আসে। হাতি আসে। ছোট সার্কাস আসে। একমাস ধরে মেলা চলে। সঙ্গে আমরা চা এনেছি। স্টোভ এনেছি। সুজি এনেছি। ঘি এনেছি। বিস্কুট এনেছি। আশ্রম আমাদের দুবেলা পেটপুরে খেতে দেয়। নিরামিষ। ঘি দুধ পেঁপে ছোলার ছড়াছড়ি।

একটা ঘর। দুটো সিংগল বিছানা। জোড়া লাগিয়ে তিনজনের মতো করা হয়েছে। হাত-পা খেলিয়ে শোয়া যায়। অসুবিধে হয় না। চারপাশে টানা

বারান্দা। বারান্দায় নানা মাপের, নানা ডিজাইনের চেয়ার, আরামচেয়ার। ঘরের লাগোয়া সুন্দর বাথরুম। চব্বিশ ঘন্টা জলের ব্যবস্থা।

খুব ভোরে উঠে বেড়াতে বেড়াতে আমরা আশ্রম এলাকা ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে যাই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব দিকই অবারিত। ভোরের বাতাসে হালকা সবুজের গন্ধ। ফুলের গন্ধ, পাতার গন্ধ, বনলতার গন্ধ। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, পোড়া ডিজেল নেই। বাতাস ঝনঝনে পরিষ্কার। সুরার মতো। জনপ্রাণী নেই। এত নিস্তব্ধ নিজেদের মধ্যে কথা বলতেও অস্বস্তি হয়। মনে হয় নিস্তব্ধতা বিরক্ত হবে। আমাদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে। কোনও পাখির ক্ষীণতম ডাকও কানে আসে। পাতা থেকে ঝরে পড়া এক ফোঁটা শিশিরের শব্দও শুনতে পাই। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে, মাঝে মাঝে আমরা বিশাল কোনও গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখি। কি বিশাল আয়োজন! আমরা যেন পুতুল-মানব। পোকার মতো। পাথুরে পথ, পথ হারিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। মৃত্যুর মতো সাদা। আমরা স্তম্ভিত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকি দুজন। সোমার কোলের কাছে কমল। ছবি তোলার কেউ থাকে না, তাই আমরা ছবি হয়ে যাই না।

কমলকে সোমা খুব সুন্দর করে সাজায়। সব সাদা। সাদা কলারঅলা গেঞ্জি। সাদা প্যান্ট। সাদা মোজা। সাদা স্পোর্টস শু। ক্ষুদে টেনিস প্লেয়ার। কমলকে যে কত সুন্দর দেখতে, কলকাতার বাইরে না এলে ঠিকঠিক বোঝা যেত না।

তিন-চার দিনেই কমল চনমনে, ঝলমলে হয়ে উঠেছে। মুখে একটু লালের আভাও ফুটেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে আমার ঘুম এসে যায়। ওরা দু'জন বসে বসে তখন কত কি করে। বাগানে চলে যায়। পাথর কুড়োয়। নানারকম পাতা এনে অ্যালবামে সাঁটে। সোমা আবার জল-রঙে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। সোমার যে এই গুণ আছে জানতুম না। গোপা গান গাইতে পারত না, সোমা সুন্দর গান করে। দু'জনে এত কাছাকাছি চলে এসেছে, আমি পড়ে গেছি দূরে।

এখানে এসে আমার স্পষ্ট একটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। পৃথিবীতে নারী ছাড়াও যে দেখার আর ভাবার বস্তু আছে, এই বোধ জন্মেছে। শহরের খাঁচায় মানুষ কি রকম পারভার্ট হয়ে যায়! একটা প্রবৃত্তি কি রকম প্রবল হয়ে ওঠে!

রাতে আমরা তিনজন একসঙ্গে বিছানায় যাই। মাঝে কমল। সোমার দিকেই সরে শোয়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সোমার নরম বুক ওঠা-নামা করছে। উঁচু হয়ে আছে তীক্ষ্ণ, অহঙ্কারী নাক। অঢেল নিম্নাঙ্গ সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসা

মৎস্যকন্যার মতো পড়ে আছে। পরম নির্ভরতার মতো। গুরু নিতম্ব লক্ষ্মীমন্ত। পূর্ণতার প্রতীক। দেখি। মনে ঘুম ছাড়া কিছুই আর আসে না। বুঝতে পারি, সোমা জেগে আছে। অপেক্ষা করছে, কমলের ঘুম কখন গাঢ় হবে। সোমার ভেতর একটা অতৃপ্তি আছে। একটু বেশি উর্বর। অনাবাদী থাকতে চায় না। আমি শুয়ে শুয়ে দেখি, জানালার বাইরে রাতের উদার আকাশ। জৈন মন্দিরের শ্বেতচূড়া। মাথায় ছোট্ট একটা শুভ্র আলোর ফোঁটা। শুনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছরছর করে পাথর নামছে। রাতের দুঃসাহসে পা পিছলেছে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর সোমা বলে, 'কি ঘুমোলে না কি ?'

সোমা দিনের বেলা আমাকে আপনি বলে। রাতের বেলা বলে, তুমি।

আমি প্রশ্ন শুনি। শুনেও নীরব থাকি। সোমা আবার বলে, 'কি ঘুমোলে নাকি ?'

তখন বলি, 'আছি, আছি, জেগে আছি।'

সোমা সাবধানে শব্দ না করে উঠে পড়ে। মশারি তুলে নেমে দাঁড়ায় মেঝেতে। ফিসফিস করে বলে, 'নেমে এস।' আমি তখন ভাবি, কেউ বলে না কেন, 'উঠে এসো।'

আমি নেমে পড়ি। নামতে নামতে ভাবি, আমি সোমার ক্রীতদাস। অন্ধকার ঘর। মন্দিরের চূড়ার স্নিগ্ধ, পবিত্র আলোর আভা মশারির গায়ে। শীতশীত রাত। সোমার সামনে দাঁড়াই। দুটো হাত সটান তুলে দেয় আমার কাঁধে। মখমলের আঁচল মেঝেতে লুটোয়। আমিও দু'হাত তুলে দি তার অনাবৃত ভরন্ত কাঁধে। আমাদের দুজনের মাঝের ব্যবধান কমতে থাকে। কমতে কমতে একসময় আর কোনও ব্যবধানই থাকে না। সোমা হাঁপাতে থাকে। উষ্ণ নিঃশ্বাসের ঝাপটায় আমার গাল-গলা ঝলসে যাবার মতো হয়। আমি বলতে থাকি, 'সোমা, কমল জেগে উঠতে পারে।'

সোমা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'উঠুক।'

সোমার বুকে মন্দিরের আলো এসে পড়ে। টলটল করছে বুক। ছল ছল করছে শরীর। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে চুল। মার্বেল শরীর ঘামে ভিজে ভিজে উঠেছে। আমাদের কোথায় কি। কোথায় পড়ে আছি আমরা। কোথায় আমাদের পোশাক। দু'খণ্ড মেঘের মতো আমরা ভাসতে ভাসতে প্রভাতের তটরেখায়।

তখন আমরা অভিনেতা। বিছানায় ফিরে এসে চুপিচুপি শুয়ে পড়ি, দু'জনে দু'পাশে। ঘুমের ভান করি। আর ভাবি পিতা-মাতা বলে পৃথিবীতে কেতাবী

একটা সম্পর্ক বহুকাল চালু আছে। আসলে নেই। একটা কর্তব্য মাত্র। একটা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার মতো। আসল সম্পর্ক হল, পুরুষ আর রমণী। কে কার বাবা, কে কার মা !

বেশ যাচ্ছিল, হঠাৎ কমলের জ্বর হয়ে গেল। বিকেল থেকেই হাই উঠছিল ঘনঘন। আমাকে নয়, ভয়ে ভয়ে সোমাকে বলছিল, 'আমার গা গুলোচ্ছে মাসি।' সোমা একটা কারমিনেটিভ মিকশ্চার খাওয়ালে। তারপর রাত না নামতেই ধুম জ্বর। অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা।

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। আশেপাশে হুট বলতেই কোনও ডাক্তার পাওয়া যাবে না।

সোমা সাহস দিয়ে বললে, 'ফু। ভয় পাবার কি আছে ! অত ভীতু হলে ছেলেপুলে মানুষ করা যায় না। আমার কাছে ওষুধ আছে, দিয়ে দিচ্ছি। কালই সেরে যাবে।'

রাতে আমাদের আশ্রয়দাতা জৈন সন্ন্যাসী শ্বেতাম্বর দেখতে এলেন। কমলের পাশে বসে মাথায় হাত বোলালেন অনেকক্ষণ। প্রার্থনা করলেন। বলে গেলেন, 'কাল সকালে, সাতমাইল দূরে বড় একজন ডাক্তার আছেন, খবর পাঠাবেন তাঁকে।'

সন্ন্যাসী চলে যাবার পরেও, ঘরে একটা পবিত্র ভাব ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। রাতে, বিছানায়, কমলের মাথার দিকে বসল সোমা, আমি বসলুম পায়ের দিকে। কমল পড়ে আছে জ্বরের ঘোরে। সোমা কপাল টিপছে। আমি পা। কমল কেবলই বলছে, 'বাবা, তুমি ছেড়ে দাও।'

শেষে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। সোমা ওষুধ দিয়েছিল। অল্প অল্প ঘামছে। শেষ রাতে হয়তো জ্বর ছেড়ে যাবে।

সোমা মেঝেতে নেমে বসেছে। গায়ের আঁচল সরিয়ে ব্লাউজ খুলে ফেলল। ফেলে দিল বন্ধনী। আমাকে বললে, 'আঁচল দিয়ে পিঠটা বেশ করে ঘষে দাও তো।'

সোমার এই স্বভাবটা আছে। মাঝে মাঝে পুরুষের সেবা চায়। পেছন দিকে হাঁটু মুড়ে বসে, ফর্সা, চওড়া, নধর পিঠে শাড়ির আঁচল ঘষছি, সোমা বললে, 'দ্যাখো তো, আমার সেই সাদা দাগটা কতটা ছড়াল ?'

'অন্ধকারে দেখা যায় ?'

'যায়। অন্ধকারে হাসলে সাদা দাঁত দেখা যায় না !'

'কোথায় ?'

'আর একটু নিচে।'

'কোথায় ?'

'আরও নিচে।'

'কত নিচে নামবো ?'

'যতটা নামা যায়।'

ভোরে কমলের গা বরফের মতো শীতল। জ্বর ছেড়ে গেছে। তবু এগারটা নাগাদ ডাক্তার দেখে গেলেন। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। নতুন জায়গা, নতুন জল, ভোরের ঠাণ্ডা। সম্পূর্ণ বিশ্রাম একদিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আগের কেস হিস্ট্রি অল্প অল্প বললুম। শুনলেন, তবে পাত্তা দিলেন না।

সারা সকাল কমল নেতিয়ে শুয়ে রইল। জ্বর নেমে গেছে, বিছানা ছেড়ে নামার যেন ইচ্ছেই নেই। হয় চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে, না হয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। জৈন মন্দিরের শ্বেত চূড়া প্রখর রোদে ধ্যান-স্তব্ধ, মৌন সন্ন্যাসী। ক্যালিপটাসের পাতায় বাতাস ধরার বায়না। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভজনের সুর। বারান্দায় বসে আছি চুপ করে। নানা রঙের প্রজাপতি কাগজের টুকরোর মতো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। রোদের তাতে গোলাপের জমাট বুকে রক্ত জমছে। কমলের জ্বর ছেড়েছে। সোমা তাই খুশি খুশি। সাঁওতাল রমণীদের মতো শরীরে শুধুমাত্র শাড়ির প্যাঁচ মেরে, বাথরুমে ঢুকেছে সেই কখন! 'সোমা, তোমার মায়ের কথা, দাদার কথা মনে পড়ছে না!'

'পড়ছে। যা কিছু ভুলতে চাওয়া যায়, তাই মনে পড়ে বেশি করে। আর যা কিছু মনে রাখার চেষ্টা করা যায়, ভুলে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। বিস্মৃতি গিলে ফেলে হাঙরের মতো।'

বহুত ঠিক। গোপাকে যত মনে রাখার চেষ্টা করছি, গোপা ততই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সোমা আমাকে গ্রাস করেছে লাল সমুদ্রের হাঙরের মতো। নেশায় পড়ে গেছি। সোমা গোপা নয়। অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ। অনেক বেশি জীবন্ত। গনগনে আগুন। এ আগুন এমন আগুন ঝলসে যেতে ভালো লাগে।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে কমলের ক্ষীণ ডাক ভেসে এল, 'বাবা, তুমি কোথায় ?'

'এই যে বাবু, আমি এখানে বসে আছি বারান্দায়।'

'তুমি একবার আসবে বাবা!'

'কি বলো ?'

'বোসো না, আমার কাছে।'

'বলো ? দেখি তোমার গা দেখি। বাঃ, ফাসক্লাস। নো ফিভার।'

'বাবা, আমি যে পারছি না ?'

'কি পারছ না বাবু ?'

'তুমি রাগ করবে না বলো ?'

'তোমার ওই এক কথা। বলো, কি পারছ না ?'

'আমি যে আমার ডান-পাটা আর নাড়াতে পারছি না। এই দ্যাখো আমার ডান হাতটাও একটু ওপরে উঠে কেমন কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছে।'

'সে কি রে ? দাঁড়া তোর মাসিকে ডাকি।'

ডাকতে হল না। গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে সোমা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

'সোমা শিগগির এসো।'

সোমা গুন গুন করে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে, 'আমার বেলা যে যায়'। এগিয়ে এল. 'কি হল আবার ?'

'কমল বলছে ডান পা নাড়াতে পারছে না। আর এই দ্যাখো ডান হাতেও কোনও সাড় নেই। তুলতে গেলে কোনও রকমে একটু উঠছে, আর কেঁপে কেঁপে পড়ে যাচ্ছে। কমল, মাসিকে দেখাও কি হচ্ছে!'

কমল দেখাল।

সোমা হাসি হাসি মুখে বললে, 'দুষ্টু ছেলে। বাবাকে ভয় দেখান হচ্ছে!'

কমলের মুখটা এতটুকু হয়ে গেল। হাসবার চেষ্টা করল। হাসি এল না। চোখে জল এসে গেল। ফোঁটা ফোঁটা গড়াতে লাগল গাল বেয়ে।

সোমা তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। মনে নেই ভিজে কাপড়। বিছানার চাদরে জল বসে যাবে।

কমলের ডান পা নিয়ে শুরু হয়ে গেল সোমার নানা পরীক্ষা। পায়ের পাতার তলার দিকে নখের আঁচড় দিল অনেকক্ষণ। কমল পা টেনে নিল না। চিমটি কাটল। কোনও বিকৃতি এল না মুখে। সোমা কেবলই জিজ্ঞেস করছে, 'লাগছে, লাগছে!' কমলের মুখে কোনও কথা নেই। জল ভরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি একসময় উত্তেজিত হয়ে একটু কড়া গলায় বলে ফেললুম, 'আহা, লাগছে কি না বলবে তো ?'

চোখের পাতা পড়ছে না। বিস্ফারিত দু চোখ। ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা জল নামছে গাল বেয়ে, মুক্তোর দানার মতো সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপল দু'বার। শব্দ নেই।

সোমা ভিজে কাপড়েই কমলের বুকে পড়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আর ফুলে ফুলে বলতে লাগল, 'এ তুই কি করলি কমল! এ তুই কি

করলি !'

আমার সারা শরীরে একটা শৈত্যপ্রবাহ বইতে শুরু করেছে। চারপাশ থেকে একটা ভয় তেড়ে আসছে। সেদিন নীলপাহাড়ে উঠে আমার এই রকম ভয় হয়েছিল। পাহাড়ের পর পাহাড়। তারপর পাহাড়। কেউ কোথাও নেই। জনপদের চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর পাথর। নিচে পাহাড়ী নদীর মস্ত মজা বেড। ছোট বড় বড় নানা পাথরের বিস্তীর্ণ বিছানা। পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে দেখাচ্ছে, যেন মৃত্যু দাঁত বের করে নীরবে হাসছে। বাতাস কান ছুঁয়ে শিন শিন বয়ে যাচ্ছে, সরু চুলের মতো। একটা কথা বললে অসংখ্য প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। একবার কমল বলে ডেকেছিলুম। অসংখ্য কমল, পাহাড় থেকে পাহাড়ে বিলীন হয়ে গেল। কিছু দূরে ছেতড়ে পড়েছিল একটা শকুনের কঙ্কাল।

হঠাৎ মনে হল আমি অনেকক্ষণ সোমার দিকে তাকিয়ে আছি। ভিজে কাপড়ের এখানে ওখানে ফুটে আছে চাঁপাফুল রঙের শরীর। দুটি অতি কোমল বন্ধনহীন বুক কমলের দেহ ছুঁয়ে দুলছে। মনে হল মধ্যরাতে দেহোন্মাদনার অবসরে আর ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে বলতে হবে না : এই আস্তে, কমল জেগে উঠবে।' পথ পরিষ্কার।

সোমা হঠাৎ ঝাঁকুনি মেরে উঠে বসল। কপালে ভিজে চুল। দু চোখে জল। ভীষণ আক্রোশে বললে, 'শয়তান'।

কাকে বললে ? আমাকে না ভাগ্যকে !